হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

২৩

সম্পাদনা

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ।। কলকাতা সাত

সূ চি প ত্র

মানব-দানব

মানব-দানব

অমর লেখক স্টিভেন্সনের অমর উপন্যাস 'ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইডে'র নাম চলচ্চিত্রের দৌলতে এখন সারা-পৃথিবীতে সুপরিচিত হয়ে পড়েছে। 'মানব-দানব' তারই অনুবাদ। পরিশিষ্ট আর-একটি বিদেশি গল্প 'দ্য মনস্টার-গড অভ্ মামুর্ত—এডমন্ড হ্যামিলটন অবলম্বনে লিখিত।

'মানব-দানব' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ডি. এন. লাইব্রেরি থেকে অক্টোবর ১৯৩৫-এ।

॥ প্রথম ॥

রহস্যময় বাড়ি

যাকে বলে মিশুক লোক, অ্যাটর্নি অবিনাশবাবু সে-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না।

কেউ তাঁকে হাসতে দেখেনি। রোগা-সোগা লম্বাটে চেহারা, সর্বদাই গম্ভীর মুখে থাকেন, কথাবার্তা কন খুবই কম। তবু লোকে তাঁকে অপছন্দ করে না।

তাঁর সহ্যশক্তি ছিল যথেষ্ট। যখন কোনও আসরে গিয়ে বসতেন, কোনওরকম অন্যায় কথা বা যুক্তিহীন তর্কই তাঁকে বিচলিত করতে পারত না।

অতিগম্ভীর মুখে তাঁর শান্ত ও মিষ্ট চোখ দুটি সকলকেই আকর্ষণ করত। নিজের প্রকৃতির মাধুর্যকে তিনি চেহারায় ও কথাবার্তায় প্রকাশ করতে পারতেন না বটে, কিন্তু সেটা বিশেষ রূপে ফুটে উঠত তাঁর অনেক সদয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে।

কারণে বা অকারণে অবিনাশবাবুর মন যে-দিন কিঞ্চিৎ খুশি থাকত, সেদিন এক পেয়ালার পরেও তিনি আর এক পেয়ালা চা পান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। এবং সেদিন দ্বিতীয় পেয়ালা চা পান করতে করতে তিনি নিজের কথাবার্তার মাত্রাও বেশ কিছু বাড়িয়ে না ফেলে পারতেন না।

তিনি সহজে কারুর সঙ্গে মিশতেন না,—কিন্তু এক দিন যার সঙ্গে মেলামেশা করতেন, সে হয়ে থাকত তাঁর চিরদিনের বন্ধু।

এর ঠিক উলটো প্রকৃতি ছিল তাঁর বন্ধু সদানন্দবাবুর। তাঁর মুখও যেমন, কথাবার্তাও তেমনি সর্বদাই হাসিখুশিমাখা। সামাজিকতায়, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশায় ও নানারকম গল্প-গুজবে তিনি ছিলেন যাকে বলে অদ্বিতীয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হত না যে, অবিনাশবাবুর সঙ্গে সদানন্দবাবুর স্বভাবের মিল আছে কোথাও। অথচ এরা দুজনেই ছিলেন দুজনের বিশেষ বন্ধু। সরস ও নীরস চেহারার ভিতরে এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব দেখা যায় না সচরাচর।

তাঁদের একটা মস্ত অভ্যাস ছিল। সেটা হচ্ছে দুই বন্ধুতে মিলে কলকাতার পথে-বিপথে বেড়িয়ে বেড়ানো। তাঁরা যখন বেড়িয়ে বেড়াতেন তখন দেখলে মনে হত, তাঁদের দুজনেরই ধাত বুঝি একই রকম! দুজনেই গম্ভীর, বোবার মতন নির্বাক। পৃথিবীর কোনও কিছুর দিকেই যে তাঁদের প্রাণের টান আছে এবং তাঁরা যে পরস্পরের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করছেন, এ কথা তাঁদের মুখ দেখে বোঝা অসম্ভব ছিল। অথচ সন্ধ্যার সময়ে দুজনে মিলে একটিবার বেড়িয়ে আসতে না পারলে দুই বন্ধুরই প্রাণ যেন ছটফট করতে থাকত।

ব্লটিংয়ের উপরে কালির ফোঁটা যেমন ক্রমেই বড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, আজকাল কলকাতা শহরের আকারও তেমনি বড়ো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এক-একটি এমন

নতুন পল্লি তৈরি হয়েছে, যার ফিটফাট পরিষ্কার ঝরঝরে রূপ দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। পুরানো কলকাতা শহরের সঙ্গে এ-পল্লিগুলি যেন কিছুতেই খাপ খায় না। ঠিক যেন কোনও কয়লার মতন কালো ও ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরা একটি মেয়ের গায়ে জড়োয়ার গয়না সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

এই রকমই একটা নতুন তৈরি পল্লির ভিতর দিয়ে সেদিন বৈকালে অবিনাশবাবু ও সদানন্দবাবু একসঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে চলেছিলেন। খানিকক্ষণ পরেই তাঁরা একটি অদ্ভুত-আকার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ও-রকম একটা নতুন পল্লির ভিতরে এমন মান্ধাতার আমলের আশ্চর্য বাড়ি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাড়িখানা দেখলেই বোঝা যায়, তার বয়স একশো বছরের কম নয়। এবং গেল পঞ্চাশ বৎসরের ভিতরে সে-বাড়ির গায়ে যে রাজমিস্ত্রি হাত দিয়েছে, এমন প্রমাণও নজরে পড়ে না। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। অথচ তার দোতলায় জানলা আছে মোটে চারটে। একতলায় আছে গুটি-দুয়েক জানলা ও একটি মস্ত সদর দরজা। ফুটপাতের উপরে বাড়ির সামনে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত একটি লম্বা রোয়াক একটানা চলে গিয়েছে। সেই রোয়াকের উপরে পানওয়ালা, ভুনিওয়ালা ও ফুলুরিওয়ালারা নোংরা দোকান সাজিয়ে বসেছে এবং রাত্রে মুটে ও ভবঘুরেরা সেখানে আরামে গা ঢেলে দিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুখের স্বপন দেখে। বাড়ির সদর দরজা প্রায় সর্বদাই বন্ধ থাকে এবং ইস্কুলের ছেলেরা দরজার কাঠের উপরে ছুরি দিয়ে নিজেদের নামকে অমর করবার চেষ্টা করে যায়। বাড়ি ও তার বাসিন্দারা এসব অত্যাচার নির্বিবাদে সহ্য করে।

নিজের বেতের ছড়িটা তুলে এই বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে সদানন্দ বললেন, 'অবিনাশ, এ বাড়িটা কোনওদিন তুমি লক্ষ করেছ কি?'

সদানন্দের কথা শুনে অবিনাশের মুখের ভাব যেন একটু বদলে গেল। তিনি খালি বললেন, 'কেন বলো দেখি?'

—'এই বাড়ির সম্বন্ধে আমি একটা বেয়াড়া গল্প বলতে পারি।'

—'শুনি।'

সদানন্দ বলতে লাগলেন

'কিছুদিন আগেকার কথা। পুজোর সময় বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলুম, কলকাতায় যখন ফিরলুম তখন শেষ রাত। ট্যাক্সি করে নিজের বাড়ির দিকে আসছি। পথের পর পথ—নির্জন ও ঘুমন্ত। পথের পর পথ—যেন কোনও অদৃশ্য শোভাযাত্রার আলোর মালা সাজিয়ে গ্যাসপোস্টগুলো দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। পৃথিবীতে যে জীবন্ত মানুষ আছে তা প্রমাণিত করবার জন্যে একটা পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ি পর্যন্ত দেখা দিলে না।

'অন্তত একজনও চলন্ত মানুষ দেখবার জন্যে আমার প্রাণ-মন যখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তখন রাস্তার মোড়ে হঠাৎ দেখতে পেলুম দুটো মূর্তিকে। প্রথম মূর্তিটা মাথায়

বেঁটেসেঁটে, খুব তাড়াতাড়ি হনহন করে এগিয়ে আসছে। অন্য মূর্তি হচ্ছে একটি ছোটো মেয়ের—বয়স আট-দশের বেশি হবে না, সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছিল। রাস্তার বাঁকের মুখে দুজনেই দুজনের উপরে গিয়ে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে মেয়েটি ফুটপাতের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। অবিনাশ, তার পরের কথা তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না! কারণ, সেই বেঁটে লোকটা সেই কচি বাচ্ছার গায়ের উপরে দুই-পা রেখে উঠে দাঁড়াল, তারপর খুব সহজ ভাবেই তাকে দুই পায়ে থেঁতলে নির্বিকারের মতন আবার পথ চলতে লাগল। মেয়েটি পাড়া কাঁপিয়ে আর্তনাদ শুরু করে দিলে।

'রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে গেল। টপ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ছুটে গিয়ে তার কোটের গলাটা সজোরে চেপে ধরলুম। কিন্তু তার মুখের পানে তাকিয়ে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল। অবিনাশ, সে-মুখ মানুষের মুখ নয়—মানুষের ছাঁচে গড়া সে যেন কোনও অজানা হিংস্র জানোয়ারের মুখ! আমি তার গলা চেপে ধরতেই সে ফিরে দাঁড়িয়ে যে-দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলে তাও এক ভয়ানক অমানুষিক ভাবে ভরা! কিন্তু আমি যখন তাকে আবার ঘটনাস্থলের দিকে টেনে নিয়ে চললুম, তখন সে আমাকে কোনওরকম বাধা দেবার চেষ্টা করলে না।

'ঘটনাস্থলে তখন মেয়েটির কান্না শুনে অনেক লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। মেয়েটি এই অসময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল পাড়ার এক ডাক্তার ডাকবার জন্যে—তার বাড়িতে নাকি কার খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। ডাক্তারকে খবর দিয়ে ফেরবার মুখেই এই কাণ্ড!

'ইতিমধ্যে ডাক্তারও এসে হাজির! সব শুনে তিনিও লোকটার দিকে রুখে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু তার চেহারা দেখে ভয়ে চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ডাক্তারের মুখ দেখেই বুঝলুম, এই নৃশংস জীবটাকে উচিতমতো শিক্ষা দেবার জন্যে তাঁর হাতদুটো নিসপিস করছে, কিন্তু তাঁর সাহসে কুলোচ্ছে না! পথে এসে যারা জড়ো হয়েছিল তারাও সবাই রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এই মূর্তিমান নর-পিশাচের চেহারা দেখে তাদের সকলেরই বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল!

'আমি লোকটাকে ডেকে বললুম, 'আপনার মতন পাষণ্ড দুনিয়ায় আমি দুটি দেখিনি! আপনি মানুষের সমাজে থাকবার যোগ্য নন।'

'লোকটা বললে, 'মশাই, এই সামান্য একটা দৈব-দুর্ঘটনা নিয়ে আপনারা এত বেশি গোলমাল করবেন না। আপনি কী করতে চান?'

—'আপনাকে নিয়ে থানায় যেতে চাই।'

—'মশাই, থানায় গিয়ে কোনও ভদ্রলোকই মান খোয়াতে রাজি হয় না। কিছু টাকা পেলে যদি আপনাদের সাধ মেটে তাহলে আমি টাকা দিতে রাজি আছি।'

'আমরা সবাই মিলে স্থির করলুম ক্ষতিপূরণের জন্যে লোকটাকে একশো টাকা দিতে হবে।

'টাকার পরিমাণ শুনে লোকটা প্রথমে কিছু ইতস্তত করতে লাগল,—কিন্তু সকলের মারমুখো মূর্তির দিকে চেয়ে শেষটা সে রাজি হয়ে গেল। বললে, 'তাহলে আপনারা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন। আমার বাড়িতে গেলেই টাকা পাবেন।'

'তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই অগ্রসর হলুম। কিন্তু সে আমাদের কোথায় নিয়ে এল, জানো অবিনাশ? এই বিদকুটে বাড়িটার সামনে! দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা চাবি বার করে দ্বার খুলে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল এবং খানিক পরেই একখানা চেক হাতে নিয়ে ফিরে এল। চেকের তলায় যিনি নাম সই করেছেন, তিনি শুধু আমারই জানিত লোক নন, এই শহরের একজন বিখ্যাত ও মাননীয় ব্যক্তি।

'আমি বিস্মিত স্বরে বললুম, 'মশাই, ব্যাপারটা বড়ো গোলামেলে বলে মনে হচ্ছে। কার চেক আপনি কাকে দিচ্ছেন?'

'লোকটা বিশ্রী ভাবে দন্তবিকাশ করে বললে, 'আপনাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আপনাদের সঙ্গে আমি নিজেই গিয়ে চেকখানা ভাঙিয়ে দিতে রাজি আছি।'

'আমরা তাই-ই করলুম। তাকে নিয়ে তখনকার মতন আবার বাড়িতে ফিরে এলুম। তারপর যথাসময়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে আমি নিজের হাতে চেকখানা দাখিল করলুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ চেক জাল ও অচল। কিন্তু ব্যাঙ্কে সেই চেক চলল।'

অবিনাশ বললেন, 'হুঁ। তাই নাকি?'

সদানন্দ বললেন, 'হ্যাঁ। তুমিও বোধ হয় আমারই মতো আশ্চর্য হচ্ছ? বাস্তবিক, চেকের তলায় যাঁর নাম ছিল, তাঁর মতন মহৎ লোক এমন জানোয়ারের সঙ্গে কখনওই কোনও সম্পর্ক রাখতে পারেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনওরকম ভয়-টয় দেখিয়ে এই লোকটা তাঁর কাছ থেকে চেকখানা আদায় করেছিল।'

অবিনাশ হঠাৎ গলার স্বর বদলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চেকে যিনি নাম সই করেছিলেন তিনিও ওই বাড়িতে থাকেন কি না, সে-খোঁজ নিয়েছ কি?'

সদানন্দ বললেন, 'ও-বাড়িতে কখনও কোনও ভদ্রলোক বাস করতে পারেন? ও কি ভদ্রলোকের জায়গা? চেকে যিনি নাম সই করেছিলেন, তাঁর বাসা যে অন্য জায়গায়, একথা তো আমি আগে থাকতেই জানি!'

—'এ বিষয়ে তুমি আর কোনও খোঁজখবর নাওনি?'

—'না, নেওয়া দরকার মনে করিনি। তবে এ পথ দিয়ে গেলেই ওই অদ্ভুত বাড়িখানা ভালো করে লক্ষ না করে আমি পারি না। ওটা আমার বাড়ি বলেই মনে হয় না। অত বড়ো বাড়িতে মোটে ওই ক-টি জানলা! জানলাগুলো কখনও খোলাও দেখিনি! সদর দরজাটাও সর্বদাই বন্ধ থাকে। মাঝে মাঝে কেবল সেই বিশ্রী লোকটা ওই দরজা খুলে বাইরে আসে। ও-বাড়িটা যেন রহস্যময়!'

খানিকক্ষণ দুজনে নীরবে পথ চললেন। অবিনাশের মুখের দিকে তাকিয়ে সদানন্দের মনে হল তাঁর বন্ধু যেন কোনও দুর্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

মিনিট-কয় পরে অবিনাশ বললেন, 'সদানন্দ, তুমি সেই বিশ্রী লোকটার নাম জানো?'

—'তিনকড়ি বটব্যাল।'

—'বটে। তাকে দেখতে কী রকম?'

—'তার চেহারার সঠিক বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব! তার দেহ দেখতে সাধারণ মানুষেরই মতন, কিন্তু তবু, তাকে দেখলে মোটেই সাধারণ মানুষ বলে মনে হয় না। সন্দেহ হয়, যেন তার দেহের ভিতরে কী-একটা মস্ত অভাব থেকে গিয়েছে—হয়তো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত! তার মুখের দিকে তাকালেই ভয়ে ও ঘৃণায় বুকের ভিতরটা কেমন করতে থাকে! তার চেহারা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে আছে, তা খুঁটিয়ে বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই!'

আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকবার পর অবিনাশ বললেন, 'আচ্ছা, তিনকড়ি যে নিজের চাবি দিয়েই সদর দরজাটা খুলেছিল, এ-বিষয়ে তোমার কোনওই সন্দেহ নেই তো?'

সদানন্দ বিস্মিত স্বরে বললেন, 'এ কী রকম আশ্চর্য প্রশ্ন!'

অবিনাশ বললেন, 'প্রশ্নটা তোমার আশ্চর্য বলে মনে হতে পারে বটে! চেকে যাঁর নাম সই ছিল, সে-ভদ্রলোককে আমি খুবই চিনি। কিন্তু আমার গোল বাধছে এই তিনকড়িকে নিয়ে। সে কি সত্যিই নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলেছিল?'

সদানন্দ বললেন, 'এই সামান্য চাবির কথা নিয়ে কোথায় যে গোল বাধল, আমি তো সেটা আন্দাজ করতে পারছি না! হ্যাঁ, সে তার নিজের পকেট থেকেই চাবি বার করেছিল।'

অবিনাশ বললেন, 'ব্যাস, এ কথা চাপা দাও! উঃ, অনেক কথা কয়ে ফেললুম—এত কথা কওয়া আমার উচিত হয়নি!'

॥ দ্বিতীয় ॥

তিনকড়ি লোকটা কে?

অবিনাশবাবুর মগজে আজ যে কী পোকা ঢুকেছে তা আমরা বলতে পারি না। একে তো স্বভাবতই তিনি গম্ভীর—আজ সেই গাম্ভীর্যের উপরে আবার বিরক্তিরও ছায়া এসে পড়েছে।

অন্য অন্য দিন বেড়িয়ে বাড়িতে ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত তিনি লেখাপড়ার কাজ করতেন। কিন্তু আজ তিনি সেসব কিছুই করলেন না, বসে বসে খালি কী যে ভাবতে লাগলেন তা কেবল তিনিই জানেন!

খানিক পরে উঠে দেরাজ খুলে তিনি একতাড়া কাগজ বার করলেন। সেই লম্বা কাগজগুলোর উপরে লেখা রয়েছে, 'ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায়ের উইল'। উইলখানা তিনি এর আগেও কয়েকবার পড়েছিলেন, আজও আর একবার পড়ে দেখলেন। উইলের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই

ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায়, M. D., D. C. L., LL. D., F. R. S., পরলোকগত হলে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁর উপকারী প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বটব্যাল ভোগ-দখল করতে পারবেন।

কিন্তু ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায় যদি কখনও তিন মাসের বেশি অদৃশ্য হয়ে থাকেন, তাহলেও উক্ত তিনকড়িবাবু বিনা বাধায় ডাক্তার জয়ন্তবাবুর সমস্ত সম্পত্রি মালিক হতে পারবেন।

উইলখানা পড়তে পড়তে অবিনাশবাবুর মুখের অন্ধকার আরও বেশি ঘনিয়ে উঠল। এতকাল অ্যাটর্নিগিরি করছেন, কিন্তু এমন সৃষ্টিছাড়া উইল জীবনে তিনি কোনওদিনই দেখেননি। মানুষ যে সজ্ঞানে এমনধারা উইল করতে পারে, একথা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না—এ উইলখানা দেখলেই তাঁর চোখ যেন জ্বালা করতে থাকে।

উইলখানা যথাস্থানে রেখে দিয়ে অবিনাশবাবু নিজের মনেই বললেন, 'এ খালি পাগলামি নয়, ঘৃণার ব্যাপারও বটে।'

পরের দিন সকালে উঠে তিনি ডাক্তার করুণাকুমার চৌধুরির উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। করুণাবাবুর মতন বিখ্যাত ডাক্তার শহরে খুব কমই আছেন। করুণা ছিলেন অবিনাশের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু এবং তাঁদের সে বন্ধুত্ব আজও অক্ষত আছে। অবিনাশবাবুর বিশ্বাস, করুণাবাবু ছাড়া আর কেউ খামখেয়ালি জয়ন্তডাক্তারের হাঁড়ির খবর দিতে পারবে না—কারণ তাঁরা দুজনে খালি সম-ব্যবসায়ী নন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে।

অবিনাশবাবুকে দেখে করুণা খুব সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। চা পান করতে করতে দুজনে মিলে খানিকক্ষণ একথা সেকথা নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা করুণা, তোমার আর আমার চেয়ে বড়ো বন্ধু জয়ন্তের বোধহয় আর কেউ নেই, কী বলো?'

করুণা বললেন, 'এ কথা সত্যি বটে। কিন্তু, হঠাৎ এমন কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন বলো দেখি? আজকাল তো জয়ন্তের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় না বললেই চলে।'

—'তাই নাকি? তোমরা দুজনেই ডাক্তার অথচ তোমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ নেই?'

—'আগে প্রায়ই দেখা হত। কিন্তু গেল কয়বছর ধরে জয়ন্ত ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে। আমার বিশ্বাস, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দিনরাত সে আজগুবি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করে—আর, পাগলের মতন যেসব কথা নিয়ে বক বক করে তার কোনও মানেই হয় না। দেখে-শুনে আমি তার হাল একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ও, বুঝেছি। তোমাদের ভেতরে মতভেদ হয়েছে। আচ্ছা করুণা, তুমি জয়ন্তের নতুন বন্ধু তিনকড়ি বটব্যালকে চেনো?'

করুণা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তিনকড়ি! না, ও নামও কখনও শুনিনি!'

করুণার কাছ থেকে আর বিশেষ কিছু জানা যাবে না বুঝে অবিনাশবাবু আবার বাড়িমুখো হলেন। তিনকড়ির কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে সে দিনটাই তাঁর বাজে নষ্ট হয়ে গেল। কে এই তিনকড়ি, জয়ন্তের সঙ্গে এমন ছোটোলোকের কী সম্পর্ক, তিনি কিছুতেই সেটা আন্দাজ করতে পারলেন না। এমনকি রাত্তিরেও সেই ব্যাপারটা তাঁকে যেন একেবারে পেয়ে বসল। ঘুমোবার জন্যে চোখ মুদেও অন্ধকারের ভিতরে তিনি যেন দেখতে পেলেন সদানন্দের বলা সেই গল্পের ছবিটি নির্জন নিশুত রাত—রাস্তায় সার-বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে আলোর থামগুলো; অস্বাভাবিক আকারের একটা ঘৃণ্য মানুষের বদ চেহারা খট খট করে এগিয়ে আসছে; একটি ছোট্ট মেয়ে ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছে; দুজনের গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগল—ছোটো মেয়েটি পড়ে গেল, আর সেই বেয়াড়া মানুষটা তাকে দু-পায়ে থেঁতলে পথের উপরে ফেলে রেখেই আবার চলতে শুরু করল,—অম্লানমুখেই। ...তারপর তিনি দেখলেন, তাঁর বন্ধু জয়ন্ত বিছানায় শুয়ে ঘুমে অচেতন হয়ে আছেন। সেই ভীষণ লোকটা অনায়াসেই জয়ন্তের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল; অসঙ্কোচে জয়ন্তের নাম ধরে ডাকলে; তাঁর বন্ধুর ঘুম ভেঙে গেল, তাড়াতাড়ি উঠে বসে এমন অসময়েও এই ভয়াবহ মূর্তিটিকে ঘরের মধ্যে দেখেও সে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করলে না! লোকটা তাকে বললে চেক সই করে দিতে এবং জয়ন্তও বিনাবাক্যব্যয়ে তার এই অসঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করলে!

এই একই কথা নিয়ে তোলাপাড়া করে ক্রমেই তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তবু এ দুর্ভাবনা তাঁকে রেহাই দিলে না। এই তিনকড়ির আসল চেহারার সঙ্গে যদি তাঁর পরিচয় থাকত, তাহলে হয়তো তিনি এতটা অভিভূত হয়ে পড়তেন না! তিনকড়ির প্রকৃতির পরিচয় তিনি পেয়েছেন, তার বিদকুটে চেহারার বর্ণনাও তিনি শুনেছেন এবং তাকে তিনি সর্বদা চোখের সামনেও দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু তার মুখখানা কিছুতেই তাঁর দৃষ্টির সীমার মাঝে আসছে না! শেষটা তাঁর কৌতূহল এতটা বেড়ে উঠল যে তিনি স্থির করলেন, যেমন করেই হোক তিনকড়ি বটব্যালকে তিনি দেখবেনই দেখবেন! হয়তো তার দেখা পেলে তাঁর মনটা আবার হাল্কা হয়ে যাবে এবং এমন একটা জীবকে কেন যে তাঁর বন্ধু এতটা অন্যায় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, হয়তো এ-রহস্যটাও বোঝা তাঁর পক্ষে শক্ত হবে না!

সদানন্দবাবু যে-অদ্ভুত বাড়িটার কথা বলেছিলেন, পরদিন থেকে অবিনাশবাবু তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রোজ নিয়মিত ভাবে পাহারা দিতে লাগলেন। এ বাড়ির মালিক কে, সদানন্দবাবু তা জানেন না বটে, কিন্তু অবিনাশবাবু জানেন। এ বাড়ির মালিক হচ্ছেন তাঁরই মক্কেল ডাক্তার জয়ন্তকুমার। এটা তাঁর পরীক্ষাগার। এখানে তিনি নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেন। কিন্তু এখানে তিনকড়ি আনাগোনা করে কেন ও এ বাড়ির চাবি তার

পকেটেই বা থাকে কেন? নিজের মনের ভিতর থেকে এ-প্রশ্নের কোনও জবাব না পেয়ে অবিনাশবাবু আপনা-আপনিই বললেন, 'আচ্ছা, আগে তো তিনকড়িকে স্বচক্ষে দেখি, তার পরেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে!'

এক দিন, দু-দিন, তিন দিন গেল—তিনকড়ির দেখা নেই। চতুর্থ দিনে অবিনাশবাবুর ধৈর্য সফল হল। তখন রাত দশটা বেজে গেছে, দোকানিরা একে একে দোকানের ঝাঁপ তুলছে, রাস্তাঘাট একেবারে নীরব ও নির্জন না হলেও গোলমাল খুব কম। এমন সময় অবিনাশবাবুর কানে এল কেমন-একরকম পায়ের আওয়াজ! অন্যান্য পায়ের আওয়াজের সঙ্গে এর যেন কোনওই মিল নেই!

পদশব্দ আরও কাছে এগিয়ে এসে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। অবিনাশবাবু প্রায়-রুদ্ধশ্বাসে দেখলেন, মোড় ফিরে পথের উপরে আবির্ভূত হল একটা মূর্তি! খর্ব দেহ, সাজ-পোশাক সাদাসিধে।

মূর্তিটা রাস্তা পার হয়ে ও-ফুটপাথের সেই বাড়িখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা চাবি বার করলে। অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন এবং হাত দিয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করে বললেন, 'বোধ হয় আপনিই তিনকড়িবাবু?'

সাপের মতন শব্দ করে একটা দ্রুত নিশ্বাস টেনে তিনকড়ি সভয়ে পিছিয়ে গেল! কিন্তু তার সে ভয় মুহূর্তের জন্যে, তখনই সে নিজেকে সামলে নিলে! এবং যদিও সে অবিনাশবাবুর চোখের দিকে আর মুখ তুলে তাকালে না, তবু বেশ শান্ত স্বরেই বললে, 'হ্যাঁ, ও নাম আমারই। আপনি কী চান?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আমি হচ্ছি ডাক্তার জয়ন্তবাবুর একজন পুরোনো বন্ধু। আমার নাম অবিনাশচন্দ্র সেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার নাম শুনেছেন? দেখছি, আপনি এই বাড়ির ভেতরেই যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন?'

—'জয়ন্তবাবু এখানে নেই'—এই বলে তিনকড়ি দরজায় চাবিটা ঢুকিয়ে দিলে এবং তার পরে মুখ না তুলেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনি দয়া করে আমার একটা কথা শুনবেন?'

—'কেন শুনব না? বলুন।'

—'আপনি এমন মুখ লুকোবার চেষ্টা করছেন কেন? আপনার মুখটা একবার আমাকে দেখতে দেবেন কি?'

তিনকড়ি প্রথমটা একটু ইতস্তত করলে; এবং তার পর যেন হঠাৎ কী ভেবেই অবিনাশবাবুর সুমুখে এসে সিধে হয়ে দাঁড়াল!

কয়েক সেকেন্ড ধরে দুজনেই দুজনের মুখের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অবিনাশবাবু বললেন, 'এর পর আর আমি আপনাকে ভুলব না। এটা একটা লাভের কথা।'

তিনকড়ি বললে, 'হ্যাঁ। হয়তো আবার আমাদের দেখা করবার দরকার হবে। আমার ঠিকানাটাও রেখে দিন'—এই বলে সে একখানা কার্ড এগিয়ে দিলে। কার্ডের উপরে ব্রজদুলাল স্ট্রিটের এক বাড়ির নম্বর লেখা রয়েছে।

অবিনাশবাবু মনে মনে বললেন, 'সর্বনাশ! একি সেই উইলের জন্যেই আমার সঙ্গে দেখা করবার ফন্দি আঁটছে?' কিন্তু মনের কথা মুখে তিনি প্রকাশ করলেন না।

তিনকড়ি বললে, 'এখন বলুন দিকি মশাই, আমাকে আপনি চিনলেন কেমন করে?'

—'লোকের মুখে শুনে।'

—'কে লোক? তার নাম কী?'

অবিনাশবাবু কেবল বললেন, 'এমন কোনও লোক—তিনি আমাদের দুজনেরই বন্ধু।'

সচমকে তিনকড়ি বললে, 'দুজনেরই বন্ধু! কে তিনি?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ধরুন, ডাক্তার জয়ন্ত।'

ক্রুদ্ধস্বরে তিনকড়ি বললে, 'তিনি কখনও আপনাকে বলেননি! আপনি যে মিছে কথা কইবেন এটা আমি জানতুম না।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনিও ঠিক ভদ্রলোকের মতন কথা কইলেন না!'

তিনকড়ি বন্য জন্তুর মতন অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর আচম্বিতে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে দরজাটা খুলে ফেলে বাড়ির ভিতরে সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবিনাশবাবু কিছুক্ষণ সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর চিন্তিত মুখে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর মুখ দেখলে মনে হয়, তিনি যেন রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেছেন। তিনকড়ি প্রায় বামনের মতো বেঁটে, তাকে দেখলেই তার দেহকে বিকৃত বলে সন্দেহ হয়, যদিও তার দেহে অঙ্গ-বিকৃতির কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। তিনকড়ির ভাব ও ব্যবহারও কখনও ভিতু ভিতু, আবার কখনও বা রীতিমতো বেপরোয়া। তার গলার আওয়াজও কেমন যেন ভাঙা ভাঙা ও চাপা চাপা এবং সে কথা কয় প্রায় চুপি চুপি, কর্কশ স্বরে। এগুলো তার সৎস্বভাবের পরিচয় দেয় না বটে, কিন্তু তাকে দেখেই তাঁর মনের ভিতরে কেন যে একটা ঘৃণা ও ভয়ের ভাব জেগে উঠেছিল, অবিনাশবাবু তার কোনও হদিস খুঁজে পেলেন না। তাঁর মনে হল, তিনকড়িকে দেখে তিনি যে-টুকু বুঝেছেন সেইটুকুই তার আসল পরিচয় নয়—তার মধ্যে অমানুষিক একটা কিছু আছে নিশ্চয়! তার দেহের রক্তমাংসের ভিতরে বাস করছে যেন কোনও অভিশপ্ত আত্মা! অবিনাশবাবু আপন মনেই বললেন, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত! তোমার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত! যে নতুন বন্ধুটিকে তুমি পেয়েছ, তার মুখের উপরে আমি শয়তানের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি!'

চলতে চলতে অবিনাশবাবু আর একটা রাস্তায় আর একখানা বাড়ির সামনে এসে পড়লেন। বাহির থেকেই বোঝা যায় এ-বাড়ির ভিতরে যিনি বাস করেন, তিনি অশিক্ষিত

বা গরিব লোক নন। অবিনাশবাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। একজন লোক দাঁড়িয়েছিল তাকে ডেকে শুধোলেন, 'রামচরণ, জয়ন্ত বাড়িতে আছেন?'

রামচরণ বললে, 'আমি ঠিক বলতে পারছি না হুজুর! আপনি বাইরের ঘরে একটু বসুন, বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখে আসছি।' সে চলে গেল। অবিনাশবাবু সাজানো-গুছানো একটি ঘরের ভিতরে গিয়ে সোফার উপরে বসে পড়লেন।

বড়ো বড়ো চিত্রকরের আঁকা ভালো ভালো ছবি, দামি দামি পাথরের মূর্তি ও আসবাব দিয়ে ঘরখানি চমৎকার রূপে সাজানো। এই ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই সারা মনটি যেন আরামে এলিয়ে আসে। অবিনাশবাবুর মতে, এমন আনন্দদায়ক ঘর কলকাতায় আর দ্বিতীয় নেই! এইখানেই জয়ন্ত ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসে কত সুন্দর সন্ধ্যা তিনি নিশ্চিন্ত প্রাণে কাটিয়ে দিয়েছেন! কিন্তু আজ তাঁর মনের ভিতর থেকে সমস্ত আনন্দের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে! তিনকড়ির মুখ মনে করে জীবনের উপরেও তাঁর যেন বিতৃষ্ণা আসতে লাগল—এবং বার বার তাঁর মনে হতে লাগল, তাঁর বন্ধুর এই ঘরেও সর্বত্রই যেন একটা অদৃশ্য অমঙ্গলের আভাস জেগে আছে!

রামচরণ এসে খবর দিলে, জয়ন্ত কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন, সে তা জানতে পারেনি।

অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা রামচরণ, তোমার বাবু যে পুরোনো বাড়িতে বসে কাজ করেন, তার চাবি তিনকড়িবাবুর হাতে গেল কেমন করে?'

রামচরণ বললে, 'বাবুই তাঁকে দিয়েছেন।'

—'দেখেছি, ওই তিনকড়ি-ছোকরার উপরে তোমার বাবুর খুব বিশ্বাস!'

—'হ্যাঁ হুজুর, বাবু তাঁকে খুবই বিশ্বাস করেন। খালি তাই নয়, বাবু হুকুম দিয়েছেন তিনকড়িবাবু যা বলবেন আমাদের সকলকেই তাই করতে হবে।'

—'আচ্ছা রামচরণ, তোমাদের ওই তিনকড়িবাবুকে আমি বোধহয় এখানে কখনও দেখিনি?'

—'না হুজুর, তিনি বাড়ির এদিকে কখনও আসেন না। খিড়কির দরজা দিয়ে তিনি আনাগোনা করেন।'

—'আমি এখন আসি রামচরণ।'

রাস্তায় বেরিয়ে অবিনাশবাবু আবার ভাবতে ভাবতে চললেন, 'বেচারা জয়ন্ত! জানি চিরদিনই সে খামখেয়ালি, কিন্তু তার মতন সুচরিত্র ও মিষ্টপ্রকৃতির লোক তিনকড়ির মতন বীভৎস জীবের সঙ্গে মেলামেশা করছে কেমন করে? তিনকড়ি কোন মায়ামন্ত্রে জয়ন্তকে বশীভূত করেছে? ...এই তিনকড়ি! নিশ্চয়ই এ যে-জীবন যাপন করে তা ওর চেহারার মতোই ভয়ঙ্কর! সে-জীবনের পরিচয় পেলে জয়ন্ত কখনওই তার সঙ্গে মিশতে পারবে না! ...এই নরপশুটা কিনা ঘুমন্ত জয়ন্তের বিছানার পাশে গিয়েও বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে!

যদি সে কোনওগতিকে ঘুণাক্ষরেও উইলের কথা টের পায়, তাহলে জয়ন্তের প্রাণ কি আর একদণ্ডও নিরাপদ থাকবে? এই সমূহ বিপদ থেকে জয়ন্তকে উদ্ধার করতে হবেই! কিন্তু সে কি আমার প্রস্তাবে রাজি হবে?'

॥ তৃতীয় ॥

জয়ন্তের কোনও ভাবনাই নেই

দিন-পনেরো পরে বন্ধুবান্ধবদের কাছে হঠাৎ ডাক্তার জয়ন্তের এক নিমন্ত্রণপত্র এসে হাজির! এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়, বহুকাল অদর্শনের পর এ-রকম আকস্মিক ভোজ দেওয়ার খেয়াল ডাক্তার জয়ন্তের অনেকবারই হয়েছে। অবশ্য, এরকম ভোজের আসরে জনকয় বাছা বাছা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া আর কেউ নিমন্ত্রিত হতেন না।

ডাক্তার জয়ন্তের সঙ্গে এমন ভাবে দেখা পাবার সুযোগ পেয়ে অবিনাশবাবু খুবই খুশি হয়ে গেলেন। আগেই বলেছি এক পেয়ালার উপরে দু-পেয়ালা চা খেলেই তাঁর মুখের কুলুপ খুলে যেত—আজকে তিনি দ্বিতীয় পেয়ালার উপরেও তৃতীয় পেয়ালা চা নিয়ে আসর জমকে বসেছেন রীতিমতো। কারণে অকারণে অনর্গল গল্প করে যাওয়া যাদের স্বভাব তারা আজ যত গল্প করছে, অবিনাশবাবুও তাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম করছেন না। সাধারণত স্বল্পবাক ও শুষ্ক-প্রকৃতির এই প্রৌঢ় মানুষটিকে বন্ধুরা সকলেই যে পছন্দ করতেন, এ-কথাও আগে জানিয়েছি। সুতরাং আজকের আনন্দ-সভায় অবিনাশবাবুকে এমন খোলা-প্রাণে যোগ দিতে দেখে সকলেই খুব আনন্দিত হয়ে উঠলেন।

বাবুর্চির হাতে তৈরি প্রোন কাটলেট, পটলের দোরমা, রুইমাছের রোস্ট, শ্রীরামপক্ষীর সঝোল মাংস ও মোগলাই পোলাও খেয়ে সকলের মুখে যে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল সে কথা বলাই বাহুল্য। তারপর খোসমেজাজে আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে অন্যান্য বন্ধুরা যখন একে একে বিদায় নিয়ে গেলেন, অবিনাশবাবু তখনও তাঁর আসন ছেড়ে উঠলেন না।

জয়ন্ত বুঝলেন অবিনাশবাবু নিশ্চয়ই তাঁকে কোনও কথা বলতে চান, আর সেকথা নিতান্ত হাল্কা কথা নয়।

তাঁকে বেশিক্ষণ সবুর করতেও হল না। অবিনাশবাবু হঠাৎ গম্ভীর মুখে আরম্ভ করলেন, 'জয়ন্ত, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমার কাছে তোমার যে-উইল রেখে এসেছ, তার কথা নিশ্চয়ই তুমি ভোলোনি?'

জয়ন্ত বললেন, 'অবিনাশ, তুমি একটি বেচারি! আমার উইল নিয়ে তোমার যে দুর্ভাবনার অন্ত নেই, সেকথা আমি জানি। আমার মতন নির্বোধ মক্কেল পাওয়া কারুর পক্ষেই

সৌভাগ্যের বিষয় নয়! করুণা তো আমার ওপরে চটেই আগুন হয়ে আছে! তার বিশ্বাস, আমার মাথার ঠিক নেই। আমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকেও সে গাঁজাখোরের খেয়াল বলে মনে করে!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'করুণার কথা এখন থাক। তোমার উইলের কথাই হোক। কোনও বুদ্ধিমান লোকই এ রকম উইল করে না।'

জয়ন্ত সায় দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'এ কথা তো আমি আগেই স্বীকার করেছি। আমি একটি নির্বোধ মক্কেল।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু জানো কি জয়ন্ত, যার নামে তুমি উইল করেছ, সেই তিনকড়ির কোনও কোনও গুপ্তকথা আমি জানতে পেরেছি?'

জয়ন্তের সুন্দর মুখ মড়ার মতন হলদে হয়ে গেল—তাঁর চোখের উপরেও কেমন একটা কালো ছায়া নেমে এল। তিনি শুকনো স্বরে বললেন, 'ওসব কথা আমি শুনতে চাই না, ও নিয়ে আমি আলোচনা করতেও রাজি নই।'

অবিনাশবাবু যেন নিজের মনেই বললেন, 'তিনকড়ি যেসব কাণ্ড করে, কোনও ভদ্রলোকেই তা করে না।'

জয়ন্ত চঞ্চল ভাবে বললেন, 'সে যে-কাণ্ডই করুক তার জন্যে আমার উইল অদল-বদল হবে না। অবিনাশ, তুমি জানো না আমার অবস্থা কতটা সঙিন! এ ব্যাপার নিয়ে বাজে বাক্যব্যয় করলে কোনওই লাভ হবে না।'

জয়ন্তের অবস্থা দেখে অবিনাশবাবুর দয়া হল। গলার আওয়াজ নরম করে আবার তিনি বললেন, 'জয়ন্ত, আমাকে তুমি চেনো। আমাকে তুমি অনায়াসেই বিশ্বাস করতে পারো। আমার কাছে সব কথা খুলে বলো, আমি নিশ্চয়ই তোমার উপকার করতে পারব।'

জয়ন্ত অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'ভাই অবিনাশ, তুমি যে আমার উপকারী বন্ধু তা কি আমার জানা নেই? আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। তোমার মতন বিশ্বাস আমি পৃথিবীর আর কারুকেই—এমনকি নিজেকেও করি না! কিন্তু যতটা ভাবছ ততটা এখনও হয়নি। তোমাকে শান্ত রাখবার জন্যে আমি যা বলছি শোনো। আমি ইচ্ছা করলে যখন-খুশি এই তিনকড়ির হাত থেকে ছাড়ান পেতে পারি। সুতরাং তাকে নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না। এ প্রসঙ্গ চাপা দেওয়াই ভালো।'

অবিনাশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বেশ, তাই হোক।'

জয়ন্ত বললেন, 'কিন্তু কথা যখন আজ উঠলই তখন আর একটা বিষয় তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই। সত্যসত্যই ওই তিনকড়ি বেচারার ওপরে আমার মনের টান আছে। আমি জানি তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে—সে নিজেই আমাকে একথা বলে গেছে। বোধ হয় সে তোমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহারও করেনি। কিন্তু ভাই অবিনাশ, আমি তাকে পছন্দ করি। তুমি আমার কাছে অঙ্গীকার করো, আমি যখন থাকব না তখন তার উচিত পাওনা

তুমি তাকে মিটিয়ে দেবে? তোমার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'তুমি যতই বলো, আমি তাকে কখনওই পছন্দ করতে পারব না।'

জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অবিনাশবাবুর কাঁধের উপরে একখানা হাত রেখে বললেন, 'তুমি যে তাকে পছন্দ করতে পারবে না তাও আমি জানি। কিন্তু স্বীকার করো, আমার অবর্তমানে তুমি ঠিক উইল মতো কাজ করবে?'

অবিনাশবাবু দুঃখিত ভাবে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'স্বীকার করছি।'

॥ চতুর্থ ॥

হত্যাকাণ্ড

এক বছর পরে। সারা কলকাতা শহরে ভীষণ এক হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ল। এ রকম নিষ্ঠুর খুনের কথা বড়ো-একটা শোনা যায় না।

গঙ্গানদীর কাছাকাছি একটা রাস্তায় এক বাড়ির একটি মেয়ের রাতের বেলায় ঘুম হচ্ছিল না। মেয়েটি ছিল সে-বাড়ির শিক্ষয়িত্রী। সেদিন পূর্ণিমা রাত—জ্যোৎস্নার দুগ্ধময়ী ধারায় চারিদিক ধব ধব করছিল। মেয়েটি জানলার ধারে বসে আনমনে পথের দিকে তাকিয়েছিল। মেয়েটির নাম কমলা।

সেইখানে বসে বসে কমলা সে রাতে যা দেখেছিল তা হচ্ছে এই

একটি বয়স্ক ভদ্রলোক একা পথ চলছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি যখন কমলাদের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন আকাশের জ্যোৎস্না ও পথের গ্যাসের আলোকে তাঁর চেহারা বেশ পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছিল। তাঁর মাথার চুলগুলি রুপোর মতন সাদা, আর মুখখানি এমন শান্ত ও ভাবভঙ্গি এমন ধীর স্থির যে দেখলেই তাঁকে ভালোবাসতে ইচ্ছা হয়।

ঠিক সেই সময়েই আর এক দিক দিয়ে একটি যুবক ভদ্রলোক প্রাচীন লোকটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কমলা প্রথমটা তার দিকে ততটা নজর দেয়নি, কিন্তু তার পরে দেখেছিল সে মাথায় অত্যন্ত বেঁটে। তাকে দেখে প্রাচীন লোকটি খুবই বিনীত ও ভদ্র ভাবে নমস্কার করলেন।

কমলা তখন ভালো করে বেঁটে লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখে তখনই তাকে চিনতে পারলে। তার নাম হচ্ছে তিনকড়ি বটব্যাল, সে একবার কী-একটা কাজে কমলাদের বাড়ি এসেছিল। কিন্তু তার চেহারা, ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তা কমলার এত খারাপ লেগেছিল যে, তাকে সে মোটেই পছন্দ করতে পারেনি।

প্রাচীন ভদ্রলোকটি খুব শিষ্ট এবং মিষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে তিনকড়িকে কী বলতে লাগলেন। কিন্তু তিনকড়ির ভাব দেখে মনে হল না যে, তাঁর কথা সে কান পেতে শুনছে। তারপর কোথাও কিছু নেই আচমকা তিনকড়ি মহা খাপ্পা হয়ে লাফালাফি করতে ও হাতের মোটা লাঠিগাছা ঘোরাতে শুরু করে দিলে—ঠিক যেন হঠাৎ পাগলের মতন!

প্রাচীন লোকটি অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ ভাবে দুই পা পিছিয়ে গেলেন। তিনকড়ি তাতে আরও রেগে গিয়ে সেই মোটা লাঠিগাছা দিয়ে তাঁকে ক্রমাগত নির্দয় ভাবে মারতে লাগল! বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাটির উপরে পড়ে গেলেন, তিনকড়ি তখনও ঠিক বাঁদরের মতন মুখ খিঁচিয়ে তাঁর দেহের উপরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘন ঘন লাঠি ও লাথি মেরে একেবারে কাবু করে ফেললে।

এর পরে কমলা আর কিছুই দেখেনি, কারণ এই ভয়ানক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

ঘটনাস্থলে যখন পুলিশ এসে পড়ল, তিনকড়ি তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মৃতদেহ পথের মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে এবং ঠিক তাঁর দেহের পাশেই পড়ে রয়েছে একগাছা মোটা লাঠির আধখানা। সেই রক্তমাখা আধখানা লাঠি দেখলেই বুঝতে দেরি হয় না যে, সেই লাঠি দিয়েই এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে! লাঠির বাকি অংশ অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না, খুব-সম্ভব হত্যাকারী সেটাকে হাতে করেই নিয়ে গেছে। মৃত ব্যক্তির পকেটের ভিতর থেকে একটি মনিব্যাগ, একটি সোনার ঘড়ি ও একখানি ঠিকানা-লেখা খামে-মোড়া চিঠি পাওয়া গেল। খামের উপরে, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন, এই নাম লেখা রয়েছে।

ইনস্পেকটার সেই খামখানা নিয়ে পরদিন সকালেই অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা করলে। সমস্ত শুনে অবিনাশবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর। আগে মৃতদেহ না দেখে আমি আর কোনও কথাই বলব না। একটু দাঁড়ান, আমি জামা-কাপড় ছেড়ে আসি।'

ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ দেখে তিনি বললেন, 'আশ্চর্য! ইনি যে কুমার মনোমোহন চৌধুরি!'

ইনস্পেকটার চমকে উঠে বললে, 'এও কি সম্ভব হতে পারে, বলেন কী! আপনার ভুল হয়নি তো?'

—'ভুল হওয়া অসম্ভব!'

—'তাহলে হয়তো আপনি খুনিকেও চিনতে পারবেন। তার নাম তিনকড়ি বটব্যাল।'

নাম শুনেই অবিনাশবাবু থ হয়ে গেলেন, তাঁর মুখে রা ফুটল না! খানিক পরে থেমে থেমে প্রায়-রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আচ্ছা, এই তিনকড়ি মাথায় কি খুব বেঁটে?'

—'হ্যাঁ, তার দেহ তো বেঁটে বটেই, শুনেছি তার চেহারাও নাকি শয়তানের মতোই সুন্দর। দেখুন দেখি, এই ভাঙা লাঠিগাছা আপনি চিনতে পারেন কি না?'

অবিনাশবাবু দেখেই চিনতে পারলেন। কিন্তু এর মালিক তিনকড়ি নয়, তাঁর বন্ধু ডাক্তার জয়ন্ত এবং এ লাঠি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন তিনিই নিজে! এ সব কথা প্রকাশ না করে ইনস্পেকটারকে ডেকে তিনি বললেন, 'আমার গাড়িতে আসুন। আমি আপনাকে তিনকড়ির ঠিকানায় নিয়ে যাচ্ছি।' তিনকড়ি তাঁকে যে কার্ডখানা দিয়েছিলেন সেখানা এখনও তাঁর পকেট-বুকের মধ্যেই আছে।

অবিনাশবাবুর গাড়ি চিৎপুর রোডের অন্যান্য অসংখ্য গাড়ির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে পাথুরেঘাটার সরু রাস্তার ভিতরে ঢুকল। তারপর দু-ধারে কাঁসারিদের বাসনের দোকানগুলো পিছনে রেখে গাড়ি গিয়ে ঢুকল ব্রজদুলাল স্ট্রিটের এক ময়লা গলির ভিতরে। শীতকালের কুয়াশায় সকালের আলো তখনও আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং সেই কুয়াশার ভিতর দিয়ে ঘোরাফেরা করছে জন-কয়েক দুশমন চেহারার গুন্ডার মতন লোক! ঝিয়ের মতন দেখতে নোংরা কাপড় পরা কতকগুলো স্ত্রীলোক ব্যস্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই শীতেও উলঙ্গ দেহে কতকগুলো ছেলে চ্যাঁচাচ্ছে, কাঁদছে বা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছে।

ইনস্পেকটার বললে, 'তিনকড়ি যে-রকম লোক, সে থাকেও দেখছি ঠিক সেই রকম জায়গাতেই।'

এ-গলির চেয়েও ছোটো, নোংরা ও অন্ধকার আর-একটা গলি বা শুঁড়িপথের ভিতরে ঢুকে পাওয়া গেল তিনকড়ির বাসা। চুন-বালি-খসা একখানা নড়বড়ে পুরানো বাড়ির ভাঙা রোয়াকের উপরে একটা থুত্থুড়ি বুড়ি বসে বসে খক খক করে কাশছিল। অবিনাশবাবু তাকে শুধোলেন, 'হ্যাঁ বাছা, তিনকড়িবাবু কি বাড়ির ভেতরে আছেন?'

বুড়ি বিড় বিড় করে বললে, 'না গো, না! সে মিনসে কাল রাতে একবার এসেছিল, এসেই খানিক পরে আবার কোনও চুলোয় বেরিয়ে গেছে!'

—'সে আবার কখন আসবে বলতে পারো?'

বুড়ি এক মিনিট ধরে আগে খক খক করে কাশলে, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'জানিনে বাপু! সে কখন আসে কখন যায়, কাকপক্ষীও টের পায় না!'

—'আমরা একবার তার ঘরে যাব।'

—'তা হয় না গো, তা হয় না! তার ঘরে তালা বন্ধ।'

—'আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন, তিনি পুলিশের লোক। আমরা তালা ভেঙেই তিনকড়ির ঘরে ঢুকব।'

বুড়ির ভাঁজ-পড়া মুখে একটা উৎকট আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠল। ব্যগ্রভাবে সে বললে, 'তাই নাকি বাবা, তাই নাকি! সে কী করেছে বাবা?'

ইনস্পেকটারের দিকে ফিরে অবিনাশবাবু চুপি চুপি বললেন, 'দেখছেন, তিনকড়িকে এখানেও কেউ পছন্দ করে না! তার বিপদের কথা শুনে বুড়ির আহ্লাদের আর সীমা

নেই!'—তারপর বুড়ির দিকে ফিরে বললেন, 'এইবারে আমাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে চলো তো বাছা!'

তিনকড়ির ঘরের ভিতরটার সঙ্গে এ-বাড়িখানা যেন খাপ খায় না! তার ঘরে দামি দামি সোফা, কৌচ, চেয়ার, কার্পেট ও ছবি প্রভৃতি সাজানো রয়েছে। ঘরের অনেক জিনিসই লন্ডভন্ড হয়ে আছে—যেন তাড়াতাড়ি কেউ এ-ঘরের জিনিসপত্তর উলটে-পালটে রেখে চলে গিয়েছে! ঘরের মেঝের একজায়গায় একখানা আধ-পোড়া 'চেক-বুক' পাওয়া গেল। এবং যে লাঠি দিয়ে খুন হয়েছিল তারও বাকি আধখানা একটা দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে পড়ল। এই পেয়েই ইনস্পেকটার মহা খুশি! ঘরের ভিতরে আর কোনও উল্লেখযোগ্য জিনিস পাওয়া গেল না।

সেই দিন দুপুরেই ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেখানে তিনকড়ির নামে পঞ্চাশ-হাজার টাকা জমা আছে!

ইনস্পেকটার বললে, 'অবিনাশবাবু! খুন করবার পর তিনকড়ির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নইলে, সেই ভাঙা লাঠিটা ঘরের ভেতরে কখনওই ফেলে রেখে যেত না, আর ব্যাঙ্কের চেক-বুকখানাও পুড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করত না। আসলে টাকাই হচ্ছে মানুষের জীবন! পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এখন সে আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করতে পারবে না, তার পেটও অচল হয়ে পড়বে! সে এখন আমার হাতের মুঠোর ভেতরে এসেছে—তার নামে হুলিয়া বের করলেই সে ধরা পড়বেই পড়বে!'

তিনকড়ির নামে হুলিয়া বেরুল। কিন্তু তার চেহারা মার্কা-মারা হলেও কোথাও তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তিনকড়িকে চেনে এমন আর কোনও লোকেরও সন্ধান মিলল না—কলকাতা শহরের বুক থেকে সে যেন কোনও যাদুমন্ত্রের গুণেই আচম্বিতে অদৃশ্য হয়ে গেল!

॥ পঞ্চম ॥

জাল চিঠি

প্রথম পরিচ্ছেদে নতুন রাস্তায় যে অদ্ভুত দেখতে বাড়িখানার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ ডাক্তার জয়ন্তের পরীক্ষাগার যে-বাড়িখানার ভিতরে আছে, জয়ন্তবাবুর বসতবাড়ি থেকে যে সে বাড়িতে আনাগোনা করা যায়, এ গুপ্তকথাটা বাইরের কেউ জানত না। কারণ তার বসতবাড়ি এক রাস্তায়, আর পরীক্ষাগার, আর এক রাস্তায়, কিন্তু এই দু-খানা বাড়ির পিছনদিকই পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন।

হত্যার পরদিনই অবিনাশবাবু জয়ন্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। খানিক পরে রামচরণ এসে তাঁকে নিয়ে গেল। তারপরে রামচরণ তাঁকে যখন খিড়কির দরজা দিয়ে পরীক্ষাগারের

ভিতরে নিয়ে গেল, অবিনাশবাবু তখন রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন। কারণ এ গুপ্তকথাটা তিনিও জানতেন না।

জয়ন্ত তাঁর পরীক্ষাগারের ভিতরে এক কোণে চুপ করে বসেছিলেন—তাঁকে দেখলেই মনে হয় তিনি যেন অত্যন্ত পীড়িত। ক্লান্ত, মৃদু স্বরে তিনি বললেন, 'এসো অবিনাশ, বোসো।'

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে জয়ন্তের সামনে বসে পড়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, তুমি সব খবর শুনেছ তো?'

জয়ন্ত শিউরে উঠে বললেন, 'শুনেছি। খবরের কাগজের হকাররা ওই খুনের খবরটা চেঁচিয়ে বলতে বলতে এই পথ দিয়েই চলে গেল!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'যিনি খুন হয়েছেন, তোমার মতন তিনিও আমার মক্কেল। তাঁর সম্বন্ধেও আমার খোঁজখবর নেওয়া উচিত। আশা করি তিনকড়িকে তুমি লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে না।'

জয়ন্ত উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, 'অবিনাশ, ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি, আর কখনও আমি তিনকড়ির মুখ-দর্শন করব না! তার সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক চুকে গেছে! আর, তাকে আমি সাহায্য করব কী, সে আমার সাহায্য চায়ও না। তুমি তাকে জানো না, কিন্তু আমি জানি। নিরাপদে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদেই আছে! আর কখনও তার দেখা পাবে না!'

অবিনাশবাবু গম্ভীর মুখে সব শুনলেন। এত অল্প কারণে জয়ন্তের এত উত্তেজিত ভাব তাঁর যেন কেমন-কেমন লাগল! একটু পরে বললেন, 'তুমি দেখছি তিনকড়ির সম্বন্ধে খুবই নিশ্চিন্ত! অবিশ্যি, সে আর না দেখা দিলে তোমারই মঙ্গল। কিন্তু যদি সে ধরা পড়ে তাহলে তার সঙ্গে তোমারও নাম রটবে, এটা বুঝেছ তো?'

জয়ন্ত বললেন, 'হ্যাঁ, তার সম্বন্ধে আমি সত্যিই নিশ্চিন্ত। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি তোমার পরামর্শ চাই। আমি—আমি একখানা চিঠি পেয়েছি। এ চিঠিখানা পুলিশকে দেখাব কি না তাই ভাবছি। অবিনাশ, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি—তুমিই বলো, এখন আমার কী করা উচিত?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এ চিঠি পুলিশের হাতে পড়লে তিনকড়ির কি ধরা পড়বার সম্ভাবনা?'

জয়ন্ত বললেন, 'না। তিনকড়ির অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, সেজন্যে আমার কোনও ভাবনা নেই! আমি কেবল নিজের সুনামের কথা ভাবছি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা, চিঠিখানা দেখি।'

জয়ন্তের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে অবিনাশবাবু গোটা গোটা হরফে অদ্ভুত ধাঁচের হাতের লেখায় পড়লেন

প্রিয় জয়ন্তবাবু,

আমি হচ্ছি আপনার অযোগ্য বন্ধু। তবু আমার সঙ্গে আপনি যে সদয় ব্যবহার করেছেন

তার তুলনা নেই। তবে এইটুকু আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে, ভবিষ্যতে আমার জন্যে আপনি কোনও বিপদেই পড়বেন না। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমার পালাবার উপায় আমি করে নিয়েছি। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভবদীয়

শ্রীতিনকড়ি বটব্যাল

চিঠিখানা পড়ে অবিনাশবাবু শুধোলেন, 'চিঠির খামখানা কোথায়?'

জয়ন্ত বললেন, 'সেখানা ভুলে ফেলে দিয়েছি। তার ওপরে ডাকঘরের ছাপ ছিল না। চিঠিখানা লোক মারফত আমার কাছে এসেছে।'

—'তাহলে চিঠিখানা এখন আমার কাছে থাক?'

—'তোমার যা-খুশি করতে পারো। নিজের ওপরে আর আমার বিশ্বাস নেই।'

—'জয়ন্ত, আর একটা কথা জানতে চাই। তুমি কি তিনকড়ির কথা শুনেই তোমার উইল করেছিলে?'

জয়ন্ত হঠাৎ অত্যন্ত নিস্তেজ ভাবে চেয়ারের উপরে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়লেন। তারপরে কেবল ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

অবিনাশবাবু বললেন, 'একথা আমি আগেই জানতুম! হয়তো সে তোমাকে খুন করত। তুমি খুব বেঁচে গিয়েছ।'

জয়ন্ত বললেন, 'অবিনাশ, ভগবান আমাকে খুব শিক্ষাই দিলেন! ওঃ, এ শিক্ষা জীবনে ভুলব না!'—বলেই তিনি দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন।

অবিনাশবাবু ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসেই রামচরণের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি তাকে শুধোলেন, 'রামচরণ, কোনও লোক আজ তোমার বাবুকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে?'

রামচরণ বললে, 'না।'

অবিনাশবাবুর মন আবার সন্দেহ দোলায় দুলে উঠল। তবে? তবে কি জয়ন্ত আসল কথা তার কাছে লুকোলে? তবে কি ও-রাস্তার বাড়ি দিয়ে তিনকড়ি নিজেই লুকিয়ে এসে চিঠিখানা জয়ন্তকে দিয়ে গেছে? কিংবা জয়ন্তের সামনে বসেই এই চিঠিখানা লিখেছে? তাহলে তো ব্যাপার বড়ো সুবিধের নয়!

অবিনাশবাবু ফিরে এসে নিজের আপিসঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। শরীর বড়ো শ্রান্ত হয়েছিল, একখানা আসনে গিয়ে বসে আজকের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর দুই চোখ মুদে এল। তাঁর একজন মক্কেল তিনকড়ির হাতে নিহত হয়েছেন। তাঁর আর-একজন মক্কেলের মাথার উপরেও বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। তিনকড়ি এখন গা-ঢাকা দিয়েছে বটে, কিন্তু যে-কোনও অসতর্ক মুহূর্তে আবার সে বেরিয়ে আসতে পারে, মূর্তিমান মৃত্যুর মতো! তখন জয়ন্তকে কে রক্ষা করবে?

এমন সময় তাঁর প্রধান কর্মচারী অনন্তবাবুর গলা পাওয়া গেল। অবিনাশবাবু চোখ খুলে বললেন, 'কী অনন্ত?'

অনন্ত বললে, 'আজ্ঞে, অনেক কাজ বাকি রয়েছে। কখন করবেন?'

অবিনাশবাবু খানিকক্ষণ নীরবে অনন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। এই অনন্ত তাঁর অনেক দিনের পুরানো ও বিশ্বাসী লোক। তাঁর এখানে কাজ করবার আগে সে অন্যত্র হাতের লেখা পরীক্ষার কাজ করত। হাতের লেখা পরীক্ষা করতে সে ছিল অদ্বিতীয়। তার এই বিশেষ গুণটি অনেক সময়েই অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুর অনেক কাজে লেগেছে।

অনন্ত আবার বললে, 'আপিসের অনেক কাজ বাকি আছে—'

অবিনাশবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক গে বাকি, তুমি এক কাজ করো তো অনন্ত! আমি আজ একটা অদ্ভুত ধাঁচের হাতের লেখা পেয়েছি। তুমি একবার দেখবে?'—এই বলে তিনি তিনকড়ির লেখা সেই চিঠিখানা বার করে তার হাতে দিলেন।

অনন্ত চিঠিখানার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে বললে, 'একি সেই তিনকড়ি, যে জয়ন্তবাবুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী? এই কি কালকে খুন করে পালিয়েছে?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ অনন্ত, এ সেই তিনকড়ি। শুনেছি, হাতের লেখা দেখে লোকের চরিত্র বোঝা যায়। দ্যাখো দেখি, এই চিঠিখানা পড়ে তিনকড়ির চরিত্র তুমি কিছু বুঝতে পারো কি না?'

অনন্ত টেবিলের উপরে চিঠিখানা রেখে বললে, 'এ হাতের লেখাটা অদ্ভুত বটে!'—তারপরে চিঠির উপরে ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হাতের লেখা পরীক্ষা করতে লাগল। ...খানিক পরে সে বললে, 'আচ্ছা, আপনার কাছে জয়ন্তবাবুর কোনও চিঠি আছে? আমি একবার দেখব।'

—'আছে বই কি। এই টেবিলের টানাতেই আছে'—এই বলে অবিনাশবাবু টেবিলের টানা থেকে একখানা চিঠি বার করে এগিয়ে দিলেন।

অনন্ত সে-চিঠিখানা টেবিলের উপর তিনকড়ির চিঠির পাশে রাখলে। তারপর মিনিট-পাঁচেক পরীক্ষা করে যেন নিজের মনেই মৃদু স্বরে বললে, 'আশ্চর্য ব্যাপার!'

অবিনাশবাবু কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার, অনন্ত? আর, তুমি ও চিঠি দু-খানা একসঙ্গে মিলিয়ে কী দেখছ?'

অনন্ত বললে, 'মশাই, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! এই চিঠি দু-খানা দু-রকম করে লেখা বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এ দু-খানা চিঠিই এক হাতের লেখা!'

—'ভারী আশ্চর্য তো!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই! কোথায় জয়ন্তবাবু আর কোথায় তিনকড়ি! মানব আর দানব—'

অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, 'অনন্ত! মনে রেখো, চিঠিখানা গোপনীয়!'

—'যে আজ্ঞে। বুঝেছি।' —বলে অনন্ত গম্ভীর মুখে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনকড়ির চিঠিখানা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পুরে ফেললেন। তারপর বিবর্ণ মুখে সভয়ে নিজের মনে বলে উঠলেন, 'কী! একটা নরপিশাচের জন্যে জয়ন্ত এই চিঠি জাল করেছে!' —তাঁর দেহের রক্ত যেন ঠান্ডা হয়ে গেল!

॥ ষষ্ঠ ॥

করুণার শেষ পত্র

দিনে দিনে অনেক দিন কেটে গেল। কুমার মনোমোহন চৌধুরির হত্যার কোনও কিনারাই হল না। পুলিশ থেকে হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল, কিন্তু তিনকড়ির টিকিটি পর্যন্ত কেউ দেখতে পেলে না। পৃথিবী যেন তাকে একেবারেই গ্রাস করে ফেললে।

পুলিশ একে একে তার জীবনের অনেক ঘটনাই আবিষ্কার করেছে। সে যাদের সঙ্গে মেলামেশা করত তাদের মধ্যে একজনও ভদ্রলোক ছিল না এবং অনেকেই ছিল জেল-ফেরত দাগি আসামি। তাদের সঙ্গে মিলে সে যেসব জঘন্য ও নিষ্ঠুর কাজ করত, তা শুনলেও মন ঘৃণায় ও ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

জয়ন্তের জন্যে অবিনাশবাবুর দুর্ভাবনা এখন অনেকটা কমে এসেছে; কারণ তিনকড়ির ঘৃণিত মূর্তি আর তাঁর বন্ধুর আশেপাশে ঘোরাফেরা করে না। তিনি মনে করলেন, অমঙ্গল থেকেই মঙ্গলের জন্ম হয়—কুমার মনোমোহন চৌধুরির জীবন নষ্ট হল বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে ডাক্তার জয়ন্তের জীবন ভীষণ এক রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তিলাভ করলে!

ডাক্তার জয়ন্ত আবার তাঁর আগেকার স্বভাব ফিরে পেলেন। বরাবরই তিনি দানশীল ছিলেন, গরিবের দুঃখ-কষ্ট দেখলেই মুক্ত-হস্তে দান করতেন—তার উপরে এখন তাঁর ধর্মানুরাগও হঠাৎ যেন আরও প্রবল হয়ে উঠল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বৈঠকখানায় আবার নিয়মিত ভাবে বন্ধুর আসর বসতে লাগল এবং সে আসরে জয়ন্ত এখন ধর্মের কথা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করতে ভালোবাসেন। এইভাবে দুটি দীর্ঘ মাস কেটে গেল বেশ নিরাপদে।

তারপরে অবিনাশবাবুর মনে আবার একটা খটকা লাগল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি নিয়ম-মতো জয়ন্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বাড়ির ভিতরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই রামচরণ এসে খবর দিলে, 'বাবুর শরীর ভালো নয়, তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না!' পরদিন ও তারপর আরও তিন দিন জয়ন্তের বাড়িতে গিয়ে অবিনাশবাবু এইভাবে ধুলো-পায়েই ফিরে এলেন। তখন তিনি একটু আশ্চর্য হয়ে ব্যাপার কী জানবার জন্যে ডাক্তার করুণার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

করুণার বাড়ি থেকে যদিও তাঁকে ধুলো-পায়েই ফিরে আসতে হল না, কিন্তু ভিতরে গিয়ে বন্ধুর চেহারা দেখে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। বিছানার উপরে স্থির হয়ে করুণা শুয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর অমন যে ধবধবে গায়ের রং, আজ যেন কালিমাখা হয়ে গেছে! এই কয়দিনের ভিতরেই তিনি যেন বুড়ো হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর মুখের উপরে ফুটে উঠেছে আসন্ন মৃত্যুর অপচ্ছায়া!

অবিনাশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'করুণা, একী! তোমার একী চেহারা হয়েছে!'

করুণা আস্তে আস্তে উঠে বসে বললেন, 'আমি দারুণ আঘাত পেয়েছি অবিনাশ, দারুণ আঘাত! এ আঘাত আমি বোধহয় আর সামলাতে পারব না! আমি ডাক্তার, সুতরাং বেশ বুঝতে পারছি আমার জীবনের আর কোনওই আশা নেই! মরতে আমি চাই না অবিনাশ, কিন্তু মরতে আমাকে হবেই!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ব্যাপার যে কী কিছুই বুঝতে পারছি না! এদিকে তোমার অসুখ, ওদিকে জয়ন্তের অবস্থাও—'

করুণার মুখের ভাব এক লহমায় বদলে গেল! একখানা কম্পমান হাত তুলে অত্যন্ত বিরক্তভাবে উচ্চৈঃস্বরে তিনি বললেন, 'থামো, থামো! ও-নাম আমার কাছে আর কোরো না—আমার মতে জয়ন্তের মৃত্যু হয়েছে! মরা লোকের নাম আমি শুনতে চাই না!'

অবিনাশবাবু মনে করলেন, করুণার সঙ্গে জয়ন্তের নিশ্চয়ই খুব ঝগড়া হয়েছে। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, 'ছিঃ করুণা, পাগলামি কোরো না! জয়ন্তের সঙ্গে যদি তোমার কিছু মনোমালিন্য হয়ে থাকে, তাহলে দু-দিনেই তা দূর হয়ে যাবে। কী হয়েছে সব আমাকে খুলে বলো।'

—'কী হয়েছে, সেকথা তুমি তাকেই জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো।'

—'জয়ন্ত আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি নয়।'

—'এ কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলুম না। কিন্তু আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারব না। আমার মৃত্যুর পরে তুমি হয়তো সব কথাই জানতে পারবে, কিন্তু এখন নয়। অবিনাশ, তুমি বোসো। অন্য কথা কও। কিন্তু দোহাই তোমার! জয়ন্তের নাম আমার কাছে কোরো না—আমি কিছুতেই তা সইতে পারব না!'

সেদিন বাড়িতে ফিরে এসে অবিনাশবাবু জয়ন্তকে একখানা চিঠি লিখে জানতে চাইলেন যে, করুণার সঙ্গে কী নিয়ে তাঁর মনান্তর হয়েছে, আর কেনই বা তিনি কারুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে চাইছেন না?

উত্তরে জয়ন্তের কাছ থেকে এই করুণ পত্রখানি এল

'ভাই অবিনাশ,

আমাকে তুমি ক্ষমা করো। করুণার সঙ্গে কেন যে আমার মনান্তর হয়েছে, তার কারণ আমি তোমাকেও বলতে পারব না। তবে এইটুকু জেনে রেখো, আমাদের এই মনোমালিন্য

এ জীবনে আর দূর হবার নয়। করুণাকে আমি কোনও কিছুর জন্যেই দায়ী করছি না। কিন্তু তার সঙ্গে আমার আর দেখা না হওয়াই দুজনের পক্ষেই মঙ্গল।

এখন থেকে আমি সকলকার চোখের আড়ালেই বাস করব। যদি তোমার সঙ্গে দেখা না হয় তাহলে তুমি আমার বন্ধুত্বে যেন সন্দেহ কোরো না। আমাকে তুমি অবাধে নিজের পথে এগিয়ে যেতে দাও। আমি এখন স্বখাত-সলিলে ডুবে মরছি—যে বিভীষিকা আর যে যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে আমার নিশিদিন কাটছে, পৃথিবীতে তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। আমি যদি পাপী হই তবে পাপের শাস্তিও ভোগ করছি আমিই। এর পরে তুমি আমার এই উপকারটি কেবল করতে পারো। আমার মৌনব্রত ভাঙবার চেষ্টা কোরো না।'

চিঠিখানা হাতে করে অবিনাশবাবু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন : এ আবার কী হল! আপদ তিনকড়ি তো কোন চুলোয় দূর হয়েছে, জয়ন্ত আবার আগেকার মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর মুখ আবার হাসিখুশি ও শান্তিতে ভরে উঠেছিল, কিন্তু আচম্বিতে আবার এই অভাবিত পরিবর্তন কীসের জন্যে? জয়ন্ত উন্মাদ-রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি তো? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? করুণার কথা শুনে বেশ বোঝা যায়, এর ভিতরে অন্য কোনও রহস্যময় কারণ আছে!

এক সপ্তাহ পরে অবিনাশবাবু স্তম্ভিত ভাবে শ্রবণ করলেন, করুণার মৃত্যু হয়েছে!

পরদিন সকালে করুণার বাড়ি থেকে তাঁর নামে একখানা সিলকরা চিঠি এল। তার উপরে করুণার হাতে লেখা রয়েছে, 'এই পত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন ছাড়া আর কেউ খুলতে পারবেন না। কিন্তু এই পত্র তাঁর হাতে যাবার আগে যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।'

অবিনাশবাবু সিলমোহর ভেঙে মোড়কটা খুলে ফেললেন। তার ভিতরেও সিলমোহর করা আর একখানা পত্র এবং তার উপরে লেখা—'ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায় যেদিন পরলোকগত অথবা অদৃশ্য হবেন, তার আগে এই পত্র কেউ পাঠ করতে পারবেন না।'

অবিনাশবাবুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। জয়ন্তের অদ্ভুত উইলেও তাঁর অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনার কথা আছে। করুণাও আবার সেই অদৃশ্য হওয়ার কথাই লিখেছে! এর কী সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? জয়ন্ত কেন অদৃশ্য হবে? আর এই রহস্যময় লুকোচুরিরই বা কী হেতু আছে?

অবিনাশবাবুর মনে একটা প্রবল প্রলোভন জেগে উঠল, সিল ভেঙে করুণার পত্রখানা আদ্যপ্রান্ত পড়ে দেখবার জন্যে। কিন্তু তিনি অ্যাটর্নি মানুষ, শিক্ষার গুণে এই দুর্দান্ত প্রলোভনকেও সংবরণ করলেন।

॥ সপ্তম ॥

জানলার ধারে

সে এক রবিবার। বৈকালের কিছু পরে সদানন্দবাবুর সঙ্গে অবিনাশবাবু তাঁদের নিয়মিত ভ্রমণে বেরিয়েছেন। বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা আবার সেই অদ্ভুত বাড়িখানার সামনে এসে পড়লেন।

সদানন্দবাবু বললেন, 'আমার গল্প ফুরিয়ে গেল! আর তিনকড়ির দেখা পাওয়া যাবে না।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'বোধহয় নয়।'

—'আচ্ছা অবিনাশ, এই বাড়ির ভিতর দিয়ে জয়ন্ত ডাক্তারের বাড়ির ভিতরে যাওয়া যায়, প্রথম দিনে তুমি তো একথা আমাকে বলোনি!'

—'তা বলিনি। কিন্তু সেকথা এখন থাক। বাড়ির সদর দরজাটা খোলা রয়েছে দেখছি। এসো, একবার ভিতরে ঢুকে জয়ন্তের খবর নেওয়া যাক।'

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সদানন্দবাবু বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন। উঠানের কাছে গিয়ে উপরপানে তাকিয়েই তাঁরা দেখতে পেলেন, দোতলার একটা জানলার ধারে জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

অবিনাশবাবু এত সহজে বন্ধুর দুর্লভ দেখা পেয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এই যে জয়ন্ত! কেমন আছো হে?'

অত্যন্ত উদাসীন ভাবে শুষ্ক স্বরে জয়ন্ত বললেন, 'মোটেই ভালো নয়। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'দিনরাত ঘরে বন্দি হয়ে থেকেই তোমার শরীর এমন কাহিল হয়ে পড়েছে! এসো এসো, জামা-কাপড় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসো! চলো, আমাদের সঙ্গে খোলা হাওয়ায় খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসবে চলো!'

জয়ন্ত কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমারও তোমাদের সঙ্গে বাইরে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে! কিন্তু না, না, তা অসম্ভব,—একেবারেই অসম্ভব!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'বেশ তো, তাহলে এইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করা যাক না কেন!'

জয়ন্ত মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'সেকথা মন্দ নয়—' কিন্তু বলতে বলতেই আচম্বিতে তাঁর মুখের উপর থেকে হাসির আলো যেন দপ করে নিবে গেল এবং তার বদলে সেখানে ফুটে উঠল এমন ভয়ঙ্কর নিরাশা ও বিভীষিকার ভাব যে, অবিনাশবাবু ও সদানন্দবাবু—দুজনেরই বুক যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং উপরকার জানলাটাও সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল!

কিন্তু তাঁরা যেটুকু দেখেছিলেন সেইটুকুই যথেষ্ট, তাঁরা সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারলেন না, দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে সে বাড়িখানাকে পিছনে ফেলে তাড়াতাড়ি অনেকটা এগিয়ে গেলেন!

তারপর অবিনাশবাবু আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!'

সদানন্দবাবু গম্ভীর মুখে কেবল মাথা নেড়েই সায় দিলেন।

॥ অষ্টম ॥

শেষ-রাত্রি

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অবিনাশবাবু একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন।

এমন সময় অতিশয় বিবর্ণ মুখে জয়ন্তের পুরানো চাকর রামচরণ এসে হাজির!

তার মুখের দিকে তাকিয়েই অবিনাশবাবু সচমকে বললেন, 'কী রামচরণ, তোমার বাবুর কী অসুখ করেছে?'

রামচরণ উদ্বিগ্ন ভাবে বললে, 'কী হয়েছে জানি না, কিন্তু একটা কিছু হয়েছেই!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'অমন করে বললে চলবে না। আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও।'

রামচরণ বললে, 'বাবু আজকাল কীরকম মানুষ হয়েছেন আপনি তো সব জানেন! প্রায়ই তিনি ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকেন। অন্য অন্য বারে বাবু মাঝে মাঝে এক-আধ বার বাইরে বেরুতেন, কিন্তু আজ এক হপ্তার ভেতরে ঘরের দরজা তিনি একবারও খোলেননি! তাই আমার বড়ো ভয় হচ্ছে!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ভয়! কীসের ভয়?'

—'আমার মনে হয়, বাবুর কোনও অনিষ্ট হয়েছে!'

—'আঃ, কী যে বলো তার ঠিক নেই! অনিষ্ট আবার কী হবে?'

—'আমার বলতে ভরসা হচ্ছে না, বাবু! তার চেয়ে আপনি নিজেই গিয়ে বরং সব দেখে আসবেন চলুন!'

অবিনাশবাবু আর দ্বিরুক্তি না করে তখনই উঠে জামাকাপড় পরে রামচরণের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

শীতের কনকনে রাত। চাঁদের মুখ মড়ার মতন হলদে। হাওয়া যেন বরফ-জলে স্নান করে কাঁদতে কাঁদতে বয়ে যাচ্ছে। ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে অবিনাশবাবু পথের পর পথ পার হয়ে গেলেন, কিন্তু কোথাও জন-প্রাণীর সাড়া নেই। আজিকের এই কুয়াশামাখা শীতার্ত রাত্রি পৃথিবী থেকে যেন সমস্ত জীবনের চিহ্ন মুছে দিয়েছে। এই সমাধির স্তব্ধতা

অবিনাশবাবুর ভালো লাগল না। শীত সওয়া যায়, এ মরণের নীরবতা অসহনীয়। এই স্তব্ধতা তাঁর মনের ভিতরে যেন একটা অমঙ্গলের পূর্বাভাস এনে দিলে।

জয়ন্তর বাড়ির কাছে এসে রামচরণ বললে, 'মা কালী যেন মুখ তুলে চান, বাবু যেন ভালো থাকেন'—এই বলে সে দরজায় করাঘাত করলে।

দরজাটা ভিতর থেকে খুলে একজন দারোয়ান দরজার ফাঁক দিয়ে অত্যন্ত ভীত একখানা মুখ বার করলে।

রামচরণ বললে, 'ভয় নেই মঙ্গল সিং, আমরা এসেছি।'

অবিনাশবাবু ভিতরে প্রবেশ করেই দেখলেন, বাড়ির অন্যান্য দাস-দাসি ও দারোয়ানরা সকলে মিলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে,—প্রত্যেকেরই মুখে ব্যাকুল আতঙ্কের চিহ্ন!

রামচরণ বললে, 'তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে গোলমাল কোরো না। অবিনাশবাবুকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াও। ...বাবু, আপনি পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে আসুন।'

রামচরণের সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশবাবু যে বাড়িতে জয়ন্তের পরীক্ষাগার আছে সেই বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন। দোতলায় উঠে দুজনে পরীক্ষাগারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

পরীক্ষাগারের দরজার সম্মুখে গিয়ে রামচরণ চেঁচিয়ে বললে, 'বাবু! অবিনাশবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'তাঁকে বলো গে যাও আমি কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারব না!'

রামচরণ অবিনাশবাবুকে নিয়ে আবার নীচে নেমে এল। তারপর আবার বললে, 'এখন বলুন তো বাবু, ঘরের ভিতর থেকে যে-গলার আওয়াজটা শুনলেন, সেটা কি আমাদের বাবুর গলার আওয়াজ?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'জয়ন্তের গলার আওয়াজ অন্যরকম শোনাল বটে।'

রামচরণ বললে, 'অন্যরকম? হ্যাঁ, অন্য-রকম শোনাবেই তো! আজ বিশ বছর এখানে চাকরি করছি, বাবুর গলার আওয়াজ আমি চিনি না? ও কখনওই আমার বাবুর গলার আওয়াজ নয়!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এ ভারী আশ্চর্য কথা! ধরো তোমার কথাই যদি সত্য হয়, জয়ন্তকে যদি কেউ খুনই করে থাকে, তাহলে খুনি পালিয়ে না গিয়ে এই ঘরের ভিতরেই বসে থাকবে কেন? রামচরণ, তোমার সন্দেহের কোনও মানেই হয় না!'

রামচরণ বললে, 'বাবু, দেখছি আপনি সহজে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন না! বেশ, তাহলে আরও শুনুন বাবু—কিংবা বাবুর নামে যে হতভাগা লোকটা ওই ঘরের ভিতরে আছে, সে আজ সাত দিন ধরে খালি 'ওষুধ' 'ওষুধ' বলে চিৎকার করছে। জানলা গলিয়ে ওষুধের নাম লিখে রোজই সে কাগজের পর কাগজ ফেলে দেয়, আর তাই নিয়ে সারা শহরের সমস্ত ওষুধের দোকানে ছুটোছুটি করে আমাকে মরতে হয়। কিন্তু কোনও ওষুধই ও-লোকটার পছন্দ হয় না।'

অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও রকম কোনও কাগজ তোমার কাছে আছে?'

রামচরণ নিজের ফতুয়ার পকেটের ভিতর থেকে একখানা কাগজ বার করে দিলে। কাগজখানা নিয়ে অবিনাশবাবু খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। জয়ন্ত কোনও ঔষধালয়ের মালিককে লিখেছেন 'আপনি যে-ঔষুধটা পাঠিয়েছেন তা একেবারেই অকেজো। দু-বছর আগে আমার ফরমাসে আপনি এই ঔষধটাই অনেক বেশি পরিমাণে আনিয়ে রেখেছিলেন। সেবারে যেখান থেকে ঔষধ আনানো হয়েছিল আবার সেইখানেই ভালো করে খোঁজ নিন। একেবারে খাঁটি ঔষধ না হলে আমার চলবে না। এ ঔষধ যে আমার কতটা দরকারি, সে-কথা বোধহয় আপনি ভালো করে বুঝতে পারেননি। এই ঔষধই আমি চাই, যেখান থেকে পারেন আনিয়ে দিন, এজন্যে যত টাকা খরচ করতে হয় তা করতে আমি রাজি আছি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এই হাতের লেখা যে জয়ন্তের তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই।'

রামচরণ বললে, 'হ্যাঁ, হাতের লেখাটা তাঁরই মতন দেখতে বটে। কিন্তু হাতের লেখাটা নিয়ে কী হবে, আমি যে লোকটাকে স্বচক্ষে দেখেছি!'

অবিনাশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'স্বচক্ষে দেখেছ?'

রামচরণ বললে, 'হ্যাঁ। একদিন ঘরের দরজা দৈবগতিকে খোলা ছিল। হঠাৎ আমি এইখানে এসে পড়ি। আমাদের বাবু আমার দিকে পিছন ফিরে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কতকগুলো ওষুধের আর আরকের শিশি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। তিনি আমার পায়ের শব্দে চমকে মুখ তুলে তাকিয়েই সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন! আমি চকিতের জন্যে তাঁকে দেখেছিলুম—কিন্তু সেইটুকুর মধ্যেই যা দেখলুম তাতে আমার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত ভয়ে খাড়া হয়ে উঠল! বাবু, তিনিই যদি আমাদের মনিব হবে তাহলে মুখে তিনি মুখোশ পরেছিলেন কেন? তিনিই যদি আমাদের মনিব হবেন তাহলে আমার সুমুখ থেকে অমন ইঁদুরের মতন পালিয়ে যাবেন কেন? আমি কি তাঁর পুরানো চাকর নই? তারপর—' বলতে বলতে থেমে পড়ে রামচরণ দুই হাতে তার মুখ ঢেকে ফেললে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার বাবুর মুখে বোধহয় হঠাৎ কোনও রোগের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সেইজন্যেই তিনি মুখোশ পরে আছেন, কারুর সঙ্গে দেখা করছেন না, আর ওষুধ আনবার জন্যে বার বার লোক পাঠাচ্ছেন! এ-ছাড়া আর কিছু কারণ থাকতে পারে না। রামচরণ, মিছেই আমরা ভয় পেয়েছি।'

রামচরণ মাথা নেড়ে বললে, 'না বাবু, তিনি কখনওই আমাদের মনিব নন। আমাদের বাবু লম্বা-চওড়া আর এ লোকটা বেঁটে,—দেখতে ঠিক বামনের মতো। আপনি কি বলতে চান বিশ বছর এখানে থেকেও আমার বাবুকে দেখতে আমি ভুল করব?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'তুমি যখন এত জোর করে বলছ, তখন তোমার কথা আমাকে মানতেই হবে! বেশ, আমি না হয় পরীক্ষাগারের দরজা ভেঙে ফেলবারই ব্যবস্থা করছি!'

রামচরণ উৎসাহিত স্বরে বললে, 'তাই করুন বাবু, তাই করুন! আমি এখুনি আপনাকে কুড়ুল এনে দিচ্ছি!'

রামচরণ তাড়াতাড়ি একখানা কুড়ুল নিয়ে এসে হাজির করলে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আর এক কথা, তুমি যাকে দেখেছ তাকে চিনতে পেরেছ কি?'

রামচরণ বললে, 'আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন তখন বলতে হল। সে আর কেউ নয়, তিনকড়ি বটব্যাল!'

অবিনাশবাবু চমকে উঠে বললেন, 'কী বললে?'

—'হ্যাঁ, ঘরের ভেতরে আমি তিনকড়ি বটব্যালকেই দেখেছি! তার ভাবভঙ্গি আর চলবার ধরন কী-রকম অদ্ভুত তা তো আপনি জানেন? আমাকে দেখে ঘরের ভেতর থেকে সে যখন অদৃশ্য হল, তখন আমার মনে হল ঠিক যেন একটা বড়ো-জাতের বাঁদর লাফ মেরে পালিয়ে গেল! বাবু, আমি হলফ করে বলতে পারি, সে ওই তিনকড়ি ছাড়া আর কেউ নয়!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এতক্ষণে তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে! রামচরণ, তিনকড়ি হচ্ছে মূর্তিমান শনি! সে যখুনি তোমার বাবুর সঙ্গে সঙ্গে মিশেছিল, তখুনি আমি বুঝেছিলুম যে তোমার বাবুর অদৃষ্ট ভালো নয়! হ্যাঁ, তিনকড়ি নিশ্চয়ই আমার বন্ধুকে খুন করেছে! আর, হয়তো কোনও গূঢ় কারণে জয়ন্তের ঘরেই লুকিয়ে আছে! এখন আমাদের যা কর্তব্য তাই করি এসো। লোকজনদের ডাকো!'

রামচরণের হাঁকাহাঁকিতে দারোয়ান ও অন্যান্য ভৃত্যরা সেখানে এসে হাজির হল।

অবিনাশবাবু বললেন, 'তোমরা সবাই লাঠি-সোঁটা নিয়ে তৈরি হও! জনকয় লোক আমাদের সঙ্গে থাকো, বাকি সবাই এই বাড়ির খিড়কির দরজার কাছে গিয়ে পাহারা দিক। কেউ যেন সে দরজা দিয়ে বাইরে বেরুতে না পারে। এসো রামচরণ, আমরা আবার উপরে যাই।'

অবিনাশবাবু সকলকে নিয়ে দোতলায় উঠে আবার পরীক্ষাগারের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং সেইখান থেকেই শুনতে পেলেন, ঘরের ভিতরে কে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে!

রামচরণ বললে, 'দিনে-রাতে যখুনি এখানে আসি, তখুনি শুনি ওর পায়ের শব্দ! এ শব্দের আর বিরাম নেই! রাতেও ঘুমোয় না, ঘরময় চলে বেড়ায়! আপনি ভালো করে কান পেতে শুনে দেখুন, ও কি আমার বাবুর পায়ের শব্দ?'

অবিনাশবাবু শুনে বুঝলেন, রামচরণের কথাই সত্য! জয়ন্তের পায়ের শব্দ অন্যরকমই বটে! তিনি বললেন, 'এই পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু তোমরা শুনেছ?'

রামচরণ বললে, 'শুনেছি। একদিন সে কাঁদছিল!'

—'কাঁদছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, সে স্ত্রীলোকের মতন কাতর ভাবে কাঁদছিল—যেন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে! সে-কান্না কান পেতে শোনা যায় না!'

অবিনাশবাবু গম্ভীর মুখে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন? তারপর চেঁচিয়ে বললেন, 'জয়ন্ত! আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই!'

ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এল না।

অবিনাশবাবু আবার বললেন, 'জয়ন্ত, আমাদের মনে সন্দেহ হয়েছে! হয় তুমি দরজা খোলো, নয় আমরা দরজা ভেঙে ফেলব!'

ঘরের ভিতর থেকে আকুল ভাবে কে বলে উঠল, 'অবিনাশ, অবিনাশ! দয়া করো—দরজা ভেঙো না!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এ তো জয়ন্তের গলা নয়—এ যে তিনকড়ির গলার আওয়াজ! রামচরণ, ভাঙো দরজা!'

দরজার উপরে কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল!

ঘরের ভিতরে কে দারুণ আতঙ্কে তীক্ষ্ণ স্বরে পশুর মতো আর্তনাদ করে উঠল! আরও বার-কয়েক কুড়ুলের ঘা খেয়েই দরজাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সকলে সভয়ে উঁকি মেরে ঘরের ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

ঘরের ঠিক মাঝখানে কার্পেটের উপরে একটা মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে তখনও কেন্নোর মতন কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে!

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সকলে ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল, দেখতে দেখতে তাদের চোখের সামনেই মূর্তিটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। অবিনাশবাবু দেহটাকে চিত করে শুইয়ে দিলেন। সে দেহ তিনকড়ি বটব্যালের!

তিনকড়ির গায়ে রয়েছে জয়ন্তের জামা-কাপড়। সে জামা-কাপড় তার ছোটো ও বেঁটে দেহের পক্ষে একেবারেই মানানসই হয়নি। তার মুখ তখনও কুঁচকে কুঁচকে উঠছিল বটে, কিন্তু দেহে জীবনের কোনও লক্ষণই ছিল না। তার মুঠোর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে একটা ওষুধের শিশি!

অবিনাশবাবু বললেন, 'আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়তে পারলুম না! একে আর আমরা বাঁচাতেও পারব না, শাস্তি দিতেও পারব না! তিনকড়ি বিষ খেয়েছে। এখন দেখা যাক জয়ন্তের দেহ কোথায় আছে।'

তারপর জয়ন্তের দেহের জন্যে খোঁজাখুঁজি শুরু হল। টেবিলের তলা, আলমারি, দেরাজ ও সমস্ত অলি-গলি তন্নতন্ন করে খোঁজা হল, কিন্তু জয়ন্তের দেহ কোথাও পাওয়া গেল না।

অবিনাশবাবু বললেন, 'তাহলে জয়ন্ত হয়তো এখান থেকে পালিয়ে গেছে!'

রামচরণ কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, 'না, না—ওই শয়তান আমার বাবুর দেহকে

কোথাও পুঁতে রেখেছে!'

অবিনাশবাবুর দৃষ্টি হঠাৎ টেবিলের উপরে পড়ল। টেবিলের উপরে একটা বড়ো কাগজের মোড়ক রয়েছে—তার উপরে লেখা, 'শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন'!

অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি মোড়কটা খুলে ফেললেন। প্রথমেই তাঁর নাম-লেখা একখানা ছোটো খাম ও সেইসঙ্গে একতাড়া কাগজ পাওয়া গেল। কাগজগুলোর উপরে বড়ো বড়ো হরফে লেখা রয়েছে—'আমার উইল'। সে উইলখানাও ঠিক আগেকার উইলের মতনই অদ্ভুত, আগেকার উইলের সব কথাই তার ভিতরে আছে, কেবল তিনকড়ি বটব্যালের নামের বদলে রয়েছে অবিনাশবাবুরই নিজের নাম! জয়ন্ত তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি অবিনাশবাবুকে দান করেছেন!

অবিনাশবাবুর মাথা ঘুরতে লাগল, আপন চোখকেও তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না! অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'এও কি সম্ভব? তিনকড়ি আজ সাত দিন এই ঘরে রয়েছে, তবু এ উইল সে ছিঁড়ে ফেলে দেয়নি?'

আপনাকে সামলে নিয়ে অবিনাশবাবু তাঁর নাম লেখা খামখানা ছিঁড়ে ফেললেন। চিঠিখানা খুলে তার তারিখ দেখেই তিনি সচকিত স্বরে বলে উঠলেন, 'রামচরণ, রামচরণ! জয়ন্ত বেঁচে আছে! এ-চিঠির উপরে আজকেরই তারিখ লেখা রয়েছে! জয়ন্ত যদি আজকেই মারা যেত, তাহলে তিনকড়ি এর মধ্যেই তার দেহকে কখনও সরিয়ে ফেলতে পারত না! কিন্তু জয়ন্ত কেন পালাল? তিনকড়ি কেন আত্মহত্যা করলে? সমস্তই যে ধাঁধার মতন মনে হচ্ছে!'

খানিকক্ষণ চিন্তিতমুখে বসে থাকবার পর অবিনাশবাবু চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। চিঠিখানা ছোটো। তাতে লেখা রয়েছে

'ভাই অবিনাশ,

এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে, তখন তুমি আর আমাকে খুঁজে পাবে না। কী কারণে এবং কেমন করে আমি যে অদৃশ্য হব, সেটা এখনও বুঝতে পারছি না। তবে আমার পরিণাম যে ঘনিয়ে এসেছে, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। করুণার মুখে শুনেছি, আমার সম্বন্ধে যা সত্য কথা, সেটা সে লিখে তোমার কাছে পাঠিয়েছে; এবং আমি বর্তমান থাকতে সে-ইতিহাস তোমাকে পাঠ করতে নিষেধ করে গেছে। আমার অনুরোধ, তুমি আগে সেই ইতিহাস পাঠ করো। তাতেও যদি তোমার সন্দেহ দূর না হয়, তাহলে এই মোড়কের ভিতরে আমি আমার যে স্বীকার-উক্তি লিখে রেখে গেলুম, তা পড়ে দেখলেই তোমার কাছে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইতি

তোমার অসুখী ও অভাগা বন্ধু

জয়ন্ত'

অবিনাশবাবু মোড়কের ভিতরে আর একতাড়া কাগজ পেলেন। সেইগুলো হাতে করে নিয়ে তিনি বললেন, 'রামচরণ, এ কাগজগুলো অত্যন্ত গোপনীয়। এর কথা কারুর কাছে বলবার দরকার নেই। আগে এগুলো আমি পড়ে দেখি, তারপরে পুলিশে খবর দিলেই চলবে।'

॥ নবম ॥

করুণার কাহিনি

করুণার আত্মকাহিনি বার করে অবিনাশবাবু পড়তে লাগলেন

দিন-চারেক আগে, একদিন সন্ধেবেলায় আমি একখানা রেজিস্টারি করা চিঠি পেলুম। চিঠিখানা এসেছে আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী জয়ন্তের কাছ থেকে। চিঠি পেয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কারণ, তার আগের রাত্রেই জয়ন্তের বাড়িতে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প-স্বল্প করে ফিরে এসেছি। হঠাৎ এরই-মধ্যে এমন কী ব্যাপার ঘটল যে, আমাকে রেজিস্টারি করে চিঠি লেখবার দরকার হল? চিঠিখানা পড়ে আমার বিস্ময় আবার আরও বেড়ে উঠল। কারণ চিঠিতে জয়ন্ত এই কথাগুলি লিখেছিলেন

'ভাই করুণা,

আমার পুরানো বন্ধুদের ভিতরে তুমি হচ্ছ প্রধান একজন। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক মতভেদ হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে স্নেহ ও ভালোবাসার অভাব হয়নি কোনওদিন।

তুমি যদি কোনওদিন এসে আমাকে বলতে যে, 'জয়ন্ত, আমার জীবন আর সম্মান বিপন্ন হয়েছে, তুমি আমাকে রক্ষা করো,' তাহলে আমি আমার সর্বস্ব তোমাকে দান করতে পারতুম! —করুণা, আমারই জীবন ও সম্মান বিপন্ন হয়েছে, তুমি আমাকে রক্ষা করো! তুমি যদি আমার কথায় কান না পাতো, তাহলে আমার সর্বনাশ হবে! অবশ্য তোমার কাছ থেকে আমি যা প্রার্থনা করছি তা অন্যায় কি না, তুমি নিজেই বিচার করে দ্যাখো।

আজ সন্ধ্যায় যদি তোমার কোনও কাজ থাকে, তার কথা একেবারে ভুলে যাও। আজ তোমাকে ভারতসম্রাট আমন্ত্রণ করলেও বাড়ি থেকে তুমি এক পা বেরিয়ো না। যে-চিঠিখানা তুমি এখন পড়ছ, সেইখানা হাতে করে তুমি সিধে আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে। সেখানে রামচরণ আছে—সে-ও আমার হুকুম পেয়েছে। রামচরণ তোমাকে আমার পরীক্ষাগারে নিয়ে যাবে। সেই ঘরে গিয়ে তুমি টেবিলের ডান দিকের দেরাজটা খুলে ফেলবে। দেরাজের নীচের তাকে একটি কালো রঙের বাক্স আছে। সেই বাক্সটি নিয়ে খুব

সাবধানে তুমি আবার তোমার নিজের বাড়িতে ফিরে আসবে। এই কথাগুলি তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন কোরো।

আমার এই চিঠি নিশ্চয়ই তুমি সন্ধ্যার সময় পাবে। তারপর গাড়ি করে আমার বাড়িতে গিয়ে ফিরে আসতে তোমার বেশিক্ষণ লাগবে না। সুতরাং আমি ধরে নিতে পারি দুপুর রাতে তুমি নিজের বাড়ির ভিতরেই থাকবে। এবং আশা করি তখন তোমার বাড়ির চাকর-বাকর ও অন্যান্য লোকজন কেউ জেগে থাকবে না।

কিন্তু তুমি জেগে থেকো। আর একলা থেকো। রাত বারোটা বাজলেই আমার এক দূত তোমার কাছে গিয়ে হাজির হবে। এবং তোমার কাছে সে আমার নাম করলেই তুমি সেই কালো বাক্সটা তার হাতে সমর্পণ কোরো। এই কাজগুলি করলেই তোমার কর্তব্য শেষ হবে। সাবধান, এর মধ্যে যেন একটিও গলদ না হয়! কারণ তোমার সামান্য ভুলচুকেই আমার জীবন পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে।

আমার এই অদ্ভুত প্রার্থনা শুনে তুমি বিস্মিত হবে নিশ্চয়ই! কিন্তু বন্ধু, যতই বিস্মিত হও, আমার কথায় অবহেলা কোরো না। আমি এক অজানা অচেনা জায়গায় বিপদ-সাগরে ভাসছি, একমাত্র তুমিই আমাকে কূলে এনে তুলতে পারো। করুণা, তোমার বন্ধুকে রক্ষা করো। ইতি

তোমার বিপন্ন বন্ধু
জয়ন্ত'

পত্রখানা পড়ে প্রথমে আমি ভাবলুম, জয়ন্ত একেবারে পাগল হয়ে গেছে! কিন্তু তার পরেই মনে হল, এখনও যখন তার পাগলামির চাক্ষুষ পরিচয় পাইনি, তখন জয়ন্তের কথামতো কাজ আমাকে করতে হবেই। তখনই উঠে গাড়ি করে জয়ন্তের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। রামচরণকে দেখে মনে হল সে যেন আমার পথ চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে। তারপর জয়ন্তের ঘরে গিয়ে টেবিলের দেরাজ খুলে সেই কালো বাক্সটা নিয়ে আবার নিজের বাড়িতে ফিরে এলুম।

বাড়িতে এসে কেমন কৌতূহল হল, কালো বাক্সের ভিতরে কী আছে তা দেখবার জন্যে। বাক্সের ডালাটা খুলে ফেললুম। প্রথমেই চোখে পড়ল কতকগুলি শিশি। সেসব শিশির কোনওটার ভিতরে রয়েছে রক্তের মতো টকটকে লাল কী তরল পদার্থ আর কোনও কোনওটাতে বা সাদা কি অন্য রঙের গুঁড়ো ওষুধ। একখানা ছোটো ডায়েরির মতো বইও দেখলুম, কিন্তু তার পাতাগুলো উলটে কিছুই বুঝতে পারলুম না। খালি কতকগুলো তারিখ আর কতকগুলো অঙ্ক! মাঝে মাঝে কেবল এই দুটি কথা লেখা আছে—'আমার প্রতিরূপ' ও 'একেবারে ব্যর্থতা'! এই দুটি কথা আমার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুললে বটে, কিন্তু আসল কোনওই জানবার কথা জানতে পারলুম না।

এই ওষুধের বাক্সটা আমার বাড়িতে থাকলেই যে জয়ন্তের জীবন ও সম্মান রক্ষা পাবে,

এ রকম কথার অর্থ কী? জয়ন্তের দূত আমার বাড়িতে এসে যখন বাক্সটা নিয়ে যেতে পারে, তখন তার নিজের বাড়িতেই সে তাকে পাঠালে না কেন? আর আমার সঙ্গে গভীর রাত্রে, সকলের অগোচরেই বা সে দেখা করতে আসবে কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে মনে হল যেন মস্ত এক প্রহেলিকা! যা হোক, তবু জয়ন্তের কথামতো আমি বাড়ির সকলকে সেদিন সকাল সকাল ঘুমোতে যেতে বললুম।

ঘড়িতে বাজল রাত বারোটা। সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম সদর দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ! আমি নিজেই নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বামনের মতন বেঁটে লোক।

শুধোলুম, 'আপনি কি জয়ন্তডাক্তারের কাছ থেকে আসছেন?'

সে শুধু বললে, 'হ্যাঁ।'

তাকে বাড়ির ভিতরে আসতে বললুম। সে আমার কথায় কান না দিয়ে প্রথমটা একবার পিছন দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। একটা পাহারাওয়ালা পায়ে পায়ে এই দিকেই আসছিল। সে তাকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠল। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল।

তার এমনধারা রকম-সকম আমার ভালো লাগল না। ঘরের ভিতরে এসে উজ্জ্বল আলোতে আমি তাকে স্পষ্টভাবে দেখবার সুযোগ পেলুম। জীবনে তাকে আর কখনও দেখিনি। সে যে বেঁটে এ কথা আগেই বলেছি, তার গড়নও যেন কেমন হাড়গোড় ভাঙা দয়ের মতন। আর তার মুখটা দেখলেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে! এ রকম বিশ্রী, ভয়াল চেহারা খুব কমই নজরে পড়ে।

তার চেহারা দেখলে যেমন ঘৃণা হয়, তার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলেও তেমনি হাসি পায়। তার জামা-কাপড় দামি ও বিলাসীর উপযোগী। কিন্তু সে জামা-কাপড় তার চেয়েও ঢের বেশি-ঢ্যাঙা কোনও লোকের গায়েই মানাত ভালো। এ রকম বেঢপ দেহে এমন সুন্দর অথচ বেমানান জামা-কাপড় পরে কোনও ভদ্রলোক যে রাস্তায় বেরুতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। নিজের চারিদিকে কেমন-একটা ঘৃণ্য, ভয়াবহ ও রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করে সেই কিম্ভুতকিমাকার জীবটা যেন ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। এবং এটাও লক্ষ করলুম, একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তার মুখ-চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে!

সে ভাঙা ভাঙা কর্কশ স্বরে আমাকে শুধোলে, 'বাক্সটা এনেছেন কি? বাক্সটা?'—বলতে বলতে অত্যন্ত অধীর ভাবে হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ ধরে সে নাড়া দিতে লাগল।

তার হাতের ছোঁয়ায় আমার গায়ের ভিতর দিয়ে যেন খানিকটা বরফের স্রোত বয়ে গেল। আমি তার হাতখানা ধরে তাকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে বিরক্ত স্বরে বললুম, 'এতটা ব্যস্ত হবেন না মশাই, থামুন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় পর্যন্ত নেই! ইচ্ছা করেন তো বসতে পারেন।'—বলে আমি নিজেই আগে আসন গ্রহণ করলুম।

লোকটা নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ ভদ্র ভাবেই বললে, 'মাপ করুন করুণাবাবু, আমার অন্যায় হয়েছে। ব্যাপারটা এতই গুরুতর যে আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না! বুঝতেই পারছেন তো, জয়ন্তবাবু কী জন্যে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন........তাঁর টেবিলের দেরাজে........একটা কালো বাক্স—' বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর যেন বন্ধ হয়ে এল!

তার অবস্থা দেখে আমার মায়া হল। টেবিলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমি বললুম, 'বাক্সটা ওইখানেই আছে, দেখতে পাচ্ছেন তো?'

সে এক লাফে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার পরেই একটা ঢোঁক গিলে বুকের উপরে হাত দিয়ে থেমে পড়ল। তার অবস্থা দেখে আমার ভয় হল, হয় সে এখনই মারা পড়বে, নয়তো পাগল হয়ে যাবে!

আমি বললুম, 'মশাই, নিজেকে সামলে নিন!'

আমার পানে তাকিয়ে সে একটা ভীতিকর হাসি হাসলে। তারপর টেবিলের উপর থেকে টপ করে বাক্সটা তুলে নিয়ে তার ডালাটা ফেললে খুলে। বাক্সের ভিতরে দৃষ্টিপাত করে বিপুল আনন্দে সে এমন চিৎকার করে উঠল যে, আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম!

তারপর সে সহজ ভাবেই বললে, 'আপনার ঘরে একটা মেজার-গ্লাস আছে?'

আমি তার প্রার্থনা পূর্ণ করলুম।

আমার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করে সে গেলাসের ভিতরে খানিকটা রাঙা তরল পদার্থ ঢেলে তাতে আবার কিছু সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে দিলে। জলে সোডা ঢাললে যেমন হয়, গেলাসের ভিতরে তরল জিনিসটা তেমনি বুড়বুড়ি কাটতে লাগল। তারপর সেই রাঙা রংটা প্রথমে কমলা ও পরে পাতলা-সবুজে পরিণত হল। লোকটা এতক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গেলাসের ভিতরে এই পরিবর্তন লক্ষ করছিল। এখন গেলাসটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে সে আমার দিকে চেয়ে চোখ তুলে মৃদু হাস্য করলে।

তারপর সে বললে, 'এখন আপনি কী করতে চান? এই গেলাসটা হাতে করে আমাকে কি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে বলবেন? না, এর পরে আমি কী করব সেটা দেখবার জন্যে আপনার কৌতূহল হচ্ছে? বেশ করে ভেবে জবাব দিন, কারণ আপনি যা বলবেন আমি ঠিক তাই-ই করব! অবশ্য, আমি এখানে থাকি আর না থাকি, তাতে আপনার লাভও নেই অলাভও নেই। তবে যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলে আমি এখুনি আপনার জ্ঞান-চক্ষু খুলে দিতে পারি!'

আমি খুব কঠোর স্বরে কথা কইবার চেষ্টা করে বললুম, 'মশাই, আপনি হেঁয়ালির ভাষায় কথা কইছেন, ও-রকম কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আপনাদের এই অদ্ভুত লুকোচুরির ভিতরে আমিও জড়িয়ে পড়েছি, এখন শেষ পর্যন্ত না দেখে আর ছাড়ব না।'

লোকটা গম্ভীর স্বরে বললে, 'করুণা, বেশ কথা বলেছ! কিন্তু শোনো। এখনই যা দেখবে, সেটা কেবল তুমিই দেখবে,—সে-কথা আর কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে! তুমি

বড়ো অবিশ্বাসী, না করুণা? তোমার সঙ্কীর্ণ মন আমার বৈজ্ঞানিক মত মানেনি, দ্রব্যগুণের কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে! আজ স্বচক্ষে বিজ্ঞানের শক্তি দ্যাখো!'

ওষুধের গেলাসটা সে ঠোঁটের কাছে তুলে এক চুমুকেই শেষ করে ফেললে এবং আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল! তারপর সে ঘুরতে ঘুরতে ও টলতে টলতে পড়ে যেতে যেতে টেবিলের একটা কোণ দুই হাতে চেপে ধরে নিজেকে কোনওরকমে সামলে নিলে এবং আড়ষ্ট চোখে ঘনঘন হাঁপাতে লাগল!

তারপর সে কী বীভৎস স্বপ্নই আমার চোখে জেগে উঠল! আমি যেন স্বচক্ষেই দেখলুম, তার দেহ ক্রমেই ফুলে বড়ো হয়ে উঠছে এবং তার আগেকার দেহের গড়ন যেন ক্রমেই বদলে মিলিয়ে যাচ্ছে! তারপরে যা দেখলুম, তাতে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না—চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালের উপরে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে ভীষণ আতঙ্কে আমি বারবার চ্যাঁচাতে লাগলুম—'ভগবান! ভগবান! ভগবান!'

—আমার চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে যেন মৃত্যুর ভিতর থেকে জীবনলাভ করেই, বিবর্ণ-মুখে অন্ধের মতো শূন্যে দুই হাত বাড়িয়ে যে-মূর্তি একটা অবলম্বন খুঁজছে, সে আর কেউ নয়—আমার বন্ধু জয়ন্ত!

.....তারপর জয়ন্ত আমার কাছে বসে তার যে দীর্ঘ কাহিনি বর্ণনা করলে, তা প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই। আমি যা দেখেছি, যা শুনেছি তা শুনেছি,—আমার সমস্ত আত্মা এখনও সঙ্কুচিত হয়ে আছে! আমি যা দেখেছি আর শুনেছি তা বিশ্বাস করব কি না জানি না। কিন্তু আমার জীবনের ভিত্তি পর্যন্ত আলগা হয়ে গেছে। রাত্রে আমি ঘুমোতে পারি না—চোখের সামনে যেন একটা দারুণ আতঙ্ক সর্বদাই মূর্তি ধরে বসে থাকে—আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে, তবু আমাকে বোধহয় অবিশ্বাসী হয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে।

অবিনাশ, কিন্তু তোমাকে একটা কথা আমি বলে রাখি। নিশুত রাতে আমার ঘরে সেদিন যে-জীবটার আবির্ভাব ঘটেছিল, নরহত্যাকারী তিনকড়ি নামেই সে তোমাদের সকলের কাছে পরিচিত!

॥ দশম ॥

জয়ন্তের আত্মকাহিনি

অবিনাশ, জন্ম আমার বড়োলোকের ঘরে। কিন্তু ধনীর ছেলে হলেও আমার লেখাপড়ার কোনও ত্রুটিই হয়নি। লেখাপড়া সাঙ্গ করে যখন আসল জীবন শুরু করলুম, তখন আমার ভবিষ্যৎ ছিল খুবই উজ্জ্বল।

আমার প্রকৃতিটা ছিল অদ্ভুত। একদিকে আমি ছিলুম যেমন আমোদপ্রিয় ও চপল-স্বভাব,

অন্যদিকে তেমনি গম্ভীর। এই চপলতা ও গাম্ভীর্যকে আমি কখনও এক করে ফেলতুম না। আমোদের ঝোঁকে আমি এমন সব অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, আমার প্রকৃতির গাম্ভীর্য কোনওদিন তাতে সায় দেয়নি। কিন্তু লোকের কাছে আমার এই চপল স্বভাবকে বরাবরই আমি লুকিয়ে এসেছি। লোকে বরাবরই জানে যে আমি হচ্ছি একজন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, হাল্কা আমোদপ্রমোদে মেতে কখনও কোনও অন্যায় কাজ করতে পারি না। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুও আমার এই গুপ্ত আমুদে স্বভাবের পরিচয় পাননি। এইখানে সকলের চোখে এতদিন ধুলো দিয়ে এসেছি।

আদিম কাল থেকেই মানুষের এই দুর্বলতা আছে। সে নিজের চরিত্রের সমস্তটা কোনওদিনই সকলের সামনে খুলে দেখায়নি। সুন্দর মুখোশ পরে সে তার চরিত্রের কদর্যতা গোপন করেছে। যে শয়তান, সে সাধুর ছদ্মবেশে দশজনের মাঝখানে আনাগোনা করে। মানুষ এই লুকোচুরি-বিদ্যাতে পাকা হয়ে উঠেছে।

আমি যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে জীবনের অনেক দিন কাটিয়েছি, একথা তোমরা সকলেই জানো। আমি এমন সব অদ্ভুত বিষয় নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষা করেছি, আর কোনও বৈজ্ঞানিক কখনও যা করেননি। আমার এই সব পরীক্ষা নিয়ে অনেকে অনেকরকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু আমি কোনওদিনই সেসব গায়ে মাখিনি। ওই অবিশ্বাসীদের মধ্যে আমাদের করুণা ছিল প্রধান একজন।

মানুষের প্রকৃতির ওই দু-রকম ভাবকে দুটো সম্পূর্ণ-স্বাধীন আলাদা অংশে বিভক্ত করা যায় কি না, এই নিয়ে অনেক দিন ধরে চিন্তা ও পরীক্ষা করে আসছি। আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু প্রকৃতির সঙ্গে এই অসাধু প্রকৃতির মিলন পৃথিবীর সুখ-সৌভাগ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। সাধুতা ও অসাধুতা যদি নিজের নিজের উপযোগী মূর্তি ধারণ করে আপন-আপন পথে আলাদা হয়ে চলতে পারে, তাহলে তারা অনেক অশান্তির কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। সু, যোগ্য-রূপে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে আত্মনিয়োগ করতে পারে, কু-র কুকার্যের জন্যে তাকে আর অনুতপ্ত ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় না। কু, নিজের মনের খুশিতে নরকের পথে এগিয়ে যেতে পারে, সু-র কাছ থেকে তাকে ধমক খেতে ও বাধা পেতেও হয় না। মনের ভিতরে সু ও কু-র দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রায় প্রতি কবিই অনেক কথা বলেছেন। সেই দ্বন্দ্ব যাতে বন্ধ হয় এবং সু আর কু আলাদা আলাদা রূপ পায়, তাই নিয়ে আমি প্রাণপণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলুম।

এই পরীক্ষার ভিতরের কথা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না। কারণ প্রথমত, যাঁরা বৈজ্ঞানিক নন তাঁরা আমার কথা বুঝতে পারবেন না; দ্বিতীয়ত, আমার পরীক্ষা যে অসম্পূর্ণ এ কথা আজ নিজেই বুঝতে পারছি; এই অসম্পূর্ণ পরীক্ষার গুপ্তকথা প্রকাশ করে দিলে পৃথিবীতে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হবে—কেন না জগতে দুষ্ট মানুষের কোনওই অভাব নেই।

আজ মনে হচ্ছে, পরীক্ষায় এমন আংশিক ভাবে সফল না হলেই, সেটা হত আমার পক্ষে মস্ত এক আশীর্বাদ। এই বিপুল পৃথিবী ও সমস্ত জীব যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই শক্তিমান স্রষ্টার বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে আমার আত্মাকে আমি বিপদগ্রস্ত করেছি।

যেদিন আমার বিশ্বাস হল যে পরীক্ষায় আমি সফল হয়েছি, সেদিন আমার মনে খুবই আনন্দ হল বটে, কিন্তু নিজের উপরে নিজের আবিষ্কৃত এই ঔষধটা প্রয়োগ করতে সাহস হল না সহজে। কারণ একই আত্মার দুই প্রকৃতির ভিতর থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটো দেহ আত্মপ্রকাশ করবে, এটা একটা সাধারণ ব্যাপার নয়! একটু এদিক-ওদিক হলেই মৃত্যুর সম্ভাবনা! এমনি ইতস্তত করতে করতে অনেক দিন কেটে গেল। কিন্তু শেষটা এই অভাবিত আবিষ্কারের প্রলোভন আমি আর সামলাতে পারলুম না। এক অভিশপ্ত রাত্রে সমস্ত ভয়-ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়ে দুর্জয় সাহসে আমি আমার আবিষ্কৃত এই ঔষধটা গলাধঃকরণ করলুম।

তারপর, সে কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! আমার দেহের সমস্ত হাড় ও মাংস যেন কে জাঁতাকলে ফেলে পেষণ করতে লাগল—চোখের সুমুখ থেকে পৃথিবীর সমস্ত দীপ্তি ধীরে ধীরে নিবে গেল! ......ক্রমে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা আবার কমে এল এবং আমার মনে হল যেন আমি এক সাংঘাতিক ব্যাধির কবল থেকে মুক্তিলাভ করলুম! অনুভব করলুম, আমার ভিতরে যেন এক অবর্ণনীয়, বিস্ময়কর ও অপূর্ব-মধুর নূতনত্বের সঞ্চার হয়েছে! আমার দেহ যেন ঢের বেশি হাল্কা, তরুণ ও সুখি হয়ে উঠেছে! আমি যেন এখন অকুতোভয়ে পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে দুর্দমনীয় বেগে ছুটোছুটি করতে পারি! সেই সঙ্গে এটাও আমি বুঝতে পারলুম যে, আমার প্রাণ এখন দানবের মতন নিষ্ঠুর ও হিংসুক হয়ে উঠেছে,—কিন্তু তা জেনেও আমার মন দুঃখিত হল না মোটেই! দু-দিকে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে আমার এই তাজা আনন্দটাকে উপভোগ করতে গিয়ে হঠাৎ আমি টের পেলুম, আমার দেহ আকারে আরও ছোটো হয়ে গিয়েছে!

তাড়াতাড়ি একখানা বড়ো আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম এবং দেখলুম সেই জীবটাকে সর্বপ্রথমে, তোমরা সবাই যাকে তিনকড়ি বটব্যাল বলে জানো!

পরে আমার এই আকারের ক্ষুদ্রতার কারণ বুঝেছিলুম। আমার ভিতরে যে দুষ্ট প্রকৃতি লুকিয়েছিল, আমার সাধু প্রকৃতির মতন সেটা বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান ও পূর্ণগঠন হতে পারেনি। আমার জীবনের বেশি দিন কেটেছে সাধু ভাবেই, কাজেই এই অসাধু ভাবটা খুব বেশি প্রবল হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়নি কোনও দিনই। এইজন্যেই ডাক্তার জয়ন্তের চেয়ে তিনকড়ি বটব্যালের দেহ হয়েছে আরও তরুণ, আরও হাল্কা ও আরও ক্ষুদ্র! ডাক্তার জয়ন্তের মুখে আঁকা আছে যেমন সাধুতার প্রতিচ্ছবি, তিনকড়ি বটব্যালের মুখের উপরেও ফুটে উঠেছে তেমনি কুৎসিত ভাবের জ্বলন্ত ইতিহাস!

কিন্তু আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমার মনে কোনওরকম ঘৃণা বা লজ্জা হল না।

ওই তিনকড়ি—ও তো আর কেউ নয়, ও যে আমিই নিজে! পরে আমি নিজের মূর্তি ধারণ করে অনেকবারই শুনেছি যে, তিনকড়ি বটব্যালের চেহারা দেখে সকলেরই প্রাণে আতঙ্কের উদয় হয়! এর কারণ আর কিছু নয়, সকল মানুষের দেহই ভালোয় ও মন্দে গড়া,—কিন্তু একমাত্র তিনকড়ি বটব্যালেরই দেহ হচ্ছে, সম্পূর্ণ ভাবে মন্দ দিয়ে গড়া!

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বুঝতে পারলুম, ডাক্তার জয়ন্তের বাড়িতে তিনকড়ি বটব্যালের ঠাঁই হতে পারে না। তিনকড়ি যখন মূর্তি ধারণ করবে, তখন তাকে অন্য কোথাও গিয়ে বাস করতে হবে!

তারপর দ্বিতীয় বার সেই ঔষধ গলায় ঢেলে আবার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে আমি নিজের আসল মূর্তি ফিরে পেলুম!

খুব ভেবে-চিন্তে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করতে লাগলুম। ব্রজদুলাল স্ট্রিটে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে ঘরদোর সাজিয়ে ফেললুম। নিজের চাকর-বাকরদের বলে দিলুম যে, তিনকড়ি বটব্যাল বলে কোনও লোক এ-বাড়িতে এলে তারা যেন তার হুকুমকে আমার হুকুম বলেই মনে করে। এমনকি নিজেই তিনকড়ির মূর্তি ধারণ করে বার-কয়েক এ বাড়িতে এসে আমার এই নতুন চেহারাটা ভৃত্যদের কাছে সুপরিচিত করে তুললুম। ডাক্তার জয়ন্তের কোনও বিপদ হলে তিনকড়িও পাছে বিপদগ্রস্ত হয়, সেই ভয়ে তোমাকে দিয়ে একখানা নতুন উইল তৈরি করিয়ে রাখলুম। এইভাবে আট-ঘাট বেঁধে আমি আমার নতুন জীবনের জন্যে প্রস্তুত হলুম।

অনেকে নিজে নিরাপদে আড়ালে থাকবার জন্যে গুন্ডা ভাড়া করে অন্যায় কাজ করে। কিন্তু আমি হচ্ছি এই পৃথিবীর মধ্যে প্রথম লোক, আপনাকে নিরাপদে রাখবার জন্যে যাকে অন্যের অন্যায় সাহায্য নিতে হয়নি। ডাক্তার জয়ন্ত রূপে সৎ লোকের সমাজে সাধু ভাবে মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে আমি বেড়াতে পারি, আবার ইচ্ছা করলেই চোখের নিমেষে তিনকড়ি সেজে সকলের সামনে যা-খুশি তাই করতে পারি। চুরি করি, জুয়াচুরি করি আর নরহত্যাই করি, কেউ আমার একগাছা কেশও স্পর্শ করতে পারবে না। আমাকে দু-মিনিট সময় দাও, একবার পরীক্ষাগারের ভিতরে যেতে দাও—তারপর? তারপর তিনকড়ি বটব্যাল উপে যাবে কর্পূরের মতন! পুলিশ নিয়ে সেইখানে গিয়ে হাজির হও এবং সবিস্ময়ে চেয়ে দ্যাখো, সেখানে সহাস্য মুখে দাঁড়িয়ে তোমাদের সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করছেন বিখ্যাত ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায়, যাঁর সুনাম ও সুচরিত্রের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরছে দিন-রাত!

তিনকড়ি রূপে শহরের পাড়ায় পাড়ায় আমি যেসব কাজ করে বেড়াতুম সত্যিই তা হীন, নিষ্ঠুর ও ভয়ানক! কোনও মানুষই—যার প্রাণে মন্দের সঙ্গে এতটুকু ভালোও আছে—এমন সব জঘন্য কাজ করতে পারে না! সময়ে সময়ে তিনকড়ির কার্যকলাপ দেখে ডাক্তার জয়ন্ত পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। কিন্তু ক্রমেই এসব ব্যাপার তাঁর কাছে সহজ হয়ে উঠল। এ

জন্যে দায়ী তিনি নন, তিনকড়ি একলাই দোষী! জয়ন্ত যখন আকার ধারণ করেন তখন তাঁর সাধুতার গায়ে তো কোনও আঁচ লাগে না! বরং তিনকড়ি কোনও ভুল করে ফেললে জয়ন্ত নিজের নামের জোরে আবার তা শুধরে নিতে লাগলেন! এই ভাবে তাঁরও বিবেক-বুদ্ধি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে একদিন এক কাণ্ডের পর সদানন্দবাবুর সঙ্গে তিনকড়ির পরিচয়! তারপর যে-সব ঘটনা ঘটেছে তোমার তা মনে আছে, আমি আর তা নিয়ে আলোচনা করব না। কেবল একদিনের কথাই বলব।

একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে হল, আমি যেখানে আছি সেখানে থাকা আমার উচিত নয়! ব্রজদুলাল স্ট্রিটের বাড়িই হচ্ছে আমার আসল থাকবার ঠাঁই,—কিন্তু তার বদলে এ যে দেখছি ডাক্তার জয়ন্তের ঘর ও বিছানা,—এ বিছানায় আমি কোনও দিনই তো শয়ন করতে অভ্যস্ত নই!

মনে মনে হেসে খানিকক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে এই অদ্ভুত ভাবটা আমি মন থেকে মুছে ফেললুম......হঠাৎ নিজের হাতের দিকে আমার নজর পড়ল। ডাক্তার জয়ন্তের হাত হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চ্যাটালো ও মসৃণ! কিন্তু ভোরের অপ্রখর আলোকে আমি নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, এ-হাতখানা হচ্ছে মলিন, ছোটো, রোগা, দড়ির মতন পাকানো ও কালো কালো লম্বা চুলে ভরা। এ হাত হচ্ছে তিনকড়ি বটব্যালের হাত!

প্রায় আধ মিনিট ধরে আমার হাতের দিকে নিষ্পলক নেত্রে আমি তাকিয়ে রইলুম! বিস্ময়ের প্রথম চমক কাটার সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ এক বিভীষিকায় আমার মনটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল—খাট থেকে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে আমি আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। কী দেখলুম জানো? আরশির ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে তিনকড়ি বটব্যাল! ডাক্তার জয়ন্ত রূপে কাল রাত্রে আমি শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলুম, আর আজ সকালে জেগে উঠেছি তিনকড়ি বটব্যাল রূপে! এই অভাবিত পরিবর্তনটা হয়েছে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এবং অজ্ঞাতসারেই!

এখন উপায়? পরিবর্তনের কারণের কথা পরে ভাবা যেতে পারে, কিন্তু তিনকড়ি বটব্যাল এখন কী করবে? এ বাড়ি থেকে ও বাড়িতে আমার পরীক্ষাগারে যেতে গেলে অনেকটা পথ পার না হলে নয়। চাকর-বাকররা দেখে ফেললে কী মনে করবে?

তারপরেই বুঝতে পারলুম, তিনকড়িকে এ বাড়িতে দেখে দেখে সকলে যখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তখন এই অসময়েও তাকে দেখলে তারা বড়ো-জোর খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থাকবে। হলও তাই। ও-বাড়িতে যাবার সময় রামচরণ ও অন্যান্য সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আমার চোখ এড়াল না। ......দশ মিনিট পরে ডাক্তার জয়ন্ত রূপে আবার আমি নিজের ঘরে ফিরে এলুম।

সেদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা আমি প্রায় ভুলে গেলুম বললেই হয়। সারাক্ষণই দুর্ভাবনার

ভিতর দিয়ে কাটতে লাগল। কারণ কী, কারণ কী? বিনা ঔষধে ডাক্তার জয়ন্তের দেহের ভিতর থেকে তিনকড়ির আবির্ভাবের কারণ কী? অনেক ভেবে আন্দাজ করলুম, ঘন ঘন রূপান্তর গ্রহণ করে আমি বোধহয় ডাক্তার জয়ন্তের চেয়ে তিনকড়ির দেহকেই সবল করে তুলেছি! এখন হয়তো তিনকড়ির মূর্তিই আমার স্বাভাবিক মূর্তি হয়ে ওঠবার উপক্রম হয়েছে!

কিন্তু তিনকড়ির মূর্তি ধারণ করে আমি যতই পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করি, তবু আমার পক্ষেও তাকে পছন্দ করা অসম্ভব। ডাক্তার জয়ন্ত—দেশের ও দশের মাঝখানে সকলেই তাঁকে সম্মান করে ও ভালোবাসে, তাঁর বন্ধুবান্ধব, খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সৌভাগ্যেরও অভাব নেই,—আর তিনকড়ি? তাকে এই পৃথিবীর সকলেই নরকের কীটের মতন মনে করে এবং তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেবার জন্যে সকলেই প্রস্তুত হয়ে আছে! আমাকে যদি এই পৃথিবীতে বাঁচতে হয় তবে জয়ন্ত রূপেই বাঁচতে হবে, আর তিনকড়িকে পাঠাতে হবে চিরনির্বাসনে।

মনে মনে এই দৃঢ়-সংকল্প করলুম এবং এ সংকল্প স্থির রইল দুই মাস পর্যন্ত। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, মাঝে দুই মাস আমি সকলের সঙ্গে মন খুলে মেলামেশা করছিলুম? কিন্তু তার পরেই আবার আমার মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। দিন-রাতই আমার হৃদয়-কারাগারের ভিতর থেকে তিনকড়ির মুক্তি-প্রার্থনা শুনতে লাগলুম! তারপর আবার এক দুর্বল মুহূর্তে আমি সেই ঔষধ পান করলুম। আমার চরম দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত এইখানেই।

অনেক কাল মদ্যপান বন্ধ রেখে মাতাল যদি আবার নতুন করে মদ্যপান শুরু করে, তাহলে সে আর নেশার মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না। আমারও অবস্থা হল সেই রকম। এতদিন আমার দেহহীন অসাধু প্রকৃতি যে নিষ্ফল আক্রোশে ও অবরুদ্ধ আবেগে নীরবে হাহাকার করছিল, আজ আবার নতুন করে দেহ ও স্বাধীনতা লাভ করে সে একেবারে দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। তিনকড়ির মূর্তি ধারণ করে বিরাট এক পৈশাচিক উল্লাসে ও ভীষণ এক হিংসা-পূর্ণ আনন্দে আমার সমস্ত দেহ-মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল! সেই সময়েই হতভাগ্য কুমার মনোমোহনের সঙ্গে আমার দেখা। এবং তার পরিণাম তোমরা সকলেই জানো! ......মনোমোহনের অচেতন দেহকে অসহায় ভাবে পথের ধূলায় পড়ে থাকতে দেখেও আমার মনে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হল না—আমি তার উপরে লাঠির পর লাঠির ঘা মারতে লাগলুম এবং যতবারই লাঠি মারি ততবারই আমার বুক তাণ্ডবের আনন্দে যেন নাচতে থাকে! মারতে মারতে আমার অন্ধ আনন্দ হঠাৎ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলে! আচম্বিতে মনে পড়ে গেল, আমি এখন হত্যাকারী, ধরা পড়লে এখন আমার জীবনের কোনওই দাম নেই! বিষম আতঙ্কে আমার উন্মত্ত আনন্দ বিলুপ্ত হয়ে গেল—তিরের মতন সেখান থেকে পলায়ন করলুম।

ব্রজদুলাল স্ট্রিটের বাসায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে তিনকড়ি যখন

নিশ্চিন্ত হয়ে ডাক্তার জয়ন্তের পরীক্ষাগারে ফিরে এল, তখন সে মহা ফূর্তিতে একটা টপ্পা গান শুরু করে দিলে! গুন-গুন করে গান গাইতে গাইতে হাসিমুখে সে ঔষধ পান করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি ধারণ করলেন ডাক্তার জয়ন্ত! কিন্তু তাঁর মুখে তখন আর হাসি ছিল না, তাঁর চোখে ছিল অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস। ......অনুতাপে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল, আবার তিনকড়ি হয়ে আমি কী গুরুতর পাপই আজ করলুম! আর নয়—আজ থেকে তিনকড়ির সমাপ্তি! হে ভগবান, এ বন্যপশুকে আর কখনও পিঞ্জরের বাইরে আনব না,—কখনও নয়, কখনও নয়!

অবিনাশ, তুমি জানো সেই হত্যাকাণ্ডের পরে আমি কীভাবে জীবনযাপন করেছি? তোমাদের সঙ্গে আলাপ, ধর্মালোচনা ও পরোপকার ছাড়া আর কোনওদিকেই আমি মনকে নিযুক্ত রাখিনি। সমস্ত অন্যায় আনন্দকে আমার মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি আমার সাধু-প্রকৃতির ভিতর থেকে শান্তি ও সুখের খোরাক খুঁজে পেলুম এবং ধীরে ধীরে আমার মন থেকে অনুতাপের ভাবটা আবার মিলিয়ে গেল।

কিন্তু তারপর থেকেই বুকের ভিতরে নিত্যই আমার অসাধু প্রকৃতির গর্জন আবার শুনতে পেলুম! কে যেন রুদ্ধস্বরে বলছে—'ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও—তোমার ভালোকে নিয়ে তুমি থাকো, আমাকে নিজের পথে যেতে দাও! এত সাধুতা আমার সইছে না!' যদিও নরকের উৎকট আনন্দ বারে বারে আমাকে ডাকতে লাগল, তবু সে প্রলোভনকে প্রাণপণে আমি দমন করতে লাগলুম। তিনকড়ির জাগরণ আর অসম্ভব! এবার জাগলে তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে!

সেদিন সকালে এক কোম্পানির বাগানে একলাটি বসে ছিলুম। কচি রোদের সোনার জলে গাছের সবুজ পাতাগুলি ঝলমল করছে, চারিদিকে পাখিদের প্রভাতি বীণার গান শোনা যাচ্ছে, আকাশের উদার নীলিমায় মেঘের ছায়া নেই। এই শান্ত প্রভাতে আমার মনের ভিতর থেকে হারানো সুখস্মৃতির কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস জেগে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণের উপরে যেন কীসের একটা ধাক্কা লাগল! মাথাটা যেন ঘুরতে লাগল এবং চোখের সুমুখ দিয়ে একটা অন্ধকারের বন্যা ছুটে গেল! তারপরই দেহের ভিতরে অনুভব করলুম, নবীন যৌবনের উদ্দাম আবেগকে! হেঁট হয়ে তাকিয়ে দেখলুম: আমার জামা-কাপড়গুলো ঢিলে হয়ে দেহের উপর থেকে ঝুলে পড়েছে এবং আমার দুই হাঁটুর উপরে আছে দু-খানা পাকানো লোমশ হাত! আবার আমি তিনকড়ি বটব্যাল! এক মুহূর্ত আগে ছিলুম আমি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য এবং এক মুহূর্ত পরেই হলুম সমাজ থেকে বিতাড়িত ফাঁসির আসামি!

কিন্তু এখন ভাববার বা ভয় পাবারও সময় নেই। আমার ঔষধ আছে পরীক্ষাগারের ভিতরে, কিন্তু সেখানে যাব কেমন করে? তিনকড়ি রূপে বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করলে আমার ভৃত্যরাই এখন পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দেবে! তাহলে কী করি? ......তখন মনে পড়ল করুণাকে।

বাগান থেকে বেরিয়ে আসছি, একটা বুড়ি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সুমুখে এসে দাঁড়াল। তার হাতের ডালায় কতগুলো দেশলাইয়ের বাক্স। বুড়ি ভিখারির মতো স্বরে কাকুতি-মিনতি করে বললে, 'বাবা, একবাক্স দেশলাই কিনবে বাবা?' অকারণে-রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে গেল এবং বুড়ির মুখে আমি সজোরে চপেটাঘাত করলুম! হাঁউমাঁউ করে কেঁদে-ককিয়ে বুড়ি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেল!

তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি ডাকলুম। আমার চেহারা ও কাপড়-চোপড় দেখে গাড়োয়ান তার হাসি চাপতে পারলে না। দুর্জয় ক্রোধে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আমি গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে দেখলুম—এবং তার ঠোঁট থেকে হাসির লীলা তখনই মিলিয়ে গেল! সে শিউরে উঠে ফিরে বসে তাড়াতাড়ি নিজের কাজে মন দিলে। ভালোই করলে, নইলে সে বাঁচত না!

একটা হোটেলে গিয়ে উঠলুম। হোটেলের চাকরগুলোও আমার চেহারা দেখে গেল চমকে ও ভড়কে। আবার আমার সেই খুনে-রাগ হতে লাগল, কিন্তু কোনও-রকমে রাগ সামলে একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। সেইখানে বসে করুণাকে একখানা ও আমার ভৃত্য রামচরণকে একখানা পত্র লিখলুম। তারপরের কথা এতক্ষণে তুমি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে, সুতরাং আমি আর বলবার চেষ্টা করব না।

.........নিরাপদে নিজের বাড়িতে ফিরে এলুম বটে, কিন্তু তারপর থেকে জীবন আমার দুর্বহ ও দুঃসহ হয়ে উঠল। দুপুরবেলায় নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে দিবা-নিদ্রার একটু আয়োজন করছি, এমন সময়ে আমার প্রাণের উপরে আবার সেই-রকম একটা ধাক্কা লাগল। এবারে আগে থাকতেই সাবধান হলুম। বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে দ্রুতপদে পরীক্ষাগারের দিকে ছুটলুম। পরীক্ষাগারের দরজা বন্ধ করে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, আবার আমি তিনকড়ি হয়ে গিয়েছি!

এবারে খুব বেশিমাত্রায় ঔষুধ খেয়ে নিজের আগেকার মূর্তিকে ফের ফিরে পেলুম বটে— কিন্তু বৃথা! খানিক পরে আবার আমার প্রাণকে ধাক্কা মেরে তিনকড়ির পুনরাবির্ভাব হল! তারপর যতই ওষুধ খাই ও জয়ন্তের মূর্তি ধারণ করি, তিনকড়ি আর কিছুতেই আমাকে ছাড়ে না, একটু আনমনা হলেই সে এসে আমার ঘাড়ে চেপে বসে!

তারপর আমার ওষুধ গেল ফুরিয়ে! নিজে নানা কৌশলে আত্মগোপন করে রামচরণকে অনেক ডাক্তারখানায় পাঠালুম, কিন্তু সে সর্বনেশে ওষুধের গুঁড়ো আর কিছুতেই সংগ্রহ করা গেল না! দেখছি, তিনকড়ির ভূতকে ঘাড়ে করেই জীবনের শেষ নিশ্বাস আমাকে ত্যাগ করতে হবে।

ওষুধের সামান্য একটুখানি অবশিষ্ট ছিল, তারই প্রভাবে শেষবারের জন্যে জয়ন্তের মূর্তি ধারণ করে তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি। অবিনাশ, আর আমার কোনও আশাই নেই! তিনকড়ির কী হবে? সে কি ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেবে? ভগবান জানেন! আমার আর কিছুই জানবার আগ্রহ নেই। আমার যথার্থ আমিত্বের মৃত্যু হয়েছে, তিনকড়ির অদৃষ্টের সঙ্গে

তার কোনওই সম্পর্ক নেই। তোমাকে চিঠি লিখে যখন আমি কলম তুলে রাখব, তখন থেকেই এই পৃথিবী হতে অভাগা জয়ন্তের জীবন একেবারেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

পরিশিষ্ট

মামূর্তের দানব-দেবতা

সাহারা মরুভূমির উপর তখন পূর্ণিমার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল।

পৃথিবীর সমস্ত বিশাল সৌন্দর্যই মানুষের মনকে আকর্ষণ করে। পর্বতের মধ্যে যেমন হিমালয়, সমুদ্রের মধ্যে যেমন প্রশান্ত মহাসাগর, মরুভূমির মধ্যেও তেমনি এই সাহারা। ছেলেবেলা থেকেই সাহারাকে দেখবার জন্যে মনের ভিতর থেকে একটা প্রবল ইচ্ছার সাড়া পেতুম। তাই ইউরোপ থেকে ফেরবার সময় সাহারার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আমরা দুই বন্ধুতে।

বালুকার এই মহাসাগরে সারাদিন কাটিয়ে বেশ বুঝতে পেরেছি, গরম কড়ায় ফেলে ভাজবার সময় কইমাছের অবস্থা হয় কী রকম! সারাক্ষণ তাঁবুর ভিতরে আধমরার মতন পড়েছিলুম। এখন সন্ধ্যার পরে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি, পরিপূর্ণ পূর্ণিমার হাসি সমস্ত মরুভূমিকে একটা আনন্দ মায়ারাজ্য করে তুলেছে!

চাঁদের আলো আর মরুভূমি আজ যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে। এখন এই মরুভূমিকে দেখলে কে বলতে পারবে যে খানিক আগে এইখানেই ছিল নরকের এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড!

আমরা আছি একটা ওয়েসিসের ভিতরে। সকলেই জানেন বোধহয়, ওয়েসিস হচ্ছে অসীম, শুষ্ক, ধু ধু বালুকাপ্রান্তরের ভিতরে ছোট্ট একটি তরু-শ্যামল জায়গা। হয়তো পঞ্চাশ, ষাট, একশো কি আরও বেশি মাইল পথ পার হবার পরে মরুভূমির মধ্যে এই রকম এক-একটা ওয়েসিস পাওয়া যায়। এখানে থাকে তালজাতীয় গাছের কুঞ্জছায়া এবং মরুভূমির মধ্যে সবচেয়ে যা দুর্লভ, সেই শীতল জলের মিষ্ট ধারা। তবে সব ওয়েসিসে যে জল পাওয়া যায় তাও নয়। আমাদের এই ওয়েসিসে পাতাল থেকে একটি জলের উৎস উঠে মনোরম এক সরোবরের সৃষ্টি করেছে। কাজেই মরু-পথের সমস্ত যাত্রী এখানে বিশ্রাম না করে বিদায় নেয় না।

সুন্দর মরু-উদ্যানের ধারে আমরা দুজনে চুপ করে বসে আছি এবং সরোবরের জলে জ্যোৎস্নার রুপালি সারি ঝিলমিল করে উঠছে। আর এক দিকে যতদূর চোখ চলে দেখা যায় আকাশের মতন অসীম অবাধ বালুকার রাজ্য।

আচম্বিতে মনে হল, সেই জনহীন মরুভূমির রহস্য ভেদ করে যেন একটা মানুষের চলন্ত ছায়া ফুটে উঠল! ছায়াটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে এবং এগিয়ে আসতে আসতে মাঝে মাঝে যেন মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে!

আমরাও অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলুম। হ্যাঁ, মানুষই বটে! কিন্তু কী তার চেহারা! মানুষের এমন শ্রান্ত, শুষ্ক ও শীর্ণ আকার আমরা কখনও দেখিনি! হয়তো এই ভয়াবহ মরুভূমিতে পথ হারিয়ে পানাহারের অভাবেই এর এমন দশা হয়েছে!

আগন্তুক আমাদের কাছে এসে দাঁড়াতে পারলে না, টলতে টলতে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। তারপর অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বললে, 'জল!'

দুজনে ধরাধরি করে তাকে তুলে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে এলুম এবং তার ঠোঁটের কাছে ধরলুম ঠান্ডা জলের গেলাস। আগন্তুকের জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে এবং তার হাঁটুর উপরে ও করতলে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন—বোধহয় চলতে না পেরে বালির উপরে হামাগুড়ি দিয়ে আসার দরুনই তার হাত ও হাঁটু ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। আগন্তুকের অবস্থা দেখে বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীতে তার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে।

আরও এক গেলাস জলপান করে আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে দুর্বল স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, আমি একলাই এসেছি। আমি? আমি হচ্ছি একজন প্রত্নতাত্ত্বিক—অর্থাৎ মাটি খুঁড়ে অতীত গৌরবের সমাধি আবিষ্কার করাই হচ্ছে আমার ব্যাবসা। ......কিন্তু আজ বেশ বুঝতে পারছি, এ কাজে হাত না দিলেই আমি ভালো করতুম। অতীতের গুপ্তকথা আবিষ্কারের চেষ্টা সব সময়ে নিরাপদ নয়। অতীতকে বর্তমানে টেনে আনতে গিয়েই আজ আমি এই বিপদে পড়েছি।'

আমাদের দুজনের চোখে-মুখে বিস্ময়ের আভাস দেখে আগন্তুক আবার বললে, 'আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। আমি এখনও পাগল হইনি। আচ্ছা, আমার ইতিহাস আপনারা শুনুন, সব কথাই আমি খুলে বলব। কিন্তু তার আগেই আমার আর একটা কথা আপনাদের স্মরণ রাখতে বলছি। ভুলেও কোনও দিন ইগিডি মরুভূমিতে যাবেন না! আমাকেও আগে একজন এমনি সাবধান করে দিয়েছিল, কিন্তু তবু আমি সাবধান হইনি। অবাধ্য হয়ে আমি গিয়েছিলুম নরকে—হ্যাঁ মশাই, নরক! ......এখন গোড়া থেকেই সমস্ত শুনুন

আমার নাম—থাক, আমার নামে কোনও দরকার নেই। এক বছর আগে অ্যাটলাস পাহাড়ের তলা দিয়ে আমি মরুভূমির ভিতরে এসে পড়েছিলুম। আমার ইচ্ছা ছিল, উত্তর-আফ্রিকার মরুভূমির ভিতরে প্রাচীন কার্থেজ শহরের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করব।

সেই চেষ্টায় আমি মাসের পর মাস কাটিয়ে দিয়েছি। কখনও অজানা আরবপল্লিতে, কখনও কোনও ওয়েসিসের ছায়ায় এবং কখনও জনশূন্য, অপরিচিত মরুভূমির ভিতরে আমার দিনের পর দিন কেটে গিয়েছে। এখানে-সেখানে প্রাচীন দুর্গ ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষের ভিতরে প্রাচীন কার্থেজের পূর্ব-গৌরবের অনেক নিদর্শনই আমি খুঁজে পেয়েছি। তারপর একদিন এমন একটি জিনিস আমার চোখে পড়ল যার ফলে আর ইগিডি মরুভূমিতে না গিয়ে থাকতে পারলুম না।

একটি হাজার হাজার বছর আগেকার ভাঙা মন্দিরের গায়ে পাথরের উপরে এই কথাগুলি খোদা ছিল

'বণিকগণ, তোমরা কেউ মামূর্ত শহরে যেয়ো না। পর্বতের গিরিসঙ্কট পার হয়ে ওই শহরে যাওয়া যায়। আমি কার্থেজের এক ব্যবসায়ী, চারজন সঙ্গীর সঙ্গে না জেনে আমিও ওই শহরে গিয়ে পড়েছিলুম। তারপর ওই শহরের দুষ্ট পুরোহিতরা আমাদের বন্দি করে। ওখানে এক রাক্ষস দেবতা বা দানব আছে, পুরোহিতরা তার জন্যে এমন এক বিরাট ও বিস্ময়কর মন্দির তৈরি করে দিয়েছে, যার তুলনা ত্রিভুবনে নেই। মামূর্ত শহরের দানব-দেবতার সামনে নিয়ে গিয়ে পুরোহিতরা আমার সঙ্গীদের বলি দেয় এবং আমি কোনওরকমে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি। পাছে আবার কোনও হতভাগ্য ওই শহরে গিয়ে বিপদে পড়ে, সেইজন্যে সকলকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। মন্দিরের দুষ্ট দেবতা, সৃষ্টি-প্রভাত থেকে যে সেখানে বিরাজ করছে, সাবধান—তাকে সাবধান!'

বুঝতেই পারছেন, হাজার হাজার বছরের পুরানো এই সাবধানবাণী আমার মনের উপরে কী অপূর্ব কাজই করলে! এত বড়ো একটা অতুলনীয় মন্দিরের কথা আমি কোনও কেতাবেই পড়িনি এবং কোনও লোকের মুখেই শুনিনি। ইগিডি মরুভূমির ভিতরে মামূর্ত নামে যে একটি প্রাচীন শহর ছিল বা আছে, এ কথাও আজ কেউ আর জানে না। রোমের দুর্ধর্ষ সৈন্যদের কবলে পড়ে বিপুল সভ্যতার লীলাক্ষেত্র কার্থেজ আজ সমভূমিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার স্মৃতির শেষ ধ্বংসাবশেষে এসে আজ যা আবিষ্কার করলুম, তার সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্যে আমার সারা প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কাছেই একটা ছোটো আরবপল্লি ছিল। সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নিয়েও বিশেষ-কিছু নূতন কথা জানতে পারলুম না। কেবল বুড়ো আরবদের মুখ থেকে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা গেল, কোন পথ দিয়ে ইগিডি মরুভূমিতে যাওয়া যায়।

কিন্তু আরবরা যে এর চেয়েও বেশি কিছু জানে, এ সন্দেহ আমার এখনও যায়নি। কারণ আমার সঙ্গী হবার জন্যে তাদের অনেককেই অনুরোধ করেছিলুম। কিন্তু অনেক টাকার লোভ দেখিয়েও তাদের কারুকে রাজি করাতে পারিনি। প্রথমটা তারা রাজি হয়েছিল। কিন্তু যেই শুনলে গিরিসঙ্কট পার হয়ে আমি ইগিডি মরুভূমিতে যাব, অমনি তারা সবাই একেবারে বেঁকে বসল। বললে, গিরিসঙ্কটের ওপারে তারা কেউ কখনও যায়নি, মরুভূমির পথ-ঘাটের খোঁজ তারা রাখে না, ইত্যাদি। কোনও কোনও বুড়ো আরবের মুখে শুনলুম, ইগিডি মরুভূমিতে নাকি মানুষের যাওয়া উচিত নয়, কারণ সেখানে ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব বাস করে!

তাদের কুসংস্কার টলানো অসম্ভব দেখে আমি একলাই ইগিডি মরুভূমিতে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলুম। তারপর দুটো উটের পিঠে আমার মোটমাট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ে তিন দিন পথ হেঁটে গিরিসঙ্কটের কাছে গিয়ে হাজির হলুম।

গিরিসঙ্কটের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। সেই সরু শুঁড়িপথটা বড়ো বড়ো পাথরে এমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে তার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়া একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার! পথের দু-ধারে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল আকাশের দিকে উঠে গিয়ে আলো আসবার উপায় প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। সেই ছায়াময়, রহস্যময়, নির্জন ও নিস্তব্ধ গিরিসঙ্কট ভেদ করে আমি যখন

ওধারে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন বিপুল বিস্ময়ে আমার মন অভিভূত হয়ে গেল। সীমাহীন এক মরুভূমি চারিধার থেকে বিপুল এক পুকুরের পাড়ের মতন পাতালের দিকে নেমে গিয়েছে। এবং আমার কাছ থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে যেখানে চারিদিকের ঢালু জায়গা এসে মিশেছে, সেইখানে প্রাচীন মামূর্ত শহরের শ্বেতবর্ণ ধ্বংসাবশেষ সূর্যালোকে তুষার-পর্বতের মতো সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!

খানিকক্ষণ পরে আবার অগ্রসর হলুম সেই ধ্বংসাবশেষের দিকে— এ যেন মূর্তিমান বিরাট অতীতের দিকে বর্তমানের ক্ষুদ্র মানবশিশুর অভাবিত তীর্থযাত্রা! যতই এগিয়ে যাচ্ছি ধ্বংসাবশেষ ততই মস্ত হয়ে উঠছে। কোথাও একটা ভাঙা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও কতকগুলো থামের সারি এবং কোথাও-বা ইট-পাথরের প্রকাণ্ড স্তূপ! অনেক জায়গায় বালির রাশির ভিতরে ধ্বংসাবশিষ্ট বাড়িঘর একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছে।

তারপর আমি আর-একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলুম। কোথাও দেওয়ালের পাথরের উপরে, কোথাও থামের উপরে এবং কোথাও-বা সিঁড়ির ধাপের উপরে কিম্ভূতকিমাকার এক জানোয়ার মূর্তি খোদা আছে। জানোয়ারটাকে দেখতে অনেকটা অক্টোপাসের মতন—যদিও তা অক্টোপাসের মূর্তি নয়। তার দেহ গোল ও বেঢপ এবং দেহের তলা দিয়ে মাকড়সার পায়ের মতন কতকগুলো অদ্ভুত পা বা লকলকে শুঁড় বেরিয়ে আছে। চারিদিকেই এই বেয়াড়া মূর্তির ছড়াছড়ি কেন? এ কি কোনও পবিত্র চিহ্ন, না, আর কিছু? কিছুই বুঝতে না পেরে শেষটা বোঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিলুম।

এবং এই শহরের হেঁয়ালিটাই বা বুঝব কেমন করে? আমি একলা। এত বড়ো একটা ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করবার মতন যন্ত্রপাতিও সঙ্গে করে আনিনি এবং বেশিদিন এখানে থাকতেও পারব না—খাবার ও জল ফুরুলেই আমাকে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় আমার উট দুটোকে নিয়ে গিয়ে সেদিনের মতন তাঁবু খাটিয়ে ফেললুম।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসছে। সেই বিজনতার রাজ্যে মানুষের হাসির স্বর বা পাখির ডাক—কিংবা কোনও কীট-পতঙ্গেরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অন্ধকার ও স্তব্ধতা যেন নীরব নির্ঝরের মতো চারিদিক থেকে আমাকে ঘিরে ঝরে পড়তে লাগল! তারই মাঝখানে মিট মিট করে জ্বলছে কেবল আমার লণ্ঠনের আলো—যেন কোনও ভীরু, কম্পমান ও অসহায় জীবের মতো!

কাল সকালে উঠে কী করব তাই ভাবছি, হঠাৎ একটা অস্ফুট অস্পষ্ট শব্দ শুনে চমকে উঠলুম! কারণ জানবার জন্যে ফিরে তাকিয়েই আমি যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। বলেছি, আমি তাঁবু গেড়েছি, একটা খোলা জায়গার মাঝখানে, সমতল বালুকা-প্রান্তরের উপরে। লণ্ঠনের আলোতে স্পষ্ট দেখলুম, বালুকার উপরে হঠাৎ একটা গর্ত জেগে উঠল! যদিও অসম্ভব, তবু আমার মনে হল, শূন্যলোক থেকে যেন একটা আশ্চর্য গর্ত বালির উপরে খসে পড়ল!

এখানে কোনওদিকে কোথাও জীবনের চিহ্নও দেখা যায় না—একটা ছায়া পর্যন্ত নয়! তবু

আমার চোখের সামনে কোন অদৃশ্য হস্ত এই গর্তটা খুঁড়লে? খালি তাই নয়, কেমন একটা খড়-মড় শব্দও আমার কানে এল! তারপরেই আমার আরও-কাছে আবার তেমনি আর-একটা গর্ত জেগে উঠল! বালুকা-সমুদ্র যেন বুদ্বুদ কাটছে! ভয়ে বুকটা ছম ছম করতে লাগল।

আমার উনুনে আগুন জ্বলছিল। তার ভিতর থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে আমি দ্বিতীয় গর্তটার দিকে সজোরে নিক্ষেপ করলুম। আবার কীরকম একটা শব্দ শুনলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝলুম যে শব্দটা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে! শরীরী বা অশরিরী যে-কেউ এই দুটো গর্ত খুঁড়ে থাকুক, এখন আর সে আমার কাছে নেই এই ভেবে একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

কিন্তু এই অদ্ভুত রহস্য আমাকে আর শান্তিতে থকতে দিলে না। ঘুমিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না, চতুর্দিক থেকে এই মৃত শহরের যত প্রাচীন, জীর্ণ দুঃস্বপ্ন এসে আমাকে বারংবার আক্রমণ করতে লাগল,—বহু যুগ আগে এখানে যেসব মহাপাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদেরই আকারহীন আত্মা যেন ভীষণ সব আকারহীন আকার ধারণ করে আমার সুমুখে দেখা দিয়েই আবার হাওয়ার মতো মিলিয়ে যেতে লাগল! দৃষ্টিহীন ক্রুদ্ধ চক্ষু, পদহীন চলন্ত দেহ, মুণ্ডহীন জীবন্তমূর্তি! ......প্রায় সারা রাতটাই অনিদ্রায় কেটে গেল।

পূর্ব আকাশে ঊষার তুলি যখন সিঁদুর-ছবি আঁকতে শুরু করলে, আমার মনের ভয়ের ভাবটা তখন আর রইল না। তারপর সূর্যের জ্বলন্ত মুখ দেখে কালকের সব দুশ্চিন্তাই আমি একেবারে ভুলে গেলুম। আঁধার রাতের শেষে সূর্যের সোনার আলো নিয়ে আসে নতুন আশার ডালা, এইজন্যেই বোধহয় পৃথিবীর সব দেশেরই আদিম অধিবাসীরা সূর্যের উপাসনা করত।

আমার দেহে আবার নতুন সাহস ও শক্তি ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল প্রাচীন কার্থেজের সেই মৃত ব্যবসায়ীর কথা। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিরাট ও বিস্ময়কর মন্দিরের চিহ্ন হয়তো এখনও বিদ্যমান আছে। সে মন্দিরে ছিল কোনও এক বিরাট দানব-দেবতার পূজার বেদি, যার সামনে হত নরবলি। কিন্তু কোথায় সে মন্দির বা তার ধ্বংসাবশেষ?

কাছেই একটা ছোট্ট পাহাড় ছিল। তারই চূড়ায় উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। কার্থেজের ব্যবসায়ী বলেছেন, সে-মন্দির নাকি আকারে বিরাট। এতদিনে অত বড়ো একটা মন্দির যদি ভেঙে পড়েই থাকে, তাহলে তার ধ্বংসস্তূপ তো কম প্রকাণ্ড হবে না! কিন্তু চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তেমন কোনও ধ্বংসস্তূপ আমার নজরে পড়ল না।

তবে আর একটা চিত্তাকর্ষক দৃশ্য আমার চোখে পড়ল বটে। অনেক দূরে পূর্বদিকে প্রদীপ্ত সূর্যের সমুজ্জ্বল আলোকপটের উপরে সুদীর্ঘ ও প্রকাণ্ড দুটি প্রস্তরমূর্তি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এত বড়ো ও উঁচু পাথরের মূর্তি বড়ো-একটা দেখা যায় না। পিছন দিক থেকে প্রভাতের সূর্য তাদের আরও মহিমাময় ও গম্ভীরভাবপূর্ণ করে তুলেছে। এই নূতন আবিষ্কার আমার মনে উত্তেজনার স্রোত বইয়ে দিলে। তখনই তাঁবু তুলে সেই দিকে অগ্রসর হলুম। ধ্বংসাবশেষ পার হয়ে সেই মূর্তি দুটোর কাছে গিয়ে পৌঁছোতে আমার অনেকটা

সময় গেল। ধ্বংসাবশেষের দিকে আড়ষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে মস্ত-বড়ো দুই বেদির উপর এই মূর্তি দুটো বসেছিল। মূর্তি দুটোর গলা থেকে পা পর্যন্ত মানুষের মতন দেখতে এবং তাদের সমস্ত দেহ মাছের আঁশের মতন এক-রকম বর্ম দিয়ে ঢাকা। কিন্তু তাদের মুখ! তাদের মুখ একেবারে অমানুষিক— মানুষের মুখের সঙ্গে একটুও মেলে না! জীবন্ত দেহ দেখেই কি এই মূর্তি দুটো গড়া হয়েছিল? তা যদি হয়ে থাকে, তবে এমন অদ্ভুত জীবন্ত দেহ আধুনিক পৃথিবীর কোনও মানুষই কখনও দেখেনি।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম, মূর্তি দুটোর দু-পাশে সুদীর্ঘ দুই সারি ভগ্নস্তূপ অনেক দূরে চলে গিয়েছে; এই ভগ্নস্তূপ নিশ্চয়ই কোনও উচ্চ প্রাচীরের। কিন্তু মূর্তি দুটোর পরস্পরের মাঝখানে ও-রকম কোনও ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল না। খুব সম্ভব এই মূর্তি দুটোর মাঝখানে এক সময়ে কোনও তোরণ বা দ্বারপথ ছিল। কিন্তু একটা বিষয় ভেবে বিস্মিত হলুম। সারা শহর ভেঙে পড়েছে, এমন কঠিন পাথরের প্রাচীরও ভেঙে পড়েছে, কিন্তু এই ভয়াবহ ও অপার্থিব মূর্তি দুটো আজও সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে বর্তমান আছে কেন? মনে ভিতর থেকে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর পাবার আগেই আর একটা ব্যাপার লক্ষ করলুম। মূর্তি দুটোর পিছন থেকে ছোটো ছোটো পাথরের মূর্তির দুটো সারি প্রায় এক মাইল দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সেই মূর্তি-বীথিকার মধ্যে প্রবেশ করবার সময়ে দেখলুম, বড়ো মূর্তি দুটোর বেদির পাশেও সেই রকম বিরাট অক্টোপাস বা মাকড়সার চেহারা খোদা রয়েছে। পথের দু-পাশে সারি সারি এই যে ছোটো ছোটো মূর্তি রয়েছে, এগুলোও যে কোন জীবজন্তুর মূর্তি তা বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। এমন সব জন্তু পৃথিবীতে কোনও দিন ছিল বা আছে বলে আমি জানি না। ভয়াল তাদের চেহারা এবং প্রত্যেকেরই মুখে হিংসা ও অমঙ্গলের ভাব ফুটে উঠেছে। তাদের দেখলেই বুক টিপ টিপ করতে থাকে।

দুই সারির সর্বশেষ মূর্তি দুটোর কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম, তখন সামনের দিকে তাকিয়ে মরুভূমির ধু ধু বালুকারাশির পাণ্ডুর প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। মনে কেমন ধাঁধা লাগল। এই সুদীর্ঘ মূর্তি-বীথির সার্থকতা কী? মরুভূমির শূন্যতার ভিতরে এসে অকারণেই এই মূর্তির সারি শেষ হয়েছে কেন?

কিন্তু ঠিক আমার সুমুখেই মরুভূমির যে-অংশটুকু রয়েছে, তার মধ্যে একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব লক্ষ করলুম। প্রায় বিঘাকয়েক জমি বিলাতি মাটিতে বাঁধানো উঠানের মতন একেবারে মসৃণ ও সমতল। অথচ এই অংশটুকুর বাইরে মরুভূমির সমস্তটাই এবড়োখেবড়ো বালির রাশিতে ভরা এবং সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে উঁচু-নিচু বালিয়াড়ির স্তূপ। সেখানে সর্বদাই প্রবল বাতাসে হু হু করে বালি উড়ছে, অথচ এই সমতল অংশটার মধ্যে বাতাসের কোনও প্রভাবই নেই!

বিস্মিত ভাবে সেই সমতল অংশটার দিকে অগ্রসর হলুম। কিন্তু কয়েক পা এগুতে না এগুতেই কোনও অদৃশ্য হস্ত আমার মুখে ও বুকে আচমকা এত জোরে আঘাত করলে যে, যাতনায় ককিয়ে উঠে তখনই আমি ভূমিতলে ছিটকে পড়ে গেলুম! খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের

মতন বালির উপরে শুয়ে রইলুম। তারপর আমার সমস্ত কৌতূহল পরিপূর্ণ মাত্রায় জেগে উঠল। এ কী ব্যাপার? কেউ কোথাও নেই, তবু কে আমাকে এমন ভাবে ধাক্কা মারলে? উঠে বসে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে, ডান হাতে রিভলভার তুলে অতি সাবধানে আবার আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলুম।

যখন সেই সমতল অংশের ধারে গিয়ে উপস্থিত হলুম, তখন আমার হাতের রিভলভারটা হঠাৎ কীসের উপরে পড়ে ঠক করে বেজে উঠল! রিভলভারটা ঠিক যেন কোনও পাঁচিলের উপরে গিয়ে পড়েছে, অথচ সেখানে পাঁচিল-টাচিল কিছুই নেই! বাঁ-হাত বাড়িয়েও আবার সেই নিরেট ও অদৃশ্য বাধাটাকে অনুভব করলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে সচমকে তিরের মতো দাঁড়িয়ে উঠলুম!

দুই হাত দুই দিকে বিস্তৃত ও সমস্ত দেহ দিয়ে অনুভব করে বেশ বুঝলুম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য অদৃশ্য দেওয়াল! ......খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। অতীতে এই মৃত শহরে হয়তো এমন কোনও বৈজ্ঞানিক জন্মেছিলেন, যিনি নিরেট পদার্থকে অদৃশ্য করে তোলবার কোনও অজানা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন! অবশ্য, এটা একেবারে অসম্ভবও বলা যায় না। কারণ আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিকরাও এক্স-রে-র সাহায্যে দৃশ্যমান পদার্থকে অনেকটা অদৃশ্য করতে পারেন। অতীতের বৈজ্ঞানিকরা এই পদ্ধতিতে হয়তো আরও বেশি দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলুম, কিন্তু কেমন করে তারা এটা করলে? শহরের বড়ো বড়ো পাথরের বাড়িগুলো কাল-প্রভাবে ধুলোর সঙ্গে ধুলো হয়ে মিশিয়ে গেছে, অথচ এই অদৃশ্য দেওয়াল এখনও ঠিক আগেকার মতোই অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ঢিলের পর ঢিল ছুড়তে লাগলুম। কিন্তু যত জোরে যত উঁচুতেই ছুড়ি সব ঢিলই কীসে ঠেকে আবার ঠিকরে ফিরে আসে! বোঝা গেল পাঁচিলটা অনেক উপরে—আমার ঢিলের সীমানার বাইরে উঠে গিয়েছে। পাঁচিলের ওপাশে যাবার জন্যে প্রাণটা আনচান করতে লাগল। কিন্তু কেমন করে যাব? ওধারে যাবার নিশ্চয়ই কোনও পথ আছে, কিন্তু সে কোথায়? তখন মনে পড়ল, সেই দুই প্রকাণ্ড ও বীভৎস প্রস্তর-মূর্তি এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত দীর্ঘ মূর্তি-বীথির কথা। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি মূর্তি-বীথির পাশের দিকে, কিন্তু যেখানে সেই মূর্তি-বীথি শেষ হয়েছে ঠিক সেইখান দিয়ে এগুবার চেষ্টা করলে হয়তো আমার চেষ্টা বিফল হবে না।

সমস্ত ব্যাপারটা একবার তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলুম। মরুভূমির সেই মণ্ডলাকার সমতল অংশ ও সেই বিপুল ও অদৃশ্য প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়ল, বিলুপ্ত কার্থেজের অজ্ঞাত ব্যবসায়ীর সাবধান-বাণী—'বণিকগণ, তোমরা কেউ মূর্ত শহরে যেয়ো না!' হয়তো এইটেই হচ্ছে ব্যবসায়ীর কথিত সেই বিরাট বিস্ময়কর মন্দির! হয়তো এই মন্দিরের ভিতরেই কোনও দানব-দেবতার সামনে অতীতের কোনও এক ভুলে যাওয়া দিনে ব্যবসায়ীর চারজন অভাগা সঙ্গীকে বলি দেওয়া হয়েছিল! মৃত শহরের ওপার থেকে

কোনও এক দৈববাণী যেন মৌন ভাষায় আমাকে ডাকতে লাগল—'ফিরে এসো, ফিরে এসো, ওই ভীষণ নরক থেকে এখুনি পালিয়ে এসো!'

কিন্তু আমি ফিরে এলুম না, ফিরে আসতে পারলুম না! কোনও কঠিন নিয়তি যেন আমাকে টেনে সেই মূর্তি-বীথির শেষ-প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ফেললে। এবং সেইখানেই আমি সেই অদৃশ্য প্রাচীরের অদৃশ্য দ্বারপথের সন্ধান পেলুম।

সেই দ্বারপথ কতটা উঁচু বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু চওড়ায় সেটা প্রায় বিশ ফুটের কম হবে না। এক দিকের অদৃশ্য দেওয়ালের গায়ে হাত দিয়ে আমি অগ্রসর হতে লাগলুম।

খানিক পরেই গিয়ে পৌঁছোলুম একটা মস্তবড়ো অদৃশ্য উঠানের উপরে। সে এক পরম বিস্ময়! আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেওয়াল, স্তম্ভের শ্রেণি ও ঘর-দ্বার রয়েছে—কিন্তু সমস্তই অদৃশ্য! সেই কাচের চেয়ে স্বচ্ছ, অদৃশ্য বাড়ির দেওয়ালের পর দেওয়াল ভেদ করে আমার দৃষ্টি বাইরের অপার মরুভূমির ভিতরে গিয়ে পড়েছে এবং বাহির থেকে সূর্যের সুবর্ণ-কিরণ এই বিপুল প্রাসাদের ভিতরে এসে সর্বত্র বিচরণ করছে। খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে আরও খানিকটা এগিয়েই বুঝতে পারলুম, আমি এক বিস্তৃত সোপান-শ্রেণির সামনে এসে পড়েছি! আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে উপরে উঠতে লাগলুম। যতই উপরে উঠি মনটা ততই অদ্ভুত ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যায়—কারণ আমি যেন শূন্যে পদক্ষেপ করে বাতাসের ভিতরে দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছি! ধাপের পর ধাপ যেন আর শেষ হতে চায় না, কেবলই মনে হয় উপর থেকে কখন হঠাৎ আমি হুড়মুড় করে পৃথিবীর উপরে গিয়ে পড়ব! শেষটা সিঁড়ি যখন শেষ হল, আমি তখন মাটি থেকে প্রায় একশো ফুট উপরে একটা বারান্দার মতন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

সেখানে গিয়ে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলতে ভরসা হল না, হামাগুড়ি দিয়ে প্রত্যেক ইঞ্চি পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে চললুম এবং একটু পরেই আবার একটা পাঁচিল ও তার গায়ে একটা দরজা আবিষ্কার করলুম। দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। কিন্তু তার ভিতরে ঢুকতে গিয়েই কেমন একটা অজানা আতঙ্ক এসে আমার মনের উপরে ধাক্কা মারলে। যেন এখানে দুষ্ট ও হিংস্র আত্মা বাস করে অনন্ত কাল ধরে! আমি কিছুই দেখলুম না, কিছুই শুনলুম না, তবু মনে হল যেন কোনও প্রাচীন অভিশাপ যুগ-যুগান্তর ধরে এখানে বাস করে আসছে! যেন কত নির্যাতিত দেহের যন্ত্রণা এখানে ক্রন্দন করছে নিশিদিন, নীরবে! ঘরের ভিতরে সাহস করে ঢুকতে পারলুম না, মনটাকে হাল্কা করবার জন্যে আবার সেই অদৃশ্য বারান্দার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে গিয়ে পড়েছে, তাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন একটা অগ্নিতপ্ত লোহার রক্ত গোলকের মতো। সেই সুবৃহৎ ও সুদীর্ঘ প্রস্তর মূর্তি দুটো মরু-বালুর উপরে লম্বা দুটো ছায়া ফেলে স্থির ভাবে বসে বসে যেন মহাকালকে ব্যঙ্গ করছে! সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনের পটে অতীতের এক স্মৃতির ছবি আঁকতে লাগলুম।

এই মেঘচুম্বী, অদৃশ্য ও বিরাট দেবালয়ের সামনে ওই বিপুল ধ্বংসাবশেষ যেন আবার তাদের গত জীবনকে ফিরিয়ে পেলে! চারিদিকে প্রাসাদের পর প্রাসাদের ভিড়, প্রশস্ত রাজপথের পর রাজপথ জনাকীর্ণ হয়ে কত দূরে চলে গিয়েছে,—তুরী, ভেরী ও দামামার তালে তালে পূজারির দল দুই প্রস্তর-মূর্তির তোরণের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে কয়েকজন হতভাগ্য বন্দিকে সঙ্গে করে,—তাদের দানব-দেবতার অতৃপ্ত উদর পূরণের জন্যে!

আচম্বিতে অনেক নীচে বালুকারাশির দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বালির ভিতরে ঠিক তেমনি—যেন শূন্য থেকে খসে পড়া একটা গর্ত! তারপরে আমার সচকিত দৃষ্টির সামনে বালির উপরে ক্রমাগত গর্তের পর গর্ত জেগে উঠতে লাগল! গর্তের রেখা মন্দির পর্যন্ত এসে পড়ল, তারপর আর কিছু দেখা গেল না।

ধাঁ করে আমার মনে পড়ে গেল, ধ্বংসাবশেষের পাথরে পাথরে খোদা সেই খানিক-অক্টোপাস ও খানিক মাকড়সার মতন জীবের মূর্তির কথা! সেই মূর্তির সঙ্গে এই অদৃশ্য বিপদের কোনও সম্পর্ক আছে কি? এই অদৃশ্য বিপদের আকারও কি তেমনি বীভৎস? কার্থেজের ব্যবসায়ী বলেছে—'মন্দিরের দুষ্ট দেবতা, সৃষ্টি-প্রভাত থেকে যে সেখানে বিরাজ করছে, সাবধান—তাকে সাবধান!' সৃষ্টির আদিম প্রভাতে পৃথিবীতে অনেক অতিকায় দানব বাস করত, পণ্ডিতেরা মাটির ভিতর থেকে আজও যাদের কঙ্কাল আবিষ্কার করছেন। ওই মৃত শহরের বিলুপ্ত বাসিন্দারা কি সেই রকম কোনও দানবকেই তাদের দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল? এবং বিজ্ঞানের কৌশলে এই মন্দিরের মতন তাদের দানব-দেবতাকেও কি অদৃশ্য, অমর ও অজর করে রেখেছে? বালির উপরে ওই গর্তগুলো কি সেই অদৃশ্য দানবেরই বিপুল পদচিহ্ন? আর এরই ভয়ে কি আরবরা আমার সঙ্গী হতে রাজি হয়নি?

মনের ভিতরে যখন ঝড়ের মতো এমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে লাগল, তখন হঠাৎ আমার স্মরণ হল, সেই অদৃশ্য দানব মন্দিরের দিকে এসেছে এবং এতক্ষণে হয়তো এই অদৃশ্য মন্দিরেই প্রবেশ করেছে! এই সন্দেহ মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহের সমস্ত আড়ষ্টতা ঘুচে গেল, আমি যথাসম্ভব দ্রুতপদে সিঁড়ির উপর দিয়ে নীচে নেমে গেলুম। আমি জানি, যে-পথ দিয়ে আমি এখানে ঢুকেছি সেই পথ দিয়েই সে আমাকে ধরতে আসছে! কিন্তু কোথায় আমি লুকাব? কাচের চেয়েও স্বচ্ছ, অদৃশ্য এই মন্দির, এর মধ্যে লুকোবার ঠাঁই খুঁজে পাব কেমন করে?'

এমন সময়ে একটা শব্দ কানে এল—থপ, থপ, থপ, থপ! মৃত্যুর অদৃশ্য দূত যে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেছে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই! জানি না এ কোন জাতীয় দানবজীব এবং এর মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে কত কম বা কত বেশি! জানি না সে আমাকে দেখতে পেয়েছে কি না! সিঁড়ির পাশে এক কোণে হুমড়ি খেয়ে জড়সড় হয়ে চুপ করে আমি বসে রইলুম এবং সেই অবস্থায় থেকে শুনতে পেলুম থপ থপ থপ থপ করে সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে কে উপরে উঠে যাচ্ছে!

সেই ভয়ংকর পায়ের শব্দ যখন থেমে গেল, তখন আন্দাজ করে নিলুম, যে-ঘরে ঢুকতে আমি ভয় পেয়েছিলুম জীবটা সেই ঘরের ভিতরেই গিয়ে ঢুকেছে! আমিও আর দেরি করলুম না, উঠানের উপর দিয়ে দ্রুতপদে ছুটতে লাগলুম। কিন্তু হঠাৎ ভুল দিকে গিয়ে একটা অদৃশ্য দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আবার আগেকার মতোই ছিটকে মাটির উপরে পড়ে গেলুম। এবারে গুরুতর আঘাত লেগেছিল, কিন্তু তবু প্রাণপণে আমার যন্ত্রণার চিৎকারকে দমন করলুম!

উপর থেকে আবার শব্দ এল—থপ, থপ, থপ, থপ! বিভীষণ দানব-দেবতা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে!

পাগলের মতন উঠে আবার এক দিকে ছুটে গেলুম অন্ধের মতো এবং আবার এক দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লুম!

আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলুম। পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। আরও খানিকক্ষণ সেই অবস্থায় অপেক্ষা করলুম এবং তখনও কোনওরকম শব্দ না পেয়ে আশান্বিত হয়ে আমি উঠে দাঁড়ালুম ও দুই পা অগ্রসর হতেই একেবারে সেই দানবের কবলে গিয়ে পড়লুম আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই! সেই অদৃশ্য দানবটা কখন নিঃশব্দপদসঞ্চারে একেবারে আমার কাছে এসেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল,—রোমশ, ঠান্ডা ও পিচ্ছল শুঁড়ের মতন কী একটা জিনিসের উপরে আমার হাত গিয়ে পড়ল—তারপরেই সেটা আমার হাতের কাছ থেকে সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই রকম আরও তিন-চারটে শুঁড়ের মতন জিনিস আমাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলে! কিন্তু ঘৃণায় ও আতঙ্কে শিউরে উঠে তাদের কবল থেকে সজোরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আমি আবার ছুটতে ছুটতে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলুম। উপরে উঠে আমি স্থির করলুম, বারান্দা থেকে একশো ফুট নীচে যদি লাফিয়ে পড়ি, তাহলেও এই ঘৃণ্য দানবের কবলে পড়ে মরার চেয়ে সে-মৃত্যু হবে ঢের বেশি সুখের মরণ!

সিঁড়ির উপরে আবার পায়ের শব্দ হতে লাগল—থপ, থপ, থপ, থপ! দানব উপরে আসছে!

সিঁড়ির ঠিক মুখেই দু-হাতে বারান্দার প্রাচীর চেপে ধরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম—আচম্বিতে সেই প্রাচীরটা দুলে আমার দিকে হেলে পড়ল! নিশ্চয় এর ভিত আলগা হয়ে গিয়েছে—আমি তাড়াতাড়ি প্রবল একটা ধাক্কা মেরে সেটাকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিলুম। প্রাচীরটা হুড়মুড় করে সিঁড়ির উপর ভেঙে পড়ল! এক মুহূর্ত সমস্ত স্তব্ধ। তারপরেই শুনলুম, যেন লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝি পোকা, কোলা ব্যাং ও গোখরো সাপ এক সঙ্গে গর্জন শুরু করে দিলে! সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম একটা হলদে রঙের তরল পদার্থ সিঁড়ির উপর দিয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে! প্রাচীরের ভাঙা অংশটা তাহলে ওই দানবেরই ঘাড়ের উপরে গিয়ে পড়েছে এবং ওই হলদে তরল পদার্থটা খুব-সম্ভব তারই দেহের রক্ত! তার দেহ অদৃশ্য, কিন্তু রক্ত দৃশ্যমান!

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে সেই রক্ত দেখে আন্দাজে লক্ষ্য স্থির করে আমি উপর-উপরি কয়েকবার গুলি-বৃষ্টি করলুম। দানবটার চিৎকারে কান যেন ফেটে যাবার মতো হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ দেখতে পেলুম রক্তের ধারার উপরে তার অদৃশ্য দেহের ছটফটানি!

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলুম, কিন্তু সেই অদৃশ্য জীবটার চিৎকার ও ছটফটানি তখনও একটুও কমল না—পাথরের স্তূপের তলায় সে বন্দি হয়েছে ও রিভলভারের গুলিতে আহত হয়েছে বটে, তবু তার মৃত্যু হল না!

এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার এমন ঘনিয়ে উঠল যে আর এখানে অপেক্ষা করাও চলে না। এই সৃষ্টিছাড়া, অভিশপ্ত অদৃশ্য মন্দিরের ভিতরে অন্ধকারে রাত্রিবাসের কথা মনে করতেই আমার বুক কেঁপে উঠল। কে জানে এখানে এ-রকম আরও কত বিভীষিকাই হয়তো আছে! কে বলতে পারে ওই-রকম দানব-দেবতাও এখানে আরও অনেক নেই?

রাত্রের অন্ধকারের কথা ভেবে মন আমার মরিয়া হয়ে উঠল। যেমন করেই হোক ওই সিঁড়ি দিয়েই এখনই আমাকে নেমে যেতে হবে!

আগেই বলেছি, এই অদৃশ্য সোপান-শ্রেণি খুব বিস্তৃত— এক সঙ্গে অনেক লোক এর উপর দিয়ে পাশাপাশি ওঠা-নামা করতে পারে। সিঁড়ির যেখান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল আমি তার বিপরীত দিকে গিয়ে দ্রুতপদে নীচের দিকে নামতে লাগলুম। সেই বন্দি ও আহত দানব মহা আক্রোশে আরও-জোরে গর্জন করে উঠল, কিন্তু আমাকে সে ধরতে পারলে না!

প্রায় অন্ধকারে পথ খুঁজে বার করে কোনওরকমে তাঁবুর কাছে এসে হাজির হলুম। তারপর আলো জ্বেলে যে-দৃশ্য দেখলুম তাতে আমার প্রাণটা স্তম্ভিত হয়ে গেল!

তাঁবুর ঠিক পাশেই বালুর উপরে আমার উট-দুটোর মৃত দেহ চর্মমাত্রসার হয়ে পড়ে রয়েছে। তাদের দেহে হাড় ও চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। চামড়ার উপরে কতকগুলো ক্ষতচিহ্ন দেখে বুঝলুম, অনেকগুলো শুঁড় দিয়ে কোনও ভয়ানক জীব যেন চামড়ার তলা থেকে তাদের সমস্ত রক্ত-মাংস শুষে খেয়ে ফেলেছে! কী নিষ্ঠুর মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছি, সেকথা মনে করে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তারপর কী অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে যে এই সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে এসেছি, তা কেবল আমিই জানি আর জানেন আমার ভগবান! আমার খাবার ফুরিয়ে গেল, জল ফুরিয়ে গেল, দেহের শক্তিও ফুরিয়ে গেল—তবু আমি সেই মৃত্যুপুরী থেকে দূরে—আরও দূরে পালিয়ে এসেছি, কখনও মাতালের মতন টলতে টলতে, কখনও অসহায় শিশুর মতন হামাগুড়ি দিতে দিতে!

আমি যা স্বচক্ষে দেখেছি, পৃথিবীর আর কোনও মানুষ কোনও দিন যেন তা দেখতে না চায়!

ইন্দ্রজালের মায়া

॥ এক ॥

রাত্রির অভিজ্ঞতা

হঠাৎ মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুমটা কেন ভাঙল জানি না।

খোলা জানলা দিয়ে বাইরের আবছা আলো ঘরটাতে সামান্য একটু আলো-আঁধারির মায়া ছড়িয়েছিল। কিন্তু তাতে স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

দেখলাম একটা অশরীরী ছায়া আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি চমকে উঠে বললাম—কে?

কোনও শব্দ নেই।

টর্চটা জ্বালতে গেলাম। কিন্তু সেটা খুঁজে পেলাম না।

কোথায় গেল টর্চ?

আমি তো আমার বালিশের পাশেই ওটা রেখেছিলাম।

আমার পাশেই শুয়েছিল আমার ছোটোভাই ভাস্কর। তাকে ডাকতে চাইলাম। হাত বাড়ালাম সে আমার পাশে আছে কি না তা দেখার জন্য।

কিন্তু আমার হাত যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। গলার স্বরও গেল বন্ধ হয়ে।

কাউকে ডাকবার শক্তি আমার নেই। আমি অসহায়।

এমন সময় ঘটল ভয়ংকর ব্যাপার।

অশরীরী ছায়াটা যেন তার আঁধার-মোড়া হাতটা দিয়ে আমার গলাটা চেপে ধরল। আমি চিৎকার করে উঠতে চেষ্টা করলাম। গলা দিয়ে স্বর বের হয় না।

কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

তবে বুঝতে পারছিলাম আমার মরণ নিশ্চিত।

কিছুক্ষণ আত্মবিহ্বলের মতো ছিলাম। হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে এল। কোথা থেকে আমার গায়ে শক্তি এল জানি না। সেই আসুরিক শক্তির বলেই যেন আমি বিছানার উপর উঠে বসলাম। তখনও অশরীরী ছায়ার হাত দুটো আমার গলা চেপে ধরে আছে।

আমি সেই হাত ছাড়াবার জন্য আমার গলায় হাত দিলাম। আমার হাতে কারুর হাত লাগল না। কিন্তু বুঝতে পারলাম সেই অশরীরী হাত আমার গলা ছেড়ে দিয়ে আমার কাঁধে ভর করেছে। আমাকে যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চাইছে বিছানার উপর।

আমি প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে উঠে দাঁড়ালাম। এবার আমরা দুজনে মুখোমুখি। আমি ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চেষ্টা করলাম সেই অশরীরী শয়তানকে। কিন্তু তার আগেই সে আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

তারপর কী হল আমি জানি না।

পরদিন ভোরবেলা জ্ঞান ফিরতেই দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি আমাকে ঘিরে আছে আমার মেসের বন্ধুরা।

ভাস্করই মেসের বন্ধুদের ডেকে এনেছে। সে-ও রাত্রিবেলায় সেই অশরীরীকে দেখেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তার জ্ঞান ফিরেছিল শেষ রাত্রে। আমাকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে ছুটে গিয়েছিল আমার মেসে, আমার বন্ধুদের ডেকে এনেছিল।

পরিমল এই গল্প বলেছিল বৈজ্ঞানিক এবং ডিটেকটিভ সুমন্ত তরফদারের কাছে। খুব কৌতূহল নিয়েই তরফদার সেই গল্প শুনছিলেন।

পরিমল বলল, 'ভেবেছিলাম দেশ থেকে মা বোনকে এনে কলকাতায় রাখব। তাই ওই বাড়িটার খোঁজে গিয়েছিলাম।'

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'তাই বলে ওই বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়েছিলেন কেন? বাড়িটা কি ভাড়া নিয়েছিলেন?'

পরিমল বলল, 'হ্যাঁ, ভাড়া নিয়েছিলাম বই কি। আমি মেসেই বহুদিন ধরে আছি। একটা ছোটোখাটো চাকরিও করছি। হঠাৎ ছোটোভাই ভাস্কর দেশ থেকে এসে হাজির। বলল, দেশে মা আর আমার বোন থাকতে চাইছে না, তাদের অবিলম্বে কলকাতা নিয়ে আসা প্রয়োজন।'

—'কেন?'

—'দেশে নাকি জমিদারের নায়েব খুব জোরজুলুম করছে। বাবা থাকতেই বাড়ির জমির সীমানা নিয়ে জমিদারের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা ও ঝগড়া-বিবাদ চলছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর তাই আমার বিধবা মায়ের উপর চলছে জোর-জুলুম। ছোটোভাই ওখানেই থেকে দূরের গাঁয়ের স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করে। তারও নানারকম অসুবিধা হচ্ছিল। তাই এসেছিল আমাকে খবরটা জানাতে। আমি ভেবেছিলাম, গাঁয়ের বাড়িটা বিক্রি করে দেব। তাই খুঁজে খুঁজে এই বাড়িটা ঠিক করেছিলাম। কিন্তু—'

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন—'ওটা কি ভূত না কোন ছদ্মবেশী মানুষ?'

পরিমল অবাক হয়ে বলল—'ছদ্মবেশী মানুষ? তা হবে কেন? ছদ্মবেশী মানুষ কেন আসবে আমাকে ভয় দেখাতে?'

তরফদার বললেন—'কলকাতার বাড়ির অনেকরকম রহস্য আছে। কেউ হয়তো ওই বাড়িটা ভাড়া নেবে ঠিক করেছিল, বাড়িওয়ালা তাকে না দিয়ে আপনাকে দিয়েছেন, তাই আক্রোশে ভয় দেখিয়ে আপনাকে হটাতে চাইছে। অথবা এমনও হয়তো হতে পারে, কেউ মওকায় ওই বাড়িটি নেবার চেষ্টায় আছে।'

পরিমল বলল—'না, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ওটা অভিশপ্ত বাড়ি, ভূতুড়ে বাড়ি, বিনে পয়সাও দিলে আমি নেব না।'

তরফদার বললেন—'আপনি কি সে-বিষয়ে স্যাংগুইন? ভূত এর আগে কখনও দেখেছেন আপনি?'

—'না।'

—'তা হলে?'

—'এরকম ভূতুড়ে কাণ্ডের কথা আমি অনেক শুনেছি। এবার যে নিজের জীবনেই এরকম ঘটনা ঘটল।'

তরফদার বললেন—'আমি কিছুদিন ধরে ভাবছি, ভূত নিয়ে গবেষণা করব। এবার সত্যি সেই কাজে নেমে পড়ব ভাবছি।'

ঘটনাটা অনেকদিন আগের।

কিন্তু সেই ঘটনাচক্রের সঙ্গে যে নিজেকেই একদিন জড়িয়ে পড়তে হবে তা সুমন্ত তরফদার কখনও ভাবেননি।

ভূত-সংক্রান্ত কোনও ঘটনার কথা কানে এলেই তিনি তা শুনতে আগ্রহী হতেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবরাও ঠিক জুটিয়ে নিয়ে আসতে এমন সব লোকদের যাদের কাছ থেকে অনেক চমকপ্রদ কাহিনি তিনি শুনতে পেতেন। কোনওটি বিশ্বাস্য, কোনওটি বা অবিশ্বাস্য।

সুমন্ত তরফদারের নাম ধীরে ধীরে কলকাতায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কত ঘটনা ঘটতে লাগল তাঁর জীবনে, সব ঘটনার রেকর্ড হয়তো তাঁর পক্ষে রাখা সম্ভব হত না।

এরপর যে ঘটনার কথা বলছি তার সঙ্গে আপাতত তরফদারের কোনও যোগাযোগ না থাকলেও পরবর্তীকালে সেই ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। এবার শুরু করছি পরবর্তী অধ্যায়।

॥ দুই ॥

বটব্যালের কাহিনি

'কী হে বটব্যাল, কী খবর?'

কোনও সাড়া নেই।

যে-লোকটি সুইংডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল, সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গায়ে বুশ সার্ট, চোখে চশমা। হাতে ফলিও ব্যাগ।

সুনীল বটব্যাল তার টেবিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে। সেই দৃষ্টি অফিসের

কোনও কাগজপত্রের উপরও নয় বা কোনও ডিটেকটিভ বইয়ের উপরও নয়। দৃষ্টি নিবদ্ধ স্রেফ টেবিলের উপর। এবং যে স্থানটি নিতান্তই ফাঁকা।

'কী হে বটব্যাল, তুমি দেখছি খুবই চিন্তিত।'

তবু প্রতিপক্ষ থেকে কোনও প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না।

আগন্তুক মিহির মিত্র খুবই বিস্মিত হল। বটব্যালের এমনভাবে চিন্তায় নিমগ্ন থাকার কী কারণ থাকতে পারে? তবু তার চিন্তাসূত্রে বাধা না দিয়ে বটব্যালের মুখোমুখি একটি চেয়ারে মিহির চুপচাপ বসে পড়ল।

এবার হুঁশ হল বটব্যালের। মুখ তুলে বলল, 'ওঃ মিহির, তুমি? হঠাৎ কী মনে করে?'

'হঠাৎ নয় হে, হঠাৎ নয়।'—মিহির জবাব দিল। তারপর নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসেছি প্রায় দু-মিনিট ঊনত্রিশ সেকেন্ড। এক ঘণ্টা আগে একবার ফোন করেছি—কালও দুপুরে ফোন করেছি একবার। বাট নো রেসপন্স কী ব্যাপার বলো তো?'

বটব্যাল বলল, এক ঘণ্টা আগে ফোন করেছিলে? কাল দুপুরেও ফোন করেছিলে? কই, আমি তো কিছু জানি না। কেউ তো আমাকে ডেকে দেয়নি। কয়েকদিন হল আমার টেবিলের ফোনটা খারাপ হয়ে আছে। আচ্ছা তারপর খবর কী? এত হন্যে হয়ে আমাকে খোঁজবার অর্থ তো কিছু বুঝতে পারছি না।

'ধীরে বন্ধু, ধীরে। আগে এক কাপ চায়ের অর্ডার দাও তো। সঙ্গে একটা টোস্ট বা মামলেট। এতক্ষণ আমাকে ডিটেন করার কমপেনসেশন।'

বটব্যাল কলিংবেল টিপল। কেউ এল না।

কিছুক্ষণ পর আবার টিপল। এবারও কেউ এল না। বিরক্ত হয়ে বটব্যাল বলল, 'আজকাল বেয়ারাগুলো হয়েছে সত্যি বেয়াড়া। কোনও কাজ ওদের দিয়ে করানো যায় না।'

মিহির বলল, 'হুকুম দিয়ে কাজ করাবার দিন চলে গেছে বন্ধু। এখন অনুরোধ করে কাজ করাতে হবে।'

বটব্যাল বলল, 'শুধু কি অনুরোধ? রীতিমতো তোষামোদ।'

এমন সময় বেয়ারা এসে হাজির হল। বটব্যাল জিজ্ঞেস করল 'কী হে অনন্ত, ঘুমোচ্ছিলে নাকি?' বেয়ারা কোনও জবাব দিল না।

বটব্যাল বলল, 'দু-কাপ চা আর দুটো মামলেট-এর ব্যবস্থা করে দাও তো অনন্ত।'

'আচ্ছা বাবু।'—বলে অনন্ত চলে গেল।

'কী ব্যাপার এবার বলো তো মিহির?' বটব্যাল উদগ্রীব হয়ে মিহিরের দিকে তাকাল।

মিহির বলল, 'আমাদের এক আত্মীয় সপরিবারে এসে গেছেন কলকাতায়। তাদের জন্যে একটা বাড়ি খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে পড়েছি। সব বন্ধুদের কাছেই ধরনা দিয়েছি এজন্য। তোমার কাছে শুধু বাকি। তাই এলাম। বাড়ির কোনও হদিস তুমি দিতে পারো?'

বটব্যাল হঠাৎ যেন চমকে উঠল।

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'চমকে উঠলে যে!'

বটব্যাল বলল, 'বাড়ির কথা শুনে।'

মিহির বলল, 'বাড়ির কথা শুনে চমকাবার কী হল?'

বটব্যাল বিষাদের হাসি হেসে বলল, 'আমি নিজেই বাড়ির বিভীষিকায় পড়েছি।'

'মানে তোমাদের তো নিজেদের বাড়ি রয়েছে।'

'বাড়িটা খুব পুরোনো, তা তো জানো। সেই বাড়ি রিপেয়ার হচ্ছে, কিছু কিছু অংশ ভাঙাও হচ্ছে। তাই একটা বাড়ি পেয়ে পরশুদিন চলে গেছি।'

'তাহলে তো বাড়ির সমস্যা মিটে গিয়েছে তোমার।'

'মিটে গেলে তো বাঁচতাম। কিন্তু সমস্যা আরো ঘোরালো হয়েছে।'

'মানে?'

'মানে আজকের মধ্যেই হয়তো বাড়িটা ছাড়তে হবে।'

'ছাড়তে হবে কেন? তা আবার আজকের মধ্যেই?'

এমন সময় অনন্ত দু-কাপ চা আর দুটো মামলেট নিয়ে এল। দুজনের সামনে চা আর মামলেটের প্লেট রেখে বটব্যালকে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটা লোক দেখা করতে চায় বাবু।'

বটব্যাল জিজ্ঞেস করল, 'দেখা করতে চায়? কে লোকটা?'

অনন্ত বলল, 'নাম বলছে ভজহরি। সাধারণ লোক। আধ ময়লা কাপড়-জামা পরনে।'

'রোগা বেঁটেখাটো লোক তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বটব্যাল বলল, 'কী মুশকিল!...একটু অপেক্ষা করতে বলো।'

অনন্ত চলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে বটব্যাল বলল, 'আঃ, লোকটা অসময়ে জ্বালাতে এল।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে?'

বটব্যাল বলল, 'বাড়ির দালাল। ও-ই তো বাড়িটার সন্ধান দিয়েছিল। কথা ছিল বাড়ির এক মাসের ভাড়ার টাকা ওকে দিতে হবে। ওটা ওর দালালি। কিন্তু দু-দিনের বেশি বাড়িতে থাকতে পারলাম না, টাকা কেন দেব বলতে পারো?'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'থাকতে পারলে না কেন?'

বটব্যাল বলল, ভূতের উপদ্রবে।'

'ভূতের উপদ্রব? একী বলছ তুমি?'—অনেকটা অবাক হয়েই মিহির বলল, 'ভূত আছে বলে তুমি বিশ্বাস করো? তা ছাড়া কলকাতার বাড়িতে ভূতের উপদ্রব—এ তো আরও আজগুবি কথা। পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে ওই রকম ঘটনা মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে। অবশ্য-আমি তা মোটেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু কলকাতার বাড়িতে—'

মিহির একটু থামল। বটব্যাল বলল, বিশ্বাস তো আমিও করতাম না। কিন্তু দু-দিন ধরে ওই বাড়িতে যা ঘটছে তাতে অবিশ্বাস না করার কোনও কারণ নেই।'

'এমন কী ঘটছে বলো তো?'

'সে ভাই ভয়ানক, শুনলেও বুক কাঁপে।'

'তুমি নিজে দেখেছ না বাড়ির লোকেদের মুখে শুনেছ?'

'আমার নিজে দেখবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়নি। বাড়ির প্রত্যক্ষদর্শীর মুখেই শুনেছি।'

'কী শুনেছ বলো তো। শুনে মনের কৌতূহল চরিতার্থ করি।'

এমন সময় অনন্ত এসে বটব্যালকে বলল, 'ওই লোকটা আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বাড়িতে নাকি ওর বউয়ের খুব অসুখ, এখুনি ডাক্তার আনতে হবে, ওষুধ কিনতে হবে। ওর টাকার খুব দরকার।'

বটব্যাল রাগত কণ্ঠে বলল, 'বলে দাও, আমার সঙ্গে এখন দেখা হবে না। ওকে কাল আসতে বলো।'

মিহির বলল, 'আহা বেচারির টাকার দরকার বলেই এমন তাগিদ দিচ্ছে।'

বটব্যাল বলল, 'ওদের টাকার দরকার সব সময়েই। বাড়িতে বউয়ের অসুখ না ছাই। টাকা আদায় করার একটা ছুতো মাত্র।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'আর কত টাকা পাবে?'

বটব্যাল জবাব দিল, 'কুড়ি টাকা; ত্রিশ টাকা দিয়েছি আর কুড়ি টাকা বাকি রয়েছে।'

'বাড়ি ভাড়া কত?'

'পঞ্চাশ টাকা।'

চেয়ারের উপর বসেই যেন লাফিয়ে উঠল মিহির।—'বলো কী? মোটে পঞ্চাশ টাকা বাড়ি ভাড়া? ঘর ক-খানা?'

'দু-খানা শোবার ঘর, একখানা রান্নাঘর। আর একখানা ঘরও ইচ্ছা করলে ব্যবহার করা যায়।'

'ইচ্ছা করলে মানে?'

'ওটা দোতলার ঘর, খালিই থাকে, তালা বন্ধ! এক বুড়ি বাড়ির দেখাশোনা করে। দরকার হলে তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে খুলে ব্যবহার করা যেতে পারে।'

মিহির পকেট থেকে টাকা বের করল। তিনখানা দশ টাকার নোট বটব্যালকে দিয়ে বলল, 'এই নাও তোমার দেওয়া ত্রিশ টাকা আর দালালের কুড়ি টাকা।'

বটব্যাল অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকার মতো জিজ্ঞেস করল, 'এর মানে তো কিছু বুঝলাম না?'

মিহির বলল, 'এর মানে ওই বাড়িটা নিলাম। তুমি যেদিন থেকে ছাড়বে, সেদিন থেকে ওই বাড়িটা আমার।'

'ওই ভূতের বাড়িটা?'

হ্যাঁ, ওই ভূতের বাড়িটাই নেব। ভূত-টুত আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া বাড়ির আমার ভয়ানক প্রয়োজন। বাড়ির খোঁজেই আজ তোমার এখানে এসেছিলাম।

'তাই বলে ওই বাড়ি?'

'কী করব? আমার এক মাসিমা সপরিবারে হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে উঠেছেন। অর্থাৎ আমার ঘাড়ের উপর এসে পড়েছেন বলতে পারো। তাই ঘাড় থেকে বোঝা নামবার জন্যেই আমার খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি দরকার।'

'কিন্তু ওই ভূতের বাড়িটায় তোমার মাসিমারা থাকতে পারবেন কি না তা চিন্তা করেছ কি?'

'উঠুক তো আগে ওই বাড়িতে। তারপর ভূতের সঙ্গেই না হয় লড়াই করা যাবে।'

'ভূতের বাড়ির কথা শুনলে তোমার মাসিমাই বা ওই বাড়িতে যেতে চাইবেন কেন?'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল মিহির। বলল, 'আমি কি এতই বোকা? ভূতের বাড়ির কথা তাদের বলবই বা কেন? দেখি না কী হয়, তারপর যা ব্যবস্থা করতে হয় করব।'

বটব্যাল বলল, 'তুমি সত্যি বাড়িটা নেবে? তাহলে তো এখনই তোমাকে ভজহরির সঙ্গে গিয়ে বাড়িটা দেখে আসতে হয়। তবে সাবধান, আমি বাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছি এবং তুমি নিচ্ছ একথা ভজহরিকে বোলো না। তাহলে তোমার কাছেও দালালির টাকা চাইবে।'

মিহির বলল, 'সে আর বলার দরকার কী? কিন্তু তোমাদের মালপত্র যখন সরাবে তখন তো সে বুঝতে পারবে।'

বটব্যাল বলল, 'সে তো আর ওখানে থাকে না যে মালপত্র সরাবার সময় দেখতে পাবে। তা ছাড়া মালপত্র এখনও তেমন কিছু নেইনি। দু-তিন দিন পরে মালপত্র নেব বলে স্থির করেছিলাম।'

'তাহলে ভালোই হল। ডাকো তোমার ভজহরিকে। সামনা সামনি যা বলার বলে দাও। আমাকে ওই বাড়িটা দেখিয়ে দিক।'

বটব্যাল অনন্তকে বলল, 'ওই লোকটাকে ভিতরে নিয়ে এসো তো।'

'আচ্ছা বাবু, নিয়ে আসছি', বলে অনন্ত চলে গেল।

বটব্যাল বলল, 'তুমি তো আমার বাড়ির সবাইকে চেনো। ভিতরে ঢুকে কথাবার্তা বলো। ভজহরিকে আর আটকে রেখো না। ওকে ছেড়ে দিয়ো।'

এমন সময় ভজহরিকে নিয়ে অনন্ত এসে উপস্থিত হল।

বটব্যাল বলল, 'ওহে ভজহরি, এই নাও তোমার বাকি কুড়ি টাকা। তুমি খুশি হলে তো?'

ভজহরি আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, 'আমার ভারী উপকার করলেন বাবু। বউয়ের খুব অসুখ, একেবারে মরমর অবস্থা। এক্ষুনি ডাক্তার আনতে হবে, ওষুধ কিনতে হবে, পথ্যের জোগাড় করতে হবে—'

সে আরও কী বলতে চাইছিল। বটব্যাল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন তোমার বক্তৃতা রাখো। আমার এই বন্ধুটিকে সেই বাড়িতে নিয়ে যাও তো। আমি এখন যেতে পারছি না।'

ভজহরি মিহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওঃ, উনি বুঝি বাড়িটা চেনেন না? তা ঠিকানা দিয়ে দিন না। ৪০ বাই ২-এর বাসে উঠে ঘুঁটেপাড়ার মোড়ে নেমে সেখান থেকে ৮০ বাই ৩-এর বাসে খালপুলের মুখে নেমে—'

বটব্যাল বলল, 'আঃ, আবার তোমার বক্তৃতা শুরু হল? যাতায়াত ভাড়ার জন্য চিন্তা কোরো না, আমার বন্ধু দেবেন।'

মিহির বলল, 'তা ছাড়া এই নাও এক টাকা বকশিশ।'

ভজহরি এবার পারে তো মিহিরবাবুকে মাথায় তুলে নিয়ে যায়। তাই বলল, 'চলুন বাবু, আমি তো পা বাড়িয়েই আছি।'

মিহির বলল, 'আচ্ছা চলো।'

বটব্যালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন আসি হে সুনীল, পরে আবার দেখা হবে।'

ভজহরিকে নিয়ে মিহির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুনীল বটব্যাল বসে বসে ভাবতে লাগল কাজটা ভালো হল কি?

অন্তরঙ্গ এক বন্ধুকে বিপদের মুখে ফেলা হল। কিন্তু এ ছাড়া আর কি-ই বা করা যেত। মিহির তো জেনেশুনেই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিল।

দেখা যাক, এই ভুতুড়ে নাটকের পরবর্তী দৃশ্য কী!

॥ তিন ॥

ধূর্ত ভজহরি

ভজহরি বড়ো ধড়িবাজ লোক। জলের মতো সহজভাবে পথের নিশানা বলে গেল, কিন্তু যেতে গিয়ে দেখা গেল বড়ো ঘোরালো পথ।

দ্বিতীয়বার বাস থেকে নেমেই মিহির জিজ্ঞেস করেছিল, কী হে, কতদূর হাঁটতে হবে?'

ভজহরি জবাব দিয়েছিল, 'এই তো এসে গেছি বাবু।'

তারপর শুরু হল হাঁটা। পথ আর ফুরায় না।

মিহির ক্লান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হে আর কত বাকি?'

ভজহরি জবাব দিল, 'এই, আর কয়েক পা এগুলেই—বাবু—

কয়েক পা-র বদলে কয়েক-শ পা হাঁটা হয়ে গেল। গলির পর এঁদো গলি তারপর

কানাগলি। সেই কানাগলির শেষ প্রান্তে বাড়িটি ১৪।৪।১-বি মদনবিহারী কালাকার লেন।

বাড়ির কাছে এসে মিহিরের প্রাণান্ত। জলতেষ্টা পেয়ে গেল। ভজহরি কিন্তু খুব খুশি। গদগদ হয়ে, 'দেখুন বাবু, কী চমৎকার বাড়িই না আপনার বন্ধুকে জোগাড় করে দিয়েছি। এত সস্তা ভাড়ায় এমন ভালো বাড়ি মাথাকুটেও কেউ পাবে না। আপনারও কি বাড়ির দরকার?

মিহির মনের ভাব গোপন করে বলল, 'না না, দরকার নেই।' বাড়িটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। গেটের দরজা বন্ধ। কয়েকবার কড়া নাড়ার পর থুরথুরে এক বুড়ি এসে দরজা খুলে দিল। ক্যাটকেটে গলায় বলল, 'বাব্বা, এই ভর দুপুরে কী জ্বালাতন! কাকে চাই?'

মিহির বুড়িকে দেখে চমকে উঠল। কী বিশ্রী চামচিকের মতো চেহারা! মাংসের লেশমাত্র শরীরের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। মিহির বলল, 'এ বাড়িতে যে নতুন ভাড়াটে এসেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

বুড়ির এবার দৃষ্টি পড়ল ভজহরির দিকে। তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে আবার নতুন খদ্দের আনলি বুঝি?'

ভজহরি বলল, 'না না, উনি ভাড়াটের বন্ধুলোক।'

মিহির ভজহরিকে বলল, 'এবার তুমি যেতে পারো।'

ভজহরি বলল, 'আমার কাজ তো এখনও শেষ হয়নি, বাবু। বাড়ির লোকের সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দিই।'

বুড়ি কী রকম অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর ভিতরে চলে গেল। ভজহরি মিহিরকে বলল, 'আপনি এদিকে আসুন।'

দোতলা বাড়ি। ছোট্ট একফালি চাতাল পেরিয়ে ভজহরি মিহিরকে নিয়ে একতলার একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরটা বন্ধ। ভজহরি নিজেই এগিয়ে গিয়ে কড়া নাড়াল। কিছুক্ষণ পরেই এক মধ্যবয়সি ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। মিহির তাঁকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন মাসিমা?'

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ মিহিরের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।'

মিহির বলল, 'আমি সুনীলের বন্ধু মিহির।'

ভদ্রমহিলার চোখে মুখে একটা হাসির আভাস ফুটে উঠল। বললে, 'ওঃ, তুমি মিহির? এতদিন পরে দেখে চিনতেই পারিনি। তারপর হঠাৎ কী মনে করে? এসো, ভেতরে এসো।'

মিহিরের সঙ্গে ভজহরিও ঘরে ঢোকবার জন্য পা বাড়াল। ভদ্রমহিলা স্বভাবসুলভ ভদ্রতায় বললেন, 'আসুন, আপনিও আসুন।'

মিহির কোনও আপত্তি করল না। তার সঙ্গে ভজহরিও ঘরে গিয়ে বসল। ঘরের আসবাবপত্র সব অগোছালো। একটি সোফা এক ধারে রেখে দেওয়া হয়েছে, তার পাশে

একটি টুল। মিহির সোফায় বসল, ভজহরি বসল টুলে। মিহির বলল, 'আগে এক গ্লাস জল দিন তো মাসিমা। গলি ঘুরতে ঘুরতে একবারে হাঁপিয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ দিচ্ছি' বলে ভদ্রমহিলা ভিতরের দিকে চলে গেলেন। তার একটু পরেই এলেন হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে। আবার ভিতরে চলে গেলেন। ভদ্রমহিলা হয়তো চা ও জলখাবারের ব্যবস্থার জন্যই তাদের একটু বসতে বলে গেলেন।

মিহির কিন্তু ভজহরির কার্যকলাপে বেশ একটু আশ্চর্য বোধ করল এবং ক্রমশ বিরক্তও হতে লাগল। ঘরে যার স্ত্রী মরণাপন্ন সে কীভাবে এতক্ষণ নিশ্চিন্তভাবে বাইরে থাকে আর যাবার নামটিও করে না! সুনীল যে বলেছিল, বউয়ের আসুক-বিসুক কিছু না, ওটা টাকা নেওয়ার ফন্দি, সে কথাটাই ঠিক।

কিন্তু এমনভাবে পেছনে লেগে থাকার মানে কী হতে পারে? লোকটা কি ভিতরের কোনও খবর জেনে নিতে চায়? অথবা এই বাড়িটা মিহির নেবার জন্য আগ্রহী তা সে অনুমান করতে পেরেছে?

লোকটা যে ঘুঘু তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মিহিরও সতর্ক, সহজে ধরা দেবে না।

ভদ্রমহিলা কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক—সম্ভবত বাড়ির পরিচারিকা—তার হাতে দু-কাপ চা ও দু-প্লেট খাবার।

মিহির তা দেখে একটু বিস্মিত হল। এই ভূতুড়ে বাড়িতে কি সবই ভূতুড়ে, এত তাড়াতাড়ি চা আর খাবার এল কী করে?

ভজহরি যেন চা আর খাবারের আশাতেই বসেছিল। প্লেটের চারখানা গরম লুচি সঙ্গে সঙ্গেই উদরস্থ করল। তারপর এক চুমুকেই সবটুকু গরম চা নিঃশেষ। তলানি পর্যন্তও রাখল না। মিহিরের কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল।

ভদ্রমহিলা সুনীল বটব্যালের মা। ধরিত্রীদেবী। তিনি তক্তাপোশের উপর বসে মিহিরের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। বাড়ির কথা উঠতেই মিহির ভজহরিকে বলল, 'ভজহরি, তুমি এবার যেতে পারো। আমাদের এখন ঘরোয়া কথাবার্তা হবে। তা ছাড়া তোমার তো তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। বাড়িতে তোমার বউয়ের অসুখ। তুমি চলে যাও, আমার যেতে একটু দেরি হবে।'

ভজহরির তবু উঠবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এমন করে বলার জন্যই বুঝি নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়ল।

মিহির এবার ধরিত্রীদেবীকে বলল, 'নতুন বাড়িতে এলেন, চলুন, বাড়িটা একটু ঘুরে দেখি।'

ধরিত্রীদেবী মিহিরকে নিয়ে বাড়ির ঘরগুলি দেখাতে লাগলেন। বাড়িটা দেখে মিহরের ভালোই লাগল। বলল, 'বাড়িটা তো মোটামুটি ভালোই, তবে গলিটাই যা বিদঘুটে। তবু কলকাতায় যা বাড়ির সমস্যা তাতে এত কম ভাড়ায় এমন বাড়ি পাওয়া খুবই মুশকিল।'

একটা ঘর তালাবন্ধ। সে ঘরটা ধরিত্রীদেবী খুললেন না। মিহির জিজ্ঞেস করল, 'এ ঘরটা কি আপনাদের ভাড়ার মধ্যে নয়?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'এটার সঙ্গে ভাড়ার কোনও সম্পর্ক নেই। ইচ্ছা করলেই ব্যবহার করা যায়। প্রথম দিন খুলেছিলাম। তারপর সুনীল এটা ব্যবহার করতে বারণ করে গেছে। খুলতেও বারণ করেছে।'

মিহির বলল, 'থাক, তাহলে আর খুলে দরকার নেই।'

একপাশে একটা সরু সিঁড়ি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ওটা কি দোতলায় উঠবার সিঁড়ি?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'হ্যাঁ কিন্তু আমরা দোতলায় উঠি না। উঠে আর কী হবে?'

মিহির বলল, 'সুনীলের মুখে শুনলাম আপনারা নাকি এ বাড়িটা শিগগিরই ছেড়ে দেবেন?'

পেছন দিক দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ধরিত্রীদেবী মিহিরকে নিয়ে চাতালের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, রাত হলেই কেমন যেন ভয় ভয় করে। বাড়ির ঝি মোক্ষদা তো দু-দিন ধরে রোজই ভয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। তাই আমরা বড়ো ভাবনায় পড়ে গেছি।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখে সে চিৎকার করে আর কী জন্যই বা অজ্ঞান হয় তার খোঁজ নিয়েছেন কি?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'ও কিছু পরিষ্কারভাবে বলতে পারে না। শুধু বলে কী যেন ওর সামনে, কখনও পেছনে চলে বেড়ায়। কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পায় না।'

মিহির বলল, 'আমার মনে হয় মোক্ষদা বড্ড ভিতু।'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'আমাদের বাড়িতে তো সে অনেকদিন কাজ করছে, কিন্তু ভিতু বলে তো কখনও মনে হয়নি। একদিন তো চোরের পেছনে ধাওয়া করে সে চোরের হাত থেকে জিনিস কেড়ে রেখেছিল। এ বাড়িতে এসেই যেন সে কেমন হয়ে গেছে। তাই তো আমরাও বড়ো ভাবনায় পড়েছি।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কিছু দেখেছেন?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'না, এখনও কিছু দেখিনি। কিন্তু রাত হলেই শরীরটা কেমন ভার হয়ে যায়, বুকটা ধুকপুক করতে থাকে। মনে হয় কে যেন বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো কী একটা অশুভ জিনিস এই বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'সে জন্যই বুঝি সুনীল এ বাড়ি ছাড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'বাড়ি পেলে আজকেই আমরা চলে যাব।'

এমন সময় হঠাৎ মিহিরের চোখে পড়ল, সেই বাড়িটারই অপর দিকের অংশের একটি

ঘরের জানালা খোলা। আর সেই জানালায় দুটি কৌতূহলী মুখ। তারা উৎকর্ণ হয়ে যেন এইসব কথাবার্তা শুনছে। দুটো মুখই চেনা। একটি মুখ সেই বুড়ির আর একটি মুখ ভজহরির।

ভজহরি তাহলে যায়নি? বুড়ির ঘরে লুকিয়ে আছে?

মিহিরের শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের শক লাগল। নিশ্চয়ই ভজহরির মনে কোনও দুষ্ট বুদ্ধি আছে। মনে হয় সব ব্যাপার সে আড়ি পেতে দেখছে ও শুনছে।

হঠাৎ জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। জানালা বন্ধের শব্দ শুনে ধরিত্রীদেবী সেদিকে তাকালেন। কিন্তু কোনও কিছু বুঝতে পারলেন না।

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'ওই ঘরে কে থাকে?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'এক বৃদ্ধা মহিলা। অনেকদিন ধরেই এই বাড়িতে আছেন। ধরতে গেলে উনিই এখন বাড়ির মালিক। কারণ মালিক নাকি কলকাতায় নেই। ওই বৃদ্ধাই বাড়িভাড়া আদায় করেন।'

মিহির বলল, 'ওই বাড়ির দালালটা কি রোজই এই বাড়িতে আসে? ওই যে, যে লোকটা আমার সঙ্গে বসে চা-জলখাবার খেয়ে গেল?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'অত কি আর আমি লক্ষ রাখি বাবা? তবে আমার চোখে তো পড়েনি।'

মিহির বলল, 'ওই লোকটাকে সাবধান। খুব সুবিধার লোক বলে মনে হয় না। যা হোক এখন আমি আসি মাসিমা। পরে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

ধরিত্রীদেবী বললেন, 'আর একটু বসে যাও বাবা।'

মিহির বলল, 'না মাসিমা। আমার মাথায় ভারী বোঝা চেপে আছে। সে বোঝা নামাতে পারলেই তবে শান্তি।'

ধরিত্রীদেবী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন কী হয়েছ?'

মিহির বলল, 'সেসব কথা এক সময় বলব আপনাকে। ...পরে সবই জানতে পারবেন।'

মিহির চলে গেল। ধরিত্রীদেবী কী যেন আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন, ভজহরি চোরের মতো চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সুনীল বাড়িটা ছেড়ে দিল। নিজেদের ভাঙা বাড়িতেই আবার উঠে এল। মা ধরিত্রীদেবী কিছুতেই সেই ভূতুড়ে বাড়িতে থাকতে রাজি হলেন না।

বললেন, 'কষ্টে-শিষ্টে থাকি তবু নিজের বাড়িতেই কোনওরকমে কাটিয়ে দেব। তবু ওই রকম ভয় ভাবনা নিয়ে রাত কাটানো চলে না। রাত হলে যেন গায়ের রক্ত শুকিয়ে যায়।'

॥ চার ॥

বিজয়ের প্রসঙ্গ

সেই বাড়িতেই এসে উঠলেন মিহিরের মাসিমা মলিনাদেবী। মিহিরদের বাড়িতে উঠে যে কষ্টের মধ্যে কয়েকদিন ছিলেন, এই বাড়িতে এসে সেই কষ্ট ভুলে গেলেন। হাত-পা মেলে ছড়িয়ে থাকতে পারলেন।

তথাকথিত বাড়িওয়ালি বুড়ি কিন্তু ভয়ানক সেয়ানা। পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন সে টের পেল যে নূতন কিছু লোক বাড়িতে আমদানি হয়েছে, তখন জানালায় আড়ি পেতে দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বুঝতে পারল বাড়ির সবগুলি লোকই নূতন। তখন তার খুব সন্দেহ হল।

বুড়ি হাঁটতে হাঁটতে এল মলিনাদেবীর ঘরে। এসে প্রথমে ভাব জমাবার চেষ্টা করল। বলল, 'তোমরা নতুন এলে বুঝি? বেশ বেশ! তাই তো বলি ঘরে নতুন লোকের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কেন?' বুড়ি একটু থামল। তারপর ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল, 'রাত্রিবেলায় চুপি চুপি এলে, একটু জানতেও পারলাম না। তোমরা না হয় অচেনা লোক। কিন্তু যারা ছিল তারাও তো একটু জানিয়ে যেতে পারত।'

মলিনাদেবী বুঝতে পারলেন বাড়িওয়ালি বুড়ি তাঁর কাছ থেকে কথা বের করবার চেষ্টা করছে। তাই বলল, 'না, না, তারা তো যায়নি। আমরা তো তাদের বাড়িরই লোক। আমি তো সুনীলের মাসিমা।'

বুড়ি কিন্তু বাঁকা পথে চলল। বলল, 'মাসিই হও আর পিসিই হও—তোমাদের রেখে ওরা চলে গেল চুপিচুপি, এটা কেমন ভদ্রতা? আমি কি বাড়ির কিছুই নই? কাল আফিংটা একটু বেশি খেয়েছিলাম বলে ঝিমুনিটা একটু বেশি এসেছিল। তাই কিছু টের পাইনি।'

মলিনাদেবী বললেন, 'ওরা তো যায়নি। ওই তো ওদের জিনিসপত্র ঘরে রয়েছে। আবার ওদের দেখতে পাবেন।'

বুড়ি ঘরের জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে গজগজ করতে করতে চলে যাচ্ছিল। মলিনাদেবী বললেন, 'আহা চলে যাচ্ছেন কেন? বসুন।'

'আর বসব কী করতে? সব তো জেনেই নিলাম।'

'চা খান।'

চায়ের কথা শুনে বুড়ির চোখ মুখের চেহারা যেন পালটে গেল। পেছন ফিরে বলল, 'আবার চা কেন?'

'আমাদের চা হচ্ছে। এসেছেন যখন—'

বলতে বলতেই চা এসে গেল। সঙ্গে মাখন-মাখানো পাউরুটি ও সন্দেশ। বুড়ি এমন লুব্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল মনে হল এ ধরনের খাবার সে কোনওদিন চোখে দেখেনি।

খাবার খেতে খেতে বুড়ি খুব খুশি হয়ে উঠল। মন যেন তার উদার হয়ে গেল। বলল, 'ওরা কেন চলে গেল তা জানি।'

মালিনাদেবী বিস্মিতভাবে বুড়ির দিকে তাকালেন। কী বলতে চায় বৃদ্ধা! আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী জানেন আপনি?'

বুড়ি জবাব দিল, 'তা তোমাদের কাছে বলে আর কী হবে?'

মলিনাদেবী বললেন, 'বলুন না।'

বুড়ি বলল, 'তবে একটা কথা আমি বলতে পারি যারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তারা আর আসে না।'

মলিনাদেবী চমকে উঠলেন সে কথা শুনে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

বুড়ি তারিয়ে তারিয়ে পাউরুটি আর সন্দেশ সহযোগে চা খেতে লাগল। ফোকলা দাঁতে পাউরুটি চিবুতে চিবুতে বলল, 'আসবে কেন? আমি হলে আমিও আসতাম না। শুধু ভিটার মায়ায় পড়ে আছি। সে তোমরা বুঝবে না মা, পরে একদিন বলব।'

খেতে খেতে থামল একটু। কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না। মলিনাদেবী উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নিজের খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল।

বুড়ি কিন্তু অক্লেশে খেয়ে যেতে লাগল। বলল, 'তোমরাও হয়তো এমনি করে একদিন চলে যাবে।'

বুড়ি চা ও খাবার নিঃশেষ করে চলে গেল।

মলিনাদেবী বসে বসে ভাবতে লাগলেন, বৃদ্ধার কথাবার্তায় কী রকম যেন একটা রহস্য। মিহির কেমন বাড়িতে আমাদের নিয়ে এল?

যাক, বাড়িটা যে পাওয়া গেছে এটাই সবচেয়ে সৌভাগ্য। বাড়িওয়ালির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী? তার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা না বললেই হল।

কিন্তু আবার ভাবতে লাগলেন, বৃদ্ধার মুখ থেকে বাকি কথাগুলো শুনে নেওয়া দরকার। নানারকম চিন্তাভাবনার মধ্যে সেদিনটা কেটে গেল।

মলিনাদেবীদের সংসারের লোকজন নেহাত কম নয়। স্বামী পীড়িত, তাঁর জন্য একটি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। সে ঘরে বিশেষ লোকজন যেতে দেওয়া হয় না। অন্যান্য ঘরে ছেলে এবং দুই মেয়ে নিয়ে তিনি থাকেন। দোতলার ঘরটির চাবি নিয়ে রাখা হয়েছে, এখনও সেই ঘরটি ব্যবহার করা হয়নি।

বড়োছেলে বিজয় মিহিরের প্রায় সমবয়সি। অমরনাথ পীড়িত থাকায় বিজয়ই সংসারের সব কিছু দেখাশোনা করে।

বিকেলবেলা বিজয় কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় এল মিহির। কাল রাতটা মাসিমার কীভাবে কেটেছে তা জানবার জন্য তার

মনে একটা কৌতূহল রয়েছে। কিন্তু সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা হল না। তাই প্রথমে কিছু জিজ্ঞেস না করে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল।

মলিনাদেবী হেসে মিহিরকে আপ্যায়ন করলেন, 'এসো, এসো মিহির।'

বিজয় কোথায় গেছে? ওকে দেখছি না তো?'

'দোকানে কী সব জিনিসপত্র কিনতে গেছে। সেই দুপুরে গেছে। অনেকক্ষণ আগেই তার ফেরার কথা; এখনও কেন যে এল না—বড়ো ভাবনা হচ্ছে।'

'ভাবনার কী আছে। কলকাতা শহর, হয়তো দোকানে বাজারে ঘুরছে।'

মিহির তক্তাপোশে বসতে যাচ্ছিল। মলিনাদেবী বললেন, 'ওখানে বসছ কেন বাবা। সোফায় বোসো।'

সুনীলদের সোফাটা তখনও সেই ঘরে ছিল। দু-দিন আগে এসে এখানেই সে বসেছিল। তাতেই আজও বসল। মলিনাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের বাড়ির সবাই ভালো আছে তো?'

'হ্যাঁ, ভালো আছে মাসিমা। আপনারা চলে আসার পর আমাদের বাড়ি যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। ভারী খারাপ লাগছিল আজ ভোরবেলায় উঠে।'

'তা তো লাগবেই। আমাদেরও খারাপ লাগছিল।'

এবার মিহির অন্য প্রসঙ্গে আসবার সাহস পেল। জিজ্ঞেস করল, 'এখানে আপনাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

মলিনাদেবী বললেন, 'না, কোনও অসুবিধা হবে কেন? বাড়িতে প্রচুর জায়গা। হাত-পা মেলে এখানে থাকতে পারছি।'

এমন সময় বিজয় এসে উপস্থিত হল। অনেক কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এসেছে। কিছু এনেছে নিজের হাতে আর কিছু এনেছে কুলির মাথায়। এসেই মিহিরকে দেখে হই হই করে উঠল। বলল, 'তোদের বাড়িতে গেছলাম। তোকে না পেয়ে তোর মায়ের কাছে বলে এসেছি আমাদের এখানে অতি অবশ্য আসতে।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কী এমন জরুরি ব্যাপার?'

'নিশ্চয় জরুরি। এখন নয়, পরে বলব।' ১৮

মিহিরের বুক ধুকপুক করতে লাগল। নানা সন্দেহ তার মনে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। কথাটা শুনতেও ভরসা হচ্ছিল না, আবার না শুনেও কেমন অস্বস্তি লাগছিল।

বিজয় কুলির মাথা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে কুলিকে বিদায় করে দিল। হাত-পা ধুয়ে এসে বসল মিহিরের পাশে।

চা খেতে খেতে অনেক গল্প গুজব হল। মিহিরের কিন্তু জরুরি কথাটি শোনবার জন্য ভয়ানক কৌতূহল। কিন্তু বিজয়ের বলবার কোনও আগ্রহ নেই।

মিহির ভাবল, এবার না উঠলে বিজয় জরুরি কথাটি বলবে না। তাই বলল, 'এবার উঠি মাসিমা, আসি বিজয়।'

বিজয় বললে, 'সে কী রে, উঠবি কেন?'

'বাঃ, বাড়ি যাব না?'

'না, আজকে যেতে হবে না, এখানেই থাকবি।'

'মানে?'

'মানে আর কী? এখানেই আহার, এখানেই রাত্রিবাস।'

'তা হলেই তো সর্বনাশ!'

'বাঃ, কবিতার মতো বেশ মিল করে কথা বলছিস দেখছি।'

'তা হল বটে। ওদিকে আমার বাড়িতে যে খাবার নষ্ট হবে।'

'না, নষ্ট হবে না। আমি মাসিমাকে বলে এসেছি।'

'কিন্তু বাড়ি না ফিরলে যে সবাই চিন্তার করবে।'

'না, চিন্তা করবে না। সে কথাও বলে এসেছি।'

যা হোক মিহিরকে থাকতেই হল।

সন্ধ্যা হতেই মিহির লক্ষ করল, বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট নেই। ঝি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। হ্যারিকেনটাও সদ্য কেনা বলে মনে হয়।

ঘরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে মিহির বলল, 'বাড়িতে ইলেকট্রিক অয়্যারিং রয়েছে দেখছি। লাইট নেই কেন?'

বিজয় বলল, 'মান্ধাতা আমলের ইলেকট্রিক অয়্যারিং, কবে কোন যুগে এ বাড়িতে লাইট জ্বলত, তা হয়তো ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়।'

মিহির বলল, 'কলকাতায় বাস করতে হলে লাইট অবশ্য দরকার। তোরা চেষ্টা করে এবার আনিয়ে নে।'

বিজয় বলল, 'তা অবশ্য চেষ্টা করব। কিন্তু আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে না। বাইরে তো আমরা ইলেকট্রিক লাইট ছাড়াই বাস করতাম।'

বৈদ্যুতিক আলোতে বাস করা অভ্যাস, তাই মিহিরের খুব ভালো লাগছিল না। তবু বিজয়ের অনুরোধ ও উপরোধে তাকে থাকতেই হল। খাওয়া-দাওয়া করতে করতে বাজল রাত প্রায় দশটা।

বাড়িতে দোতলার যে ঘরটা বন্ধ ছিল, সেই ঘরটার উপর মিহিরের আগ্রহ জেগে উঠল। বলল, 'আয়, তোতে-আমাতে ওই ঘরটায় শুয়ে রাত কাটাই।'

বিজয় বলল, 'না, ও ঘরটা বড্ড অপরিষ্কার। রাত্রিবেলায় পরিষ্কার করাও সম্ভব হবে না।'

মিহির বলল, 'যতটুকু পরিষ্কার করা যায় তাতেই চলবে। পরে না হয় ভালোভাবে পরিষ্কার করা যাবে।'

তাই করা হল। দোতলার ঘরটা খুলতেই বেরিয়ে এল একটা ভ্যাপসা গন্ধ। জানালাটা

খুলতেই ভাঙা ঘুলঘুলিটা দিয়ে কয়েকটা চামচিকে উড়ে পালাল। মোটামুটি ঝাড়ু দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খুলে রাখা হল ঘরটাকে। নীচে থেকে তক্তাপোশও উপরে তোলা হল।

এবার শোবার পালা। শুতে শুতে হয়ে গেল রাত প্রায় বারোটা। পাড়াটা নিঝুম হয়ে গেছে। কানাগলিতে একেই বিশেষ কোনও লোকের যাতায়াত নেই, তার উপর এত রাত্রে জায়গাটাকে একটা পল্লিগ্রাম বলেই মনে হল।

এই অবস্থায় বাস করতে মিহির অভ্যস্ত নয়। কাজেই তার কাছে খুবই অস্বস্তি লাগল। তবু তার মনের কৌতূহল—বিজয়ের সেই জরুরি কথাটা শোনবার আগ্রহ তার মনকে ব্যাকুল করে তুলল।

অনেকক্ষণ কেটে যায় তবু বিজয় কিছু বলে না। তখন মিহির নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, সেই জরুরি কথাটা বললি না?'

বিজয় বলল, 'কোন জরুরি কথা?'

'ওই যে বলবি বলেছিলি।'

হো হো করে হেসে উঠল বিজয়। বলল, 'সেই জরুরি কথা বলতে কি এখনও বাকি আছে?'

বিস্মিতভাবে মিহির জিজ্ঞেস করল, 'কখন বলবি?'

'তোকে যে এখানে খেতে হবে, থাকতে হবে এটা কি জরুরি ব্যাপার নয়?'

বাতাস বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতো চুপসে গিয়ে মিহির বলল, 'ওঃ, এই ব্যাপার?'

কৌতূহল কাটল কিন্তু অস্বস্তি গেল না। শোবার পর কত রকম ভাবনা তার মনে আসতে লাগল। সুনীলরা তিন রাত্রির বেশি এই বাড়িতে থাকতে পারলে না কেন? এদের তো আজ নিয়ে তিন রাত্রি কাটবে। এরা কি থাকতে পারবে এই বাড়িতে? যদি থাকতে পারে তবে তো ভালোই। কিন্তু না থাকতে পারলেই আবার ঝামেলা দেখা দেবে।

হঠাৎ ঘরের পেছন দিকে কী যেন একটা শব্দ শোনা গেল। লোকের পায়ের শব্দ কি?

তাহলে কি এ বাড়ির কেউ এখনও জেগে আছে?

কিন্তু এত রাত্রে কারুর জেগে থাকার তো কথা নয়?

মিহির ধীরে ধীরে ডাকল, 'বিজয়—বিজয়!'

বিজয়ের কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

মিহিরের সন্দেহ হল। এত তাড়াতাড়ি বিজয় ঘুমিয়ে পড়ল! কিন্তু নানা ভাবনায় যে অনেকক্ষণ কেটে গেছে তা হয়তো খেয়াল নেই। তাই আবার ডাকল, 'বিজয়—বিজয়!'

এবারও সাড়া পাওয়া গেল না। বরং মৃদু নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল। সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

ওদিক থেকে কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল। আবার সেই পায়ের শব্দ।

সুনীলের মায়ের কথা মিহিরের মনে জাগতে লাগল। ধরিত্রীদেবী বলেছিলেন, কী যেন

কখনও সামনে কখনও পেছনে চলে বেড়ায়, কিন্তু চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। একি সেই আত্মা?

কিন্তু বিজয়রা কেউ এর সন্ধান পায়নি কেন? বিজয় তো বেশ নির্বিবাদে ঘুমোচ্ছে! এ বাড়ির অন্যান্য সকলেই বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বেলায় এমন হল কেন?

আবার সেই শব্দ। কয়েকবার শব্দ হওয়ার পর যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

এবার ঘুমোতে চেষ্টা করল মিহির। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসতে চায় না। নানারকম ভাবনা যেন তার মাথায় ঘুরতে লাগল।

বুড়ি তো এ বাড়িতে আছে অনেকদিন। তার কোনও ভয়-ভাবনা নেই কেন? বুড়ি কি এই ব্যাপারটা জানে? জানলেও সে ভয় পায় না কেন?

আবার সেই শব্দটা শোনা যায় কি না সেজন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল মিহির। ...না, শব্দটা আর শোনা গেল না।

এরও বেশ কিছুক্ষণ পর মিহির ঘুমিয়ে পড়ল।

খুব ভোরেই মিহিরের ঘুম ভেঙে গেল। এত দেরি করে ঘুমোবার পরও ঘুম ভাঙতে দেরি হল না। অবশ্য মলিনাদেবী ও অন্যান্যরা অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে গেছেন। কেবল বিজয়ই তখনও ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে একটু নাক ডাকারও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে চায়ের ডাক শুনেই কিন্তু বিজয় জেগে উঠল। মলিনাদেবী বললেন, 'ওর ঘুমটাই ওরকম। চ্যাঁচামেচি করলেও উঠবে না। কিন্তু চায়ের পেয়ালার টুং টাং আওয়াজ শুনেই জেগে উঠবে।'

মিহির হেসে বলল, 'এ-ও এক ধরনের কুম্ভকর্ণ। ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণের কিন্তু চায়ের পেয়ালার শব্দে ঘুম ভাঙত না।'

মনে মনে ভাবল, ভূতের পায়ের শব্দেও হয়তো বিজয়ের ঘুম ভাঙবে না। যাক, তবু বাঁচোয়া।

কিন্তু শুধু বিজয়কেই যে সেই অশরীরী আত্মা আক্রমণ করবে তার নিশ্চয়তা কী? বাড়ির অন্যান্য লোকের ঘুম তো আর বিজয়ের মতো নয়। তবে?

চা খেয়েই বিদায় নিল মিহির। তাকে বাড়ি গিয়ে তৈরি হয়ে কাজে বেরুতে হবে। কিন্তু মন তার বিষণ্ণ—চিন্তায় ভরাক্রান্ত। এই বাড়ির রহস্যটা কী?

মিহির বাড়ি ফিরে ভাবতে লাগল—ওই ভূতুড়ে বাড়িতে মাসিমারা থাকতে পারবে কি? যদি না থাকতে পারে তবে আবার বাড়ি খুঁজতে হবে তাদের জন্য।

কিন্তু ওই ভুতুড়ে বাড়ির রহস্যটা কী? বর্তমান যুগে ভূতকে বিশ্বাস করাও অন্যায়। অথচ ভূতকে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। বিশেষ করে কাল রাত্রের ঘটনায় মনে একটা সন্দেহও জেগেছে।

সারাদিন একটা অস্বস্তির ভিতর দিয়ে মিহির দিন কাটাল। সন্ধ্যা হতে না হতেই ভাবল,

আজ ওই বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাব কি? তা হলে রহস্যের একটা কিনারাও হয়তো হতে পারে।

যাই যাই করেও যাওয়া হল না। নানা চিন্তার মধ্য দিয়ে রাতটাও কেটে গেল।

॥ পাঁচ ॥

পায়ের শব্দ?

পরদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে যথারীতি হাত-মুখ ধুয়ে মিহির চা খেতে বসেছে এমন সময় হঠাৎ বিজয় এসে উপস্থিত। তাকে দেখে মিহির চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'আরে বিজয় যে! এই সক্কালবেলা কী ব্যাপার?'

বিজয়ের মুখ গম্ভীর, দেখে মনে হল কোনও চিন্তায় তার মন ভরাক্রান্ত। তা দেখে মিহিরও চিন্তিত হয়ে পড়ল। জবাবের আশায় তাকিয়ে রইল বিজয়ের মুখে দিকে।

বিজয় বলল, 'ব্যাপার একটু গুরুতর। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। চল এসব কথা বাড়ি বসে হবে না, অন্য কোথাও যাই।'

মিহির বলল, 'তুই বড়ো বেরসিক রে! বোস, আগে চা-টা খা, তারপর অন্য কথা। এই বলেই মিহির চিৎকার করে বাড়ির ভিতরের উদ্দেশে ডাকল, 'মা, বিজয় এসেছে। আর এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক কাপ চা ও সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে মিহিরের মা সুনীতিদেবী নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বিজয়, কেমন আছ?'

বিজয় মুখে একটু কৃত্রিম হাসি ফুটাবার চেষ্টা করে বলল, 'এই মাসিমা চলে যাচ্ছে—'

'বাড়ির সবাই ভালো তো?'

'হ্যাঁ, ভালো।'

'বাড়িটা কেমন, পছন্দ হয়েছে তো?'

'হয়েছে বই কি। আপনি তো গেলেন না—' কথাটা শেষ করতে গিয়েও বিজয়ের মুখে আটকে গেল।

সুনীতিদেবী সেই অসমাপ্ত কথার জের টেনেই বললেন, 'ভাবছিলাম, একদিন গিয়ে তোমাদের বাড়িটা দেখে আসব। সময় করতে পারছি না। তোমার সঙ্গেই পরে একদিন যাব।'

বিজয় বলল, 'তা বেশ, যাবেন বই কি। আমিই এসে একদিন নিয়ে যাব।'

'বেশ, তাই হবে। এখন যাই বাবা, রান্নাঘরে অনেক কাজ রয়েছে।' সুনীতিদেবী চলে গেলেন।

মিহির ও বিজয় বসে চা খেতে লাগল। খাওয়া শেষ না হওয়া অবধি কেউ কোনও কথা বলল না। ঘরের আবহাওয়াটাও যেন ভারী হয়ে উঠল।

চা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর বিজয় বলল, 'চল, বাইরে কোনও রকে বা পার্কে গিয়ে বসি। এখানে ওসব কথা নিয়ে আলোচনা ঠিক করা হবে না।'

মিহির অনুমান করতে পারল, কী আলোচনা বিজয় করতে চায়। তবু না জানার ভান করে জিজ্ঞেস করল, 'এমন কী আলোচনা রে?'

বিজয় বলল, 'আলোচনাটা একটু গুরুতর। বাড়িতে মেয়েরা রয়েছে, তাদের মনে নানা সন্দেহ জাগতে পারে।'

মিহিরের মনে কিন্তু কোনও সন্দেহ রইল না। পরিষ্কার বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই কাল রাত্রে ওই বাড়িতে কোনও ভূতুড়ে কাণ্ড হয়েছে, যার জন্য ছুটে এসেছে বিজয়। তাই বলল, 'বেশ, তা হলে চল কোনও নিরিবিল জায়গায় গিয়ে বসি।'

কিছুদূর গিয়ে ছোট্ট একফালি পার্ক। সেখানে একটা ভাঙা বেঞ্চির পাশে দুজন বসল। মিহির বলল, 'কাল তুই চলে আসবার কিছুক্ষণ পরেই আমি বাজারে যাবার জন্য বের হলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় একটি লোকের সঙ্গে দেখা। লোকটি দূর থেকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে বলল, 'মশাই, আপনি বুঝি ১৪।৪।১-বি বাড়িটায় থাকেন?

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

লোকটি বলল, 'ওটা তো হানাবাড়ি'।

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'হানাবাড়ি! বলছেন কী মশাই?'

লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, যে আসে সে তো তিন-চার দিনের বেশি থাকতে পারে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন? কে এসে হানা দেয়?'

লোকটি বলল, 'তা আর বুঝতে পারছেন না? ও বাড়িতে যারা থাকবে তারাই ওর খপ্পরে পড়বে। পরিবারের লোকের মঙ্গল চান তো ভালোয় ভালোয় কোথাও উঠে যান।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'তুই লোকটাকে কী বললি?'

বিজয় বলল, 'আমি আর কী বলব? কথা শুনে তো আমার হৃৎকম্প হতে লাগল।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'সেই লোকটার চেহারা কেমন?'

বিজয় বলল, 'একটু রোগা, গালচাপা ভাঙা, পরনের কাপড়-জামা আধময়লা।'

মিহির উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'তাহলে এটা নিশ্চয় ভজহরি, বাড়ির দালাল। তোকে ভয় দেখাবার জন্য এসেছিল।'

বিজয় জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ভয় দেখাবে কেন?'

মিহির বলল, 'তোরা বাড়ী ছেড়ে গেলে অন্য ভাড়াটের কাছ থেকে সে সেলামি নেবে। লোকটা ভারি বজ্জাত। ওর কথা বিশ্বাস করিসনি।'

বিজয় বলল, 'বিশ্বাস আমি প্রথমে করিনি। কিন্তু তারপর রাত্রে যা ঘটনা ঘটল তাতে অবিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ তো দেখছি না।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'রাত্রে কী ঘটনা ঘটল আবার?'

বিজয় বলল, 'জানিস বোধহয় আমার ঘুম গাঢ়! কুম্ভকর্ণের নিদ্রাও বলতে পারিস। রাত্রে নাকি ঘরের পিছনের দিকে কী ঘোরাঘুরি করে। তার পায়ের শব্দ শোনা যায়।'

'তুই শুনেছিস?'

'আমি কী করে শুনব? বললাম তো আমার কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।'

'তবে কে শুনেছে?'

'মা শুনেছেন। তিনি নাকি প্রথম দিনও শুনেছিলেন। অত খেয়াল করেননি। কালকে শুনেই চুপি চুপি দরজা খুলে বেরিয়েছিলেন।'

'তারপর? উনি দেখিলেন?'

'না। দেখলেন না। শব্দ থেমে গেল। আবার এসে ঘরে শুলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার শব্দ। আবার বেরিয়ে এসে দেখেন—কিছু নেই। বড়ো রহস্যজনক আর ভয়ের ব্যাপার। মা মনে হয় বেশ ভয় পেয়েছেন।'

'ভজহরি কাল সকালে তোকে যা বলেছিল, সে কথা তোর মাকে বলেছিস নাকি?'

'না, সেকথা বললে তো মা আজই বাড়ি ছাড়বার জন্য পাগল হয়ে যেতেন। এখন কী করি বল তো?'

মিহিরের মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হল না। কী জবাব দেবে সে?

অনেকক্ষণ পর মিহির একটা সাময়িক সমাধান খুঁজে পেল।

বলল, 'আজ আমি তোদের বাড়িতে গিয়ে রাত্রিবেলায় থাকব। নিজে ব্যাপারটা ভালো করে দেখতে চাই। তারপর একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

বিজয় বলল, 'আচ্ছা, তাই হবে। তবে আজ থেকেই অন্য একটা বাড়ির খোঁজ করতে হবে। কারণ, বুঝতেই পারা যাচ্ছে ওই বাড়িতে থাকা চলবে না।'

মিহির বলল, 'কিন্তু জানিস, কলকাতায় বাড়ির কী সমস্যা। মাথা কুটেও বাড়ি পাওয়া যায় না।'

বিজয় বলল, 'হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু তাই বলে ভূতুড়ে বাড়িতে থাকা—'

মিহির বলল, 'দরকার হলে ভূত তাড়িয়ে নিজেরা বাস করব।'

বিজয় আঁতকে উঠে বলল, 'সর্বনাশ! কী যে বলিস।'

'হ্যাঁ, সত্য কথাই বলছি। আজকে তোকে একটা কাজ করতে হবে। দোতলার ঘরটা আরও ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে।'

'কেন? ওই ঘরেই আজ শুবি নাকি?'

'হ্যাঁ, সেই ঘরেই আজ রাত্রে শোব।'

'সর্বনাশ, আমাকেও শুতে হবে।'

'কেন, ভয় পাচ্ছিস বুঝি?'

বিজয় কোনও জবাব দিল না।

মিহির বলল, 'বেশ, আমাকে একা একা ঘরে শুইয়ে রেখে যদি তুই খুশি হোস তবে তাই করিস।'

'না তা নয়, তোকে একা রেখে আমি কি ঘুমোতে পারি? বেশ আমি আজই লোকজন নিয়ে ভালোভাবে ঘরটা পরিষ্কার করব।'

মিহির বলল, 'আচ্ছা এখন যা, সন্ধ্যার পর তো আমি যাচ্ছি।'

বিজয় বলল, 'নিশ্চয় কিন্তু যাবি। মনে থাকে যেন।'

'থাকবে, থাকবে।'

সন্ধ্যার অনেক পরে মিহির বিজয়দের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল। দেরি দেখে বিজয় একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল। ছোটোখাটো নানা ঘটনা ঘটার পর থেকে বিজয় যেন নিজেকে একটু অসহায় বলেই মনে করছে।

মিহিরকে দেখে বিজয় একটু যেন নিশ্চিন্ত হল।

মিহির জিজ্ঞেস করল, ঘরটা পরিষ্কার করে রেখেছিস তো?

'হ্যাঁ।'

কোনও আলোচনাই তারা আর করল না। শুধু বিজয়কে এক সময় বলল, 'তোর টর্চলাইট আছে? একটা বেশ জোরালো টর্চলাইট চাই।'

বিজয় বলল, 'খুব জোরালো নেই, তবে একটা টর্চলাইট আছে।'

মিহির বলল, 'বেশ, তাতেই কোনওরকমে হবে। শোবার সময় আমার বালিশের কাছে রেখে দিবি।'

বিজয় জিজ্ঞেস করল, 'টর্চলাইট দিয়ে ভূতকে ফলো করবি নাকি?'

মিহির জবাব দিল, 'দরকার হলে করব।'

বিজয় বলল, 'সর্বনাশ, ওসবের মধ্যে কিন্তু আমাকে টানবি না।'

মিহির হেসে উঠল। তাকিয়ে দেখলে ঘরে কেউ নেই। তাই বলল, 'এই সাহস নিয়ে ভূতের বাড়িতে বাস করিস?'

বিজয় বলল, 'সত্যি যদি ভূতের বাড়ি হয় তা হলে কিন্তু আমি নাচার। পালাবার পথ পাব না।'

মিহির বলল, 'আমি একাই না হয় ভূতের সঙ্গে লড়ব। আমার সেই সাহস আছে।'

বিজয় এবার মনে একটু ভরসা পেল।

খাওয়াদাওয়ার আগেই মিহির বিজয়কে নিয়ে পরিষ্কার করা ঘরটি দেখে এল।

বিজয় বলল, কী নোংরা যে ঘরটা হয়েছিল তা আর কী বলব। এক মন ধুলো বেরিয়েছে আর বেরিয়েছে শ-খানেক আরশোলা। তা ছাড়া পাখির পালক আর ভাঙাচোরা জিনিস যে কত বেরিয়েছে!'

মিহির বলল, 'এটা দম বন্ধ করা ঘর। কালকেই তা বুঝতে পেরেছি। দরজা-জানালাগুলো খুলে রাখ। আর একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখ ঘরের মধ্যে। তা হলে ঘরের বিচ্ছিরি বোঁটকা গন্ধটা চলে যাবে।'

বিজয় তাই করল।

খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমোবার পালা। নীচের ঘরের তক্তপোশটা কালকেই সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার ওপরেই বিছানা করা হল।

শোবার সময় হতেই যেন বিজয়ের মনটা কেমন করতে লাগল। আজ কী অঘটন ঘটবে কে জানে।

মিহির ব্যঙ্গ করে বলল, 'কী রে, আমাকে কি একাই এই ঘরে ঘুমোতে হবে না, তুইও থাকবি?'

বিজয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'না, একা ঘুমোবি কেন, আমি তো সঙ্গেই আছি।'

'সে কথা মনে থাকে যেন। রাত্রিবেলায় উঠে আবার পালিয়ে যাবি না তো?'

'না হে না, অত ভিতু আর বিশ্বাসঘাতক আমাকে মনে কোরো না।'

দুজনেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিজয় বলল, 'বাতিটা জ্বালানোই থাক, বরং একটু ডিম করে দিই।'

মিহিরের আবার ঘরে আলো থাকলে ঘুম আসে না। তবু সে কোনও আপত্তি করল না। বিজয়ের অবস্থার কথা বিবেচনা করেই সে একটু কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুজনের চোখে কোনও ঘুম নেই, তারপর কখন যে ঘুম এল কেউ হয়তো জানে না।

মিহিরের ঘুম আগে ভাঙল। তার চোখের ঘুম একটু পাতলা। কিন্তু জেগেই দেখল ঘরে আলো নেই। কখন নিভে গেছে কে জানে।

ঘুম ভাঙল তার একটা শব্দ শুনেই।

মনে হল ঘরে যেন কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মিহির পাশে হাত বুলিয়ে দেখল—বিজয় অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার পাশে শুয়ে। তা হলে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে?

মিহির টর্চটা জ্বালল। কিন্তু ঘরে কেউ নেই তো। ঘর ফাঁকা।

তাহলে কীসের শব্দ?

নিশ্চয় সেই অশরীরী প্রেতাত্মা।

টর্চটা নিভিয়ে মিহির আবার শুয়ে পড়ল। বিজয়কে ডাকল না। ডাকলে হয়তো সে ভয় পাবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।

এবার কিন্তু সহজে ঘুম এল না মিহিরের।

সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ সমস্ত পল্লি। একটা রাত-জাগা পাখির ডাকও পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

সময়ের পর সময় যেন নিঃশব্দে পা ফেলে চলতে লাগল।

আবার পায়ের শব্দ—আরও জোরে—আরও কাছে।

মিহির সহসা টর্চটা জ্বালল না। অন্ধকারেই পায়ের শব্দটা অনুমান করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ একটা দড়াম করে শব্দ ঘরের মধ্যে যেন কিছু একটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

মিহির ধড়মড় করে উঠে পড়ল বিছানার ওপর। টর্চটা জ্বালাল। ওদিকে তক্তাপোষের ওপর একটা প্রবল ঝাঁকানিতে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভেঙে উঠে পড়ল বিজয়।

মিহিরের পাশে বসে বিজয় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে রে?'

মিহির টর্চের আলো ঘরের চারদিকে ফেলতে লাগল। তারপর ফেলতে লাগল মেঝের ওপর। কিছুক্ষণ পর তক্তাপোষের কাছেই মেঝের এক জায়গায় টর্চের আলোটা স্থির হয়ে পড়ল।

মিহির বলল, 'ওই দেখ।'

বিজয় কৌতূহলী হয়ে সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘরের চুনবালির আস্তর খসে পড়েছে রে। আর কিছু পড়েনি তো?'

'বোধহয়, না।'

বিজয়ের চোখে ঘুম ছড়িয়ে এসেছিল। বলল, 'এখন আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারি কি?

মিহির বলল, 'হ্যাঁ, তুই আরামে নিদ্রা যেতে পারিস।'

পরদিন ভোরে উঠে মিহির বলল, 'ওপর থেকে চুনবালির ওই বিরাট চাপড়াটা আমাদের গায়েও পড়তে পারত।'

বিজয় বলল, 'পড়তে পারত বই কি! বাড়িটা ভয়ানক পুরোনো। তা ছাড়া এই ঘরটা যেন আরও জরাজীর্ণ।'

মিহির বলল, 'এই ঘরটা তো আর আগে তৈরি হয়নি। বাড়ির সঙ্গেই এক সময়ে তৈরি হয়েছে।'

বিজয় বলল, 'এই ঘরটা সব সময় বন্ধ থাকে কিনা, তাই এই দশা। বাড়িটা একটু রিপেয়ার করে চুনকাম করা দরকার। তারপর একটু থেমে মিহিরকে জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু দেখেছিস নাকি? না ওই শব্দ শুনেই জেগে উঠেছিস?'

মিহির বলল, 'পরে সে কথা বলব। তবে কালকেই গোটা বাড়িটা ভালো করে চুনকাম করে ফেল।'

বিজয় বলল, 'দুটো ঘর তো হোয়াইটওয়াস করাই আছে। শুধু এই ঘরটা আর বারান্দার দিকটা করলেই চলবে।'

মিহির বলল, 'ওটা তো দায়-সারা গোছের হোয়াইট-ওয়াস করা। এ বাড়িতে থাকতে হলে ভালো করে করতে হবে।'

বিজয় বলল, 'যদি থাকি তবে তো? তা না হলে এত খাটুনির দরকার কী?'

মিহির বলল, 'এই বাড়িতেই থাকতে হবে। ভাবনার কিছু নেই। ভূতকে তাড়াতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না।'

বিজয় বলল, 'তা হলে রাজমিস্ত্রিকে খবর দিই। রঙের দোকানে খবর দিলেই লোক চলে আসবে।'

মিহির বলল, 'শুভস্য শীঘ্রং। আজকেই ব্যবস্থা কর।'

বিজয় তখনই বাজার করতে গিয়ে রঙের দোকানে খবর নিয়ে এল। দু-তিন জন রাজমিস্ত্রি তাদের যন্ত্রপাতি ও মালমশলা নিয়ে হাজির হল। ভোরবেলা বিজয় ও মিহির ঘর থেকে বেরোবার সময় দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। রাজমিস্ত্রিরা এসে ঘর খুলল। খুলেই বলল—'এ কী! ঘরটা এমন কেন? ময়লা আবর্জনা আর জঞ্জালে ভরতি!'

রাজমিস্ত্রিদের কথা শুনে বিজয় বলল, 'তোমরা এ কী বলছ? ঘরে জঞ্জাল আসবে কোত্থেকে?'

রাজমিস্ত্রিরা বলল, 'আমরা কি মিথ্যে কথা বলছি বাবু? আপনারা নিজের চোখেই এসে দেখুন না।'

বিজয় আর মিহির তো অবাক। কালকের পরিষ্কার করা ঘর আজকেই এত নোংরা কী করে হল? এক ঘণ্টা আগেও তো পরিষ্কার ছিল।

তবে?

॥ ছয় ॥

অদৃশ্য শক্তি

বিজয় আশ্চর্য হয়ে গেল ঘরের ব্যাপার দেখে। ঘরে কোনও জনপ্রাণী ঢোকেনি, কোনও পাখি ঢুকবার জায়গা নেই, তবু এমন অবস্থা কেন হল? নিশ্চয়ই অদৃশ্য কোনও কিছুর কাণ্ডকারখানা।

মিহির ভেবেছিল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চলে যাবে, কিন্তু তার যাওয়া হল না। ভাবল, আজ অফিস কামাই দিয়ে এখানেই থাকবে। প্রয়োজন হলে রাত্রেও থাকবে এখানে।

তার মনের ভেতর যেসব সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল, সে সম্বন্ধে বিজয়কে সে কিছুই বলল না। রাজমিস্ত্রিদের বলল,—'তোমরা কাজে লেগে যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।'

রাজমিস্ত্রিরা ভেবেছিল চুনকাম করলেই হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখল বালিসিমেন্টের কাজও রয়েছে প্রচুর। তাই বালি সিমেন্টের ফর্দ দিয়ে তারা কাজে লেগে গেল।

বিজয় চলে গেল বালি সিমেন্ট আনতে। রাজমিস্ত্রিরা কর্নিক ও হাতুড়ি দিয়ে ক্ষয়ে-যাওয়া ঘরের দেওয়াল ও ছাদের আস্তরণগুলো খসাতে লাগল।

কুলির মাথায় করে বিজয় সিমেন্ট ও বালি নিয়ে এল বেশ কিছুক্ষণ পরে। মিহির তখন রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখাশোনা করছে।

ঘরটা অন্ধকার। দিনের বেলায়ও বাতি জ্বালবার দরকার হয়। তবু রাজমিস্ত্রি দুজন কাজ করতে লাগল। এরকমভাবে কাজ করা তাদের অভ্যাস আছে।

বিজয় ফিরতেই রাজমিস্ত্রিরা বলল,—'বাবু এত কাজ এক দিনে করা সম্ভব হবে না। অন্তত তিন দিন লাগবে।'

বিজয় বলল—'তিন দিন? এ কী কথা বলছ তোমরা? এতদিন লাগবে কেন?'

রাজমিস্ত্রি বলল—'হ্যাঁ বাবু, যেদিক দিয়ে ধরছি, সেদিক দিয়েই খসে পড়েছে। যদি বলেন তো কাজ ধরি, না হয় এখানেই ক্ষান্ত দিই।'

বিজয় মিহিরকে জিজ্ঞেস করল,—'কী রে, কী করব?'

মিহির বলল,—'কাজ যখন শুরু করেছিস তখন শেষ করেই নে। আধখানা করে লাভ কী?'

রাজমিস্ত্রিরা আবার কাজে লেগে গেল।

দুপুরবেলা মিহিরের আহারের ব্যবস্থা হল বিজয়দের বাড়িতেই। স্নান করে খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করে আবার তারা গেল রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখতে। তখন রাজমিস্ত্রিরা ঘরের উপরের ছাতের দিকটার কাজ অর্ধেকও করে উঠতে পারেনি।

মিহির বলল—'এ কী, তোমরা এতক্ষণে অর্ধেকটাও করতে পারোনি?'

রাজমিস্ত্রিরা বলল—'কী করে করব বাবু, আপনাদের বাড়ির লোকেরাই তো কাজ করতে দেয় না।'

বিজয় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—'কাজ করতে দেয় না মানে? আমাদের বাড়ির কে তোমাদের কাজে বাধা দেয়?'

একজন রাজমিস্ত্রি বলল—'আপনাদের বাড়ির সবাইকে কি আমরা চিনি বাবু? আর কাজ ফেলে এত চোখে চোখে রাখবার সময় কি আমাদের আছে?'

বিজয় এই কথার কোনও অর্থ বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল—'তোমরা কী বলতে চাও ভালো করে বলো।'

রাজমিস্ত্রি বলল—'—বাবু, আমরা বাঁশের আড়ায় বসে কাজ করি। কেউ যদি বারবার ঝাঁকায় তাহলে কি কাজ করা যায়?'

সে কথা শুনে বিজয় এবং মিহির দুজনেই অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল—'কে তোমাদের আড়ায় এসে ধাক্কা মারে? আমাদের বাড়িতে তো সে-রকম ছেলে বা কোনও লোক কেউ নেই।'

রাজমিস্ত্রিরা বলল—'সে কী কথা কর্তা! আমরা তো আপনাদের বাড়ির লোক বলেই কিছু বলিনি। শুধু দু-এক বার ধমক দিয়েছি মাত্র।

বিজয় জিজ্ঞেস করল—'সেই লোককে তোমরা নিজের চোখে দেখেছ?'

রাজমিস্ত্রি বলল—'অত কি তাকিয়ে দেখবার সময় আছে কর্তা! আমরা ধমক দিতেই বা তাকাতেই ছুটে পালিয়ে যায়। শুধু ছায়াটাই দেখেছি।'

সে কথা শুনে বিজয় এবং মিহির দুজনের মনেই রোমাঞ্চ জেগে ওঠে। তারা মনে মনে ভাবতে লাগল অনেক কিছু। কিন্তু রাজমিস্ত্রিদের কিছু বুঝতে না দিয়েই বলল—'বেশ তোমরা কাজ করে যাও, আমরা এখন এখানেই আছি।'

মিস্ত্রিরা কাজ করতে লাগল। বিজয় আর মিহির বসে বসে তাদের কাজ দেখতে লাগল কিন্তু কতক্ষণ একভাবে বসে থাকা যায়! ঝিমুনি এল দুজনেরই।

ঠিক সেই সময়েই ঘটে গেল এক অভাবনীয় ব্যাপার। হুড়মুড় করে শব্দ হল, আর সঙ্গে দুজন রাজমিস্ত্রিই বাঁশের আড়া থেকে পড়ে গেল নীচে।

চোখ মেলে বিজয় আর মিহির দেখল, রাজমিস্ত্রি দুজন মাটিতে পড়ে ছটফট করছে।

কী হল? কী হল? বাড়ির অন্যান্য লোক ছুটে এল। মিহির আর বিজয় দুজনেই হতভম্ব। এমন একটি ব্যাপারে যে কী করে ঘটল তা তাদের কল্পনাতেই আসে না।

রাজমিস্ত্রি দুজন খুব আঘাত পায়নি। চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে ও প্রাথমিক চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলা হল।

বিজয় বলল—'থাক, আজ তোমাদের আর কাজ করতে হবে না। বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করো। কাল সকালে আবার এসো।'

রাজমিস্ত্রি দুজনের শরীর তখনও কাঁপছে। তারা বলল—'না কর্তা, আমরা আর কাজ করতে পারব না। আমাদের মজুরি চুকিয়ে বিদায় করে দিন।'

মিহির জিজ্ঞেস করল—'সে কী, তোমরা কাজ করবে না কেন?'

কাঁদোকাঁদো স্বরে রাজমিস্ত্রিরা বলল—'এমনভাবে কি কাজ করা যায় বাবু? আপনারা ঘরে রয়েছেন তবু আমাদের কেমন করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।'

'ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল? কারা?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মিহির ও বিজয়।

'সে কি আমরা দেখেছি? আপনারা নীচে বসেছিলেন, আপনারাই তো দেখেছেন। এমনভাবে আমরা কাজ করতে পারব না। শেষে একটা খুন-খারাপি হয়ে যাবে। আমাদের পয়সা মিটিয়ে দিন বাবু, আমরা চলে যাই। অন্য লোক এনে কাজ করান।'

কাজ যখন কিছুতেই করবে না তখন আর কীভাবে তাদের রাখা যায়? বিজয় হিসাব করে তাদের মজুরি মিটিয়ে দিল। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—এর পেছনে কী রহস্য আছে? কী রহস্যই বা থাকতে পারে!

মিহির সন্ধ্যার পর নিজের বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যে ঘরে রাজমিস্ত্রিরা কাজকর্ম করছিল সেই ঘর চুনসুরকিতে ভরতি। কাজেই রাত্রে স্থানাভাব ঘটবে, এই

অজুহাতে মিহির বাড়ি চলে যেতে চাইল। বিজয় বলল—'না, আজ রাতটা তুই থেকে যা। মনে হয় আজ অনেক কিছু ব্যাপার ঘটবে।'

মিহির জিজ্ঞেস করল—'কী করে বুঝলে?'

বিজয় বলল—'দিনের বেলাতেই যখন এমন উৎপাত তখন রাতের বেলা যে কী করবে কে জানে। আমার কী মনে হয় জানিস?'

—'কী মনে হয়?'

'মনে হয় ওদের আস্তানায় আমরা হানা দিয়েছি বলেই ওরা খেপে উঠেছে।'

মিহির কোনও জবাব দিল না। চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগল।

বিজয় বলল—'কাজেই আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। এখন যে কোনওরকম আক্রমণ আসতে পারে। আমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

সেদিন রাত্রিটা বিজয়ের খুব ভয়ে ভয়েই কাটল। তার সব সময়েই মনে হতে লাগল, ভূতের আস্তানায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলেই তারা খেপে উঠেছে।

তবু যে ভয় সে করেছিল, সে রকম ভয়ের কিছু ব্যাপার রাত্রিবেলায় ঘটল না।

খুব ভোরেই বিজয়ের ঘুম ভেঙে গেল। তখন বাড়ির ঝি ছাড়া কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি।

ঘুম থেকে ওঠার পরই কিন্তু গা-টা ছম ছম করতে লাগল বিজয়ের। তার কেন জানি মনে হতে লাগল বাড়িতে কী যেন একটা ঘটেছে। প্রথমেই সে গেল সেই ঘরে—যে ঘরে কাল রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছিল।

দরজাটা কাল রাত্রে বন্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু গিয়ে দেখল দরজার দুটি পাটই হাঁ করে খোলা।

বিজয় তা দেখে অবাক হয়ে গেল। ঝিকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কি এই ঘরের দরজা খুলেছ?'

ঝি অবাক হয়ে বলল—'আমি দরজা খুলব কেন? ও ঘরে আমার কি কোনও কাজ আছে?'

বিজয় বিস্মত হয়ে ভাবল, তা হলে এই ঘরের দরজা খুলল কে?

ঘরে ঢুকে বিজয়ের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কাল যে ঘরের উপরের দিকটা বালি ও সিমেন্ট দিয়ে আস্তর করা হয়েছিল আজ তা সব ঝরে পড়ে গেছে। মনে হয় কে যেন খামচিয়ে ওগুলো ফেলে দিয়েছে। এখানে ওখানে এবড়ো-থেবড়ো দাগ।

বিজয়ের মনে কোনও সন্দেহ রইল না। এখানে নিশ্চয়ই অশরীরী প্রেতাত্মার আস্তানা রয়েছে।

নাঃ, এ বাড়িতে কিছুতেই থাকা সম্ভব নয়।

হঠাৎ বুড়ির কথা তার মনে হল। একা এই বাড়িতে কীভাবে সে থাকে? তার কি কোনও ভয়-ডর নেই? বাড়িতে এমন উপদ্রব হয় সে কী করে তা সহ্য করে? তার উপর কি কোনও উপদ্রব হয় না?

বিজয় ঠিক করল, এই সব কথা বুড়িকে গিয়ে জানাবে। তাই সে বুড়ির ঘরের দিকে চলল।

বুড়ির ঘরের দরজাও খোলা। দরজার সামনে পা দিয়েই সে চমকে উঠল। ভাবল চিৎকার করে উঠবে। কিন্তু মুখের ভাষাও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে বুড়ির আড়ষ্ট দেহ।

সে কি মরে গেছে? না তার অন্য কিছু হয়েছে?

বিজয় এসে তার মাকে খবর দিল। মলিনাদেবী খবর শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। সঙ্গে ঝি-ও গেল। গিয়ে দেখলেন অস্বাভাবিক অবস্থায় মাটির উপর পড়ে আছে সেই বুড়ি। দু-চোখ তার খোলা। কটমট করে সে যেন সবার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখলেই ভয় হয়।

॥ সাত ॥

বুড়ির সৎকার

এই আত্মীয়হীনা বৃদ্ধাকে নিয়ে কী করবে তা ভেবে খুবই বিব্রত হয়ে পড়ল বিজয়। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ভজহরি এসে উপস্থিত হল। বিজয় যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ভজহরি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'ভূতেই ওকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।'

সে কথা শুনে সবাই চমকে উঠল। মলিনাদেবী বলে উঠলেন, 'এটা কি ভূতের বাড়ি।'

যে সন্দেহ সবার মনে কয়েকদিন ধরে উঁকিঝুঁকি মারছিল সেটা যেন এক মুহূর্তেই প্রকাশ হয়ে পড়ল।

ঝি 'ও মাগো' বলে সেইখানেই মূর্ছা গেল। তাকে নিয়েই তখন বেধে গেল হুলস্থূল কাণ্ড।

ভজহরি বলল, 'আপনারা কিছু ভাববেন বা বাবু। আমি লোকজন এনে এর সৎকারের ব্যবস্থা করছি।'

ভজহরি চলে গিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই লোকজন জোগাড় করে ফিরে এল।

মিহির কাল চলে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হল। বুড়িকে দেখে ও সব কথা শুনে সে একেবারে হতভম্ব। তারপর যে রাজমিস্ত্রিরা কাজ করেছিল সেই ঘরের অবস্থা দেখে তার মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুট হল না।

ভজহরির লোকজনেরা বুড়িকে বাইরে বের করে নিয়ে এল। ভজহরি তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। তারপর বুড়িকে বেঁধেছেঁদে শ্মশানে নিয়ে গেল। এই ঘটনার পর বাড়ির আবহাওয়টা যেন আরও ভারী হয়ে উঠল।

বিজয় মিহিরকে জিজ্ঞেস করল, কী রে তোর কী মনে হয়?'

মিহির বলল, 'মনে হয় তো অনেক কিছু, কিন্তু ব্যাপারটা খুব ভেবেচিন্তে দেখতে হবে।'
বিজয় বলল, 'ভাবনাচিন্তার আর কিছু নেই, এই বাড়িতে আর থাকা চলবে না।'
এদিকে বাড়ির ঝি কেঁদেকেটে সারা। এই ভূতের বাড়িতে সে আর থাকবে না। সত্যি সে আর রইল না।

বিজয় বলল, দেখলি ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো হয়ে উঠছে শিগগির ব্যবস্থা না করলে আর উপায় নেই। তুই ব্যাপারটার মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছিস না।'

মিহির বলল, 'গুরুত্ব আমি খুবই দিচ্ছি অর্থাৎ এখন দিতে বাধ্য হচ্ছি। তবে আর একটা দিন আমাকে সময় দে। কালকের মধ্যে হেস্তনেস্ত একটা করে ফেলব।'

বিজয় বলল, 'কিন্তু এখন এখানে একটা দিন যে একটা বছর বলে মনে হচ্ছে।'
মিহির বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনও ভাবনা নেই।'

বিজয় বলল, 'আজ কিন্তু তোকে এ বাড়িতে থাকতেই হবে। আমি একা থাকতে আর ভরসা পাচ্ছি না। আজ রাত্রে হয়তো বুড়িই ভূত হয়ে আমাদের গলা টিপে মারতে আসবে।'

মিহির হাসতে হাসতে বলল, 'বেশ আমি থাকব।'

বিজয় একটু আশ্বস্ত হল। বলল, 'আজকের রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটলে বাঁচি। কোনও অঘটন না ঘটলেই হয়।'

সেদিন রাত্রে সত্যি কোনও অঘটন ঘটল না। রাতটা নিরুপদ্রবেই কেটে গেল।

মিহির পরদিন ভোরে উঠে হাসতে হাসতে বলল, 'তোর ভূতেরা টায়ার্ড হয়ে পড়েছে, তাই একটু রেস্ট নিচ্ছে।'

একটু পরেই ভজহরি এসে উপস্থিত হল। মিহির তাকে বলল, 'ওহে ভজহরি, তোমাদের বুড়ি তো অক্কা পেয়েছে। এখন বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করে দাও। ভাড়া কার কাছে দেব?'

ভজহরি বলল, 'আমার কাছে দিলেই হবে বাবু। কোনও গোলমাল হবে না।'

মিহির বলল, 'তা তো বুঝি। কিন্তু বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমাদের অন্য দরকার আছে।'

ভজহরি বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। বাড়িওয়ালার লোক তো কলকাতায় থাকে না। এসেছে কি না খোঁজ নিয়ে আসব। তারপর কাল না হয় দেখা করবেন।'

মিহির বলল, 'বেশ তাই হবে।'

ভজহরি বুড়ির ঘরে কাল তালা লাগিয়ে চাবি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। একটু পরে তালা খুলে ভেতরে গিয়ে অনেকক্ষণ কী যেন কাজকর্ম করল তারপর কয়েকটা পোঁটলা পুঁটুলি নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে চলে গেল।

ভজহরি চলে যাবার পর মিহির বিজয়কে বলল, লোকটা বাস্তুঘুঘু। বুড়ির জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে চলে গেল। তবে ব্যাপারটা বড়োই রহস্যজনক। বুড়ির তিনকুলে কেউ আছে

কি না তাও জানি না।'

বিজয় বলল, 'জেনেই বা কী হবে? আমরা যখন এই বাড়িতে থাকবই না, তখন ওর জাত-গোত্র জেনে লাভ কী?'

মিহির বলল, বাড়িওয়ালার কাছে গেলে বুড়ির অনেক রহস্য জানতে পারা যাবে, এমনকি বাড়ির রহস্যও কিছু বেরিয়ে পড়বে।'

বিজয় বলল, 'তাতে কী লাভ হবে?'

মিহির বলল, 'কয়েকদিনের মধ্যেই এই বাড়ির রহস্য আমি বের করে ফেলব। সেদিক দিয়ে আমি অনেকটা এগিয়েও গিয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ শিগগিরই দেখতে পাবি। মনে মনে আমি সব প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি।'

ভজহরি বড়ো সেয়ানা লোক। সে ভেবেছিল নিজেই ভাড়ার টাকাগুলো আত্মসাৎ করবে। বুড়ি মরে গেছে, এখন ভাবনা কী? তাই বলল, 'বাড়ির মালিককে তো পাওয়া যাবে না।'

কিন্তু মিহির বলল, 'দ্যাখো, বাড়ির মালিকের সঙ্গে আমাদের দেখা না করিয়ে দিলে আমরা বাড়িও ছাড়ব না, ভবিষ্যতে ভাড়াও দেব না।'

ভজহরি দেখল, ভারী তো মুশকিল হল। তাই বলল, 'আচ্ছা চলুন, দেখি যদি পাওয়া যায়।'

মিহির ও বিজয়কে নিয়ে ভজহরি বাড়িওয়ালার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। বাড়িওয়ালা নিঃসন্তান, তাঁর স্ত্রীও মারা গেছেন। তাই তিনি বাইরে থাকেন। তীর্থে তীর্থে ঘোরেন। বাড়িওয়ালার একজন কর্মচারী থাকেন সেই বাড়িতে, নাম রমেন্দ্রনাথ, বয়স পঞ্চাশের ওপরে।

মিহির বলল, 'দেখুন, বাড়িটা ভাড়া নিয়ে আমরা বড়ো অশান্তি ভোগ করছি। কলকাতা শহরে এত বড়ো একটা বাড়ি এমন অবস্থায় পড়ে আছে, আপনারা কোনও ব্যবস্থা করেন না কেন?'

রমেনবাবু বললেন, 'যার করা উচিত তার কোনও গরজ নেই, আমি কেন মিছিমিছি করতে যাব?'

বিজয় বলল, 'ভাড়া দিয়ে বেশ কিছু উপার্জন করাও তো যায়?'

রমেনবাবু বললেন, 'উপার্জন করার স্পৃহা বাড়িওয়ালার নেই। কোনও ভাড়াটে ও-বাড়িতে বেশিদিন থাকতে পারে না। আমি ছ-বছর ধরে দেখাশোনা করছি কিন্তু আমিও বিরক্ত হয়ে পড়েছি।'

মিহির জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বাড়ির ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

রমেনবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা আমার কাছেও রহস্যজনক। কাজেই আমি নিজের

গরজে কিছু করতে চাই না।'

মিহির কিছুক্ষণ কী ভেবে বলল, 'আচ্ছা, যদি অন্য বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আরও কিছুদিন থাকি, তা হলে ভাড়ার বিষয়ে কী ব্যবস্থা করবেন?'

রামবাবু বললেন, 'যতদিন খুশি থাকুন। ভাড়া আপনারা যা খুশি তাই দেবেন। আর এই নিন দোতলার চাবি। সব ঘরই আপনারা ব্যবহার করতে পারেন।'

বিজয় বলল, 'দোতলার চাবি তো আমরা আগেই পেয়ে গেছি।'

রমেনবাবু বললেন, 'না, এই চাবি আপনারা পাননি। এই চাবি শুধু আমার কাছেই আছে।'

—'এটা আবার কোন চাবি?'

—'দোতলার সামনের ঘরে আপনারা ঢুকেছেন, সঙ্গে পার্টিশন করা আর একটা ঘর আছে। ঘরের মাঝখানে দরজাটা দেখেননি?'

—'হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু ওই ঘরের দরকার নেই বলে আমাদের কোনও কৌতূহল জাগেনি।'

চাবিটা বিজয়ের হাতে দিয়ে রমেনবাবু বললেন, 'এই নিন। ঘরটা খুলে ব্যবহার করুন।'

বিজয় বলল, 'ধন্যবাদ।'

কথাবার্তা বলার আগে রমেনবাবু ভজহরিকে চলে যেতে বলেছিলেন। কাজেই সে সবকিছু জানতে পারল না। পথে বেরিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই মিহির ও বিজয়ের সঙ্গে তার দেখা হল।

বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল ভজহরি। তাদের দেখেই এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'কী কথাবার্তা হল বাবু?'

মিহির জবাব দিল, 'কিছু না, তুমি এখন যেতে পারো।'

ভজহরিকে বিদায় দিয়ে তারা নিজেদের পথে চলতে লাগল। মিহির বলল, 'যাক ভালোই হল। এবার আরও বেশি মজা করে বাড়িতে থাকতে পারবে।'

বিজয় জিজ্ঞেস করল, 'মজা আরও বাড়ল কীসে?'

মিহির বলল, 'আর একটা ঘর বাড়ল।'

বিজয় অনেকটা হতাশ হয়ে বলল, 'সে কী? তুমি কি এটাকে মজা মনে করো? এসব ঘর নিয়েই ঝামেলা, তার উপর আর একটা ঘরের উৎপাত!'

মিহির বলল, 'উৎপাত নয় হে, দেখবে লাভই হবে। এ ব্যাপারে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমার এক বন্ধু আছে সুমন্ত তরফদার—বৈজ্ঞানিক এবং ডিটেকটিভ। ভূত নিয়েও সে গবেষণা করছে। তার সঙ্গে আজই আমি দেখা করছি। দেখি সে এর একটা সুরাহা করে দিতে পারে কি না।'

॥ আট ॥

তরফদারের বিস্ময়

সেদিনই মিহির গেল তরফদারের বাড়িতে। সঙ্গে বিজয়ও গেল। তরফদার তখন বাড়ি ছিলেন না। তিনি কী একটা তদন্তের কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বাড়ির সামনের দিকেই তাঁর চেম্বার। সেই চেম্বারে মিহির আর বিজয় অনেকক্ষণ বসে রইল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর এলেন সুমন্ত তরফদার।

মিহিরকে দেখে বললেন, 'কী ব্যাপার মিহির? হঠাৎ আমার খোঁজ পড়ল কেন?'

মিহির জবাব দিল, 'ব্যাপার খুব ভয়ানক। তোমাকেই এর একটা কিনারা করে দিতে হবে।'

তরফদার বললেন, ভয়ানক ব্যাপার। কেন, তুমি কি খুন হয়েছ নাকি?' হেসে উঠলেন তরফদার।

মিহির বলল, 'হাসির কথা নয় হে সুমন্ত। খুন কখনও হইনি, কিন্তু খুন হতে আর বিলম্ব নেই।'

এবার একটু গম্ভীর হলেন সুমন্ত। বললেন, 'আমার কাছে যখন এসেছ তখন বুঝেছি একটা কিছু ঘটেছে। ব্যাপারটা কী বলো তো?'

মিহির সব ব্যাপারটা খুলে বলতে লাগল।

শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেতে লাগলেন সুমন্ত তরফদার। এ যেন তাঁর পরিচিত ঘটনা। কোথায় যেন তিনি শুনেছেন।

সব কথা শোনা শেষ হওয়ার পর তরফদার জিজ্ঞেস করলেন—'এই বাড়িটা কোথায় বলো তো?'

মিহির রাস্তার নামটা বলল। তা শুনে প্রায় যেন লাফিয়ে উঠলেন তরফদার। বললেন—'এই বাড়ির ঘটনা নিয়ে তো বেশ কয়েকমাস আগে আমার কাছে একজন লোক এসেছিল। আমি তো ঘটনাটাকে খুব বেশি আমলই দিইনি।'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা হলে বাড়িটা বিখ্যাত ভূতুড়ে বাড়ি তো! অনেকদিন ধরেই এই সব কাণ্ড-কারখানা চলছে।'

—'কিন্তু বাড়িটা ভূতুড়ে না অন্য কিছু তাতেও সন্দেহ জাগছে। কৌতূহলও হচ্ছে খুব।'

—'সন্দেহ জাগার কারণ কী ঘটল?'

—'সে এখন বলব না। তবে ভূতের গবেষণা নিয়ে মেতে ওঠার ব্যাপারে আমার উৎসাহ আরও এতে বেড়ে গেল!'

—'তবে কি মনে করো ভূতের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনও ব্যাপারও এর সঙ্গে থাকতে পারে?'

—'এখন কিছু তোমাদের সঠিক করে বলতে পারব না। তবে কত পার্সেন্ট ভূত এই ব্যাপারের সঙ্গে আছে তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।'

—'তা হলে সেই ভারটা তুমি নিচ্ছ?'

—'হ্যাঁ, নিচ্ছি।'

—'কবে থেকে?'

—'কালকে থেকেই নিতে পারি। কিন্তু তার আগে বাড়িটা খালি করে দিতে হবে। তা না হলে আমার কাজের পক্ষে অসুবিধা হবে।'

—'তা করে দেব। কাল দুপুরের মধ্যেই বাড়িটা খালি করে দেব। তবে কতদিনের মধ্যে এর একটা সুরাহা হয়ে যাবে মনে করো?'

তরফদার একটু চিন্তা করে বললেন—'তিন-চার দিন তো লাগবেই। তবে একটু এদিক-ওদিক হলেও হতে পারে।'

'বেশ, তাই হবে।'

সব কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল।

এক দিনের মধ্যেই বাড়িটাতে একটা নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। বিজয়ের পরিবারের সকলেই মিহিরের বাড়িতে গিয়ে উঠল।

ওদিকে মিহিরের সেই ডিটেকটিভ বন্ধু সুমন্ত তরফদার তৈরি হলেন ভূতুড়ে বাড়িতে রাত কাটাবার জন্য। বাড়ির সমস্ত চাবি মিহির তাঁকে আগেই দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার একটু পরেই তিনি সেই বাড়িতে চলে এলেন। সঙ্গে তাঁর সাহসী ভৃত্য নিবারণ এবং প্রিয় বুলটেরিয়ার কুকুর—নাম বাঘা। তরফদারের বহুদিনের ইচ্ছা ভুত দেখবেন। ভূত বলে কোনও কিছু আছে কি না তার পরীক্ষা করবেন।

প্রথমে বাড়ির চারদিকটা ঘুরে দেখলেন তরফদার। ঘুরে দেখবার সময় কুকুর বাঘা কী রকম যেন ভাবভঙ্গি করতে লাগল। মনে হল সে কী যেন দেখতে পেয়েছে—কী যেন খুঁজছে এদিকে-ওদিকে! তরফদার তা লক্ষ করে বললেন 'কী রে বাঘা, তুই ভূতের গন্ধ পেয়েছিস বলে মনে হচ্ছে!'

বাঘা চুপচাপ বসে পড়ে লম্বা জিভটা বের করে মাথাটা এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল।

বাড়ির বাইরের দিকটা দেখা হয়ে গেল মোটামুটি, এবার তরফদার ভিতরে ঢুকে ঘরগুলি দেখতে লাগলেন। একতলার ঘরগুলি দেখে নিয়ে একটা ঘরের সোফায় বসে সিগারেট ধরালেন। একটু আয়েস করতে করতে ডাকলেন নিবারণকে।

নিবারণ তখন বাইরে দাঁড়িয়ে বুড়ির ঘরের দিকে তাকিয়ে একমনে কী যেন দেখছিল। তরফদারের ডাকে তার হুঁশ হল। সে বলল, 'আজ্ঞে কর্তা!'

—'এদিকে এসো।'

নিবারণ কাছে এলে তরফদার বললেন, 'নিবারণ, তুমি দোতলার ঘরগুলো ঘুরে দ্যাখো তো। এই নাও চাবি। বাঘাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।'

নিবারণ বাঘাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। পুরোনো ভাঙা সিঁড়ি, তার ওপর নোংরা। প্রথমে কুকুরই উপরে উঠল, পেছনে পেছনে নিবারণ।

দোতলার ঘরের দরজা খুলতেই ভিতর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ হঠাৎ তার নাকে এসে ঢুকল। অস্বাভাবিক ভ্যাপসা গন্ধ। যে কুকুরটা এতক্ষণ ঘরে ঢুকবার জন্য হাঁসফাঁস করছিল, সেও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর নিবারণ ঘরে ঢুকল। বাঘাও ঢুকল সেই সঙ্গে। নিবারণ সামনের দিকের ঘরটা দেখতে লাগল। একটা তক্তাপোশ ছাড়া ঘরে কোনও আসবাবপত্র নেই।

নিবারণ বেশ কিছুক্ষণ আগে উপরে উঠেছে—এখনও ফিরছে না। তরফদার আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ভাবলেন, উপরে উঠবেন। এমন সময় দেখলেন নিবারণ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হে নিবারণ, তুমি চলে এলে যে?'

নিবারণ বলল, 'বাবু ঘরগুলোতে ঢুকলেই গা ছমছম করে। কী অন্ধকার ঘর! আপনার টর্চলাইটটা দিন, নইলে ঘরের জানালা খোলা যাচ্ছে না, ভিতরের ঘরের দরজাটাও খোলা যাচ্ছে না।

এই কথা বলতে না বলতেই দেখা গেল বাঘা সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে ছুটে আসছে। জিভ বের করে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে—হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে।

তরফদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী বাঘা ফিরে আসছে কেন?'

নিবারণ বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।'

বাঘা ছুটে সিঁড়ির নীচে নেমে এল আর কুঁই কুঁই করে শব্দ করতে লাগল।

তরফদার লক্ষ করলেন, বাঘা যেন পালিয়ে যেতে চায়। তাই ভাবলেন, ব্যাপার কী? আদর করে মাথা চাপড়াতে বাঘা কিছুটা শান্ত হল! তরফদার বললেন, 'চলো তো নিবারণ, ওপরটাই একবার ভালো করে দেখি।'

তরফদার নিবারণকে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলেন। বাঘা এবার চলল তাঁদের পেছনে পেছনে। তার মনে যেন কী রকম ভয় ভয় ভাব।

দোতলার যে ঘরটায় ঢুকতে নিবারণের গা ছমছম করছিল, সেই ঘরটার সামনে এসে দুজন দাঁড়াল। নিবারণ বলল, 'একটা শব্দ শুনছেন?'

—'কই? না তো?'

তরফদার শব্দ শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। তারপর টর্চটা জ্বেলে ভেতরের দিকের ঘরটা খুললেন। মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখেছ? ভালো করে লক্ষ করো। তুমি কি একটু আগে এই ঘরে ঢুকেছিলে?'

নিবারণ বলল, 'না বাবু, আমি তো এ ঘরটায় ঢুকিনি।'

তরফদার বললেন, 'তা হলে এরকম কেন? মনে হয় একটু আগে কেউ এই ঘরে ঢুকেছিল। কয়েকটি স্পষ্ট পদচিহ্ন।'

কার পায়ের ছাপ এগুলো? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, তারপর আর একটা। —মোট পাঁচটা। না, তারপর আর নেই। তারপরেই খাড়া দেওয়াল। ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার তো!

তরফদার বললেন, 'প্রত্যেকটাই শিশুর পায়ের ছাপ। তাই নয় কি নিবারণ?'

নিবারণ বলল, 'হ্যাঁ বাবু।'

—'ভালো করে দ্যাখো তো।'

—'হ্যাঁ, ভালো করেই তো দেখছি।'

তরফদার বললেন, 'কিন্তু কোনও শিশু কি এমনভাবে চলতে চলতে দেয়াল বেয়ে কোথাও যেতে পারে? কিছুতেই পারে না তবে?'

নিবারণ বলল, 'ব্যাপারটা তো কিছু বুঝতে পারছি না কর্তা।'

তরফদার বললেন, 'এবার জানালাগুলো খুলে ঘর দুটি ভালো করে দেখা যাক।'

নিবারণ জানালাগুলো খুলতে চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ তরফদার দেখলেন বাঘা নেই। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাঘা গেল কোথায়?'

নিবারণ বলল, 'কই, ওকে দেখছি না তো?'

ঘরে চেয়ার, টেবিল, আয়না অনেক কিছু আছে। মনে হয় অনেক কাল আগে এগুলো কেউ ব্যবহার করত, এখন আর করে না। তরফদার একটা চোয়ারে বসবার জন্য এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ভয়ংকর ধুলো। তাই মনে হয় বহুদিন কেউ এই চেয়ারে বসেনি। বললেন, 'নিবারণ, চেয়ারটা একটু ঝেড়ে দাও তো, বসব।'

নিবারণ চেয়ারের ধুলো ঝাড়বার জন্য এগিয়ে গেল। নিবারণ জানালা খুলতে পারছিল না বলে তরফদার নিজেই গেলেন খুলবার জন্য। অনেকদিন খোলা হয়নি বলে ভয়ানক আঁট হয়ে গিয়েছে। জানালা খুলবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'নিবারণ চেয়ারটা দরজার সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও তো।'

কিন্তু নিবারণ চেয়ারখানা নিয়ে যেতে যেতে কেবলই পিছন দিকে ফিরতে লাগল। কেউ যেন তাকে পেছন দিকে ধীরে ধীরে ঠেলছে। তাই সে বলল, 'কর্তা' আমার পিঠে হাত দিচ্ছে কে?'

তরফদার সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ভেবে পেলেন না, কেন নিবারণ ওরকম কথা বলছে। সেই মুহূর্তেই নিবারণ বেশ চড়া গলায় বলে উঠল, 'এ কী কর্তা আমাকে চড় মারলে কেন?'

তরফদার বলতে গেলেন, 'চড়! আমি তোমাকে চড় মারব কেন?' কিন্তু তিনি কথাটা বলবার আগেই ওদিকে নিবারণ চেয়ারখানা নিয়ে উলটে পড়ে গেল। মনে হয় কে যেন

তাকে ঠেলে ফেলে দিল। নিবারণ কোনও রকমে উঠে নিজেকে সামলে নিয়ে তরফদারকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার পিঠের ওপর আপনি এমন করে এত জোরে ধাক্কা মারলেন কেন কর্তা?'

তরফদার অবাক হয়ে জবাব দিলেন, 'আমি তোমাকে কেন ধাক্কা মারতে যাব? তুমি বিশ্বাস করো আমি ধাক্কা মারিনি।'

—'আপনি ধাক্কা মারেননি?'

—'না।'

নিবারণ প্রথমে সত্যি বিশ্বাস করেনি। এবার সে বিশ্বাস করল। কিন্তু অবাকও যেমন হল, ভয়ও তেমনি পেল। সে আমতা আমতা করে বলল, 'তবে কে ধাক্কা মারলে?'

এমন সময় বাঘার ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা গেল। তরফদার বললেন, 'নিবারণ, বাঘা ডাকছে।'

নিবারণ ঘর থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'বাঘা, বাঘা, এই যে আমরা এখানে।'

নিবারণ ভেবেছিল ডাক শুনলেই কুকুরটা তাদের কাছে ছুটে আসবে। কিন্তু তা হল না। বাঘাটা ছুটে পালাতে লাগল। নিবারণ তাকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেল তাও পারল না। তার কেমন যেন খটকা লাগল। সে-ও পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে বলল, 'কর্তা, আসুন আমরা নীচে উঠোনের দিকে যাই।'

তরফদার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনিও সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের দিকে যেতে লাগলেন। মুখে বললেন, 'নিবারণ আমি আসছি।'

বাঘা এসে বাড়ির একটা পাঁচিলের কাছে থামল। নিবারণ আগেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল, তরফদারও সেখানে এসে থামলেন। একটা আশ্চর্য ব্যাপার তাঁরা দেখলেন, সেখানেও সেই শিশুর পায়ের ছাপ।

বাঘাটা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে লাফাবার উদ্যোগ করছিল। নিবারণ আদর করে বারকয়েক মাথা চাপড়ে দিতেই যেন বাঘা অনেকটা শান্ত হল। আগে বাঘার এরকম অবস্থা কখনও হয়নি।

তরফদার বললেন, 'নিবারণ, আমরা আজ রাত্রে উপরের ওই ঘরেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা করব। তুমি ওই ঘরটা একটু পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করো।'

নিবারণ বলল, 'কোন ঘরে কর্তা? যে ঘরে আমাকে চেয়ার শুদ্ধ ফেলে দিয়েছিল!'

তরফদার বললেন, 'হ্যাঁ'

নিবারণ বলল, 'সর্বনাশ! ও ঘরে রাত কাটানোর চেয়ে বিষ খাওয়া ভালো। আমি পারব না কর্তা।'

তরফদার বললেন, 'ভয় নেই আমি তো আছি। বোধহয় কোনও জাদুকর ভোজবাজির

খেলা দেখিয়ে আমাদের অবাক করে দিতে চায়। ভেল্কিটা যে কী ধরতে পারছি না বটে, কিন্তু আজ রাত ফুরবার আগেই তাকে আমরা ধরে ফেলবই ফেলব।'

॥ নয় ॥

রাতের ঘটনা

দুজনেই ক্লান্ত।

এবার শোবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিছানাপত্র সব সঙ্গেই ছিল। ভিতরের ঘরখানায় ছিল একটি সেকেলে পালঙ্ক। ঝাড়ামোছা করে তার উপর বিছানা পাতা হল। সেখানে হল নিবারণের শোবার ব্যবস্থা। সামনের ঘরে তরফদারের বিছানা করা হল। দু-ঘরের মাঝখানে একটি দরজা। সেই দরজাটা খুলে দেওয়া হল।

ঘুমঘুম ভাব থাকলেও ঘুম অবশ্য কারুর চোখেই এল না। কেটে গেল অনেকক্ষণ। দুজনের মনেই কী রকম যেন একটা অস্বস্তিভাব।

এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

হঠাৎ ঘরের ভেতর আবির্ভূত হল মস্ত একটা বিবর্ণ আলোক। একটা মনুষ্যমূর্তির মতোই কিন্তু গঠনহীন ও অবাস্তব। দুই ঘরের মাঝখানে সেই মূর্তিটা নড়ে-চড়ে উঠল এবং তারপর ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে।

তরফদার ডাকলেন, 'নিবারণ'!

নিবারণ সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিল, 'কর্তা?'

'উঠে পড়ো।'

'হ্যাঁ, উঠেছি কর্তা।'

'কিছু দেখতে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

তরফদার বললেন, 'ওই জিনিসটাকে লক্ষ্য করে আমাদের চলতে হবে।'

ভয়ার্তকণ্ঠে বলল নিবারণ, 'ওই আলোকটাকে?'

তরফদার বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো দেরি করার সময় নেই।'

নিবারণ বললে, 'এই রাত্রিবেলা অন্ধকারের মধ্যে?'

তরফদার বললেন, 'হ্যাঁ, ওই অন্ধকারের মধ্যেই চলতে হবে। টর্চ তো রয়েছে ভয় কী?'

দুজনেই এগিয়ে চলল। তরফদারের এক হাতে টর্চ, আর এক হাতে রিভলভার।

নিবারণের হাতে একটি কাঠের ডাণ্ডা। এই বাড়ির ভেতরেই সে কাঠের ডান্ডাটি খুঁজে পেয়েছিল। তাই লাঠির বদলে ওটাই হয়েছিল তার সম্বল।

ওই বিবর্ণ আলোছায়াটি নীচে গিয়ে প্রবেশ করল একটি ঘরের ভিতরে, তারপর একটি বিছানার উপরে গিয়ে উঠল। ওই আলোছায়াটি ক্রমশ ছোটো হতে লাগল, তারপর একটি ছোটো বিন্দুতে পরিণত হল। এক মুহূর্ত সেখানে স্থির হয়েই কাঁপতে কাঁপতে একেবারে নিভে গেল সেই অদ্ভুত আলোকবিন্দু।

বাঘার কথা এতক্ষণ কারুর মনে ছিল না। তাদের পেছনে পেছনে থেকেও বাঘা কোন ফাঁকে খাটের তলায় লুকিয়েছিল তা কেউ দেখতে পায়নি। লক্ষ পড়ল যখন সে বেরিয়ে এল।

এবার বাঘা বাইরে বেরিয়ে চলল অন্য ঘরের দিকে।

তরফদার বললেন, 'নিবারণ চলো আমরা বাঘার পেছনে পেছনে যাই।'

দুজনে তাই করলেন।

তাঁরা দেখলেন, একটা বন্ধ ঘরের সামনে এসে বাঘা দাঁড়াল। সেটা বুড়ির ঘর। ঘরটা তালা বন্ধ। বাঘা সেই ঘরে ঢোকবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

তরফদার বললেন, 'এই ঘরটাতে ঢোকবার জন্য বাঘার এত চেষ্টা কেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনও রহস্য রয়েছে। তালা ভেঙে ঘরটা খুলতে হবে।'

নিবারণ বলল, 'তালাটা ভাঙতে হয়তো একটু কষ্ট হবে। কিন্তু দরজাটা ভারী পুরানো ওটাকে সহজেই ভাঙা যাবে।'

সামনে বড়ো বড়ো ইট ও পাথর পড়ে ছিল। নিবারণ সেগুলির সাহায্যে ঠোকাঠুকি করতেই দরজাটা খুলে গেল। পরপর দুটি ঘর। পেছনের ঘরের দরজাটা খুলতে খুব অসুবিধা হল না। সেই ঘরে ঢুকে বাঘা দেওয়াল-আলমারিটার কাছে গিয়ে তার বন্ধ দরজাটা বারবার আঁচড়াতে লাগল।

তরফদার বললেন, 'বাঘার ভাবগতি দেখে আমার মনেও সন্দেহ হচ্ছে। নিশ্চয়ই কোনও ব্যাপার আছে এর ভেতর। আমাদের তা দেখতে হবে।'

আলমারিটার দরজা খুব দামি। কিন্তু বিনা যত্নে ও অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইটের কয়েকটা ঘা মেরে ওটাকে খোলা হল।

আলমারিটা খুলে পাওয়া গেল পুরোনো বিবর্ণ একটা রুমাল। আর একটা খোপে রয়েছে মেয়েদের ব্যবহার্য কিছু পোশাক-পরিচ্ছদের অংশ এবং বিবর্ণ হলদে ফিতে দিয়ে বাঁধা দু-খানা খামে ভরা চিঠি।

তরফদারের কৌতূহল তাতে উগ্র হয়ে উঠল। চিঠি দু-খানা তিনি হাতে নিলেন।

হঠাৎ যেন মনে হল কারও পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অদৃশ্য লোকের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। খুব জোর নয়, অস্পষ্ট। নিবারণের মনে ভয় জাগল, তরফদারের মনে জাগল কৌতূহল।

নিবারণ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চিঠি দু-খানা রয়েছে তরফদারের হাতে। তিনি ঘর থেকে বাইরে পা দিতেই বাঘা ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

তরফদার বললেন, 'কী রে বাঘা, তোর আবার কী হল?'

কিন্তু বলতে না বলতেই এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। কে যেন তরফদারের কবজি চেপে ধরে তার হাত থেকে চিঠি দু-খানা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে। অবশ্য সেই হাতের স্পর্শ খুব কঠিন নয়। তরফদার আরও জোর করে চিঠি দু-খানা চেপে ধরলেন। বাঘা ঘেউ ঘেউ করে উঠল আরও জোরে। তারপর আর সেই অশরীরী আত্মার কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

আবার তরফদার নিজের নির্দিষ্ট ঘরে দোতলায় ফিরে গেলেন। যাবার আগে নীচতলার ঘরে একটি টেবিল ল্যাম্প দেখতে পেয়ে নিবারণকে বললেন, 'নিবারণ, এই টেবিল ল্যাম্পটা উপরে নিয়ে এসো তো।

নিবারণ টেবিল ল্যাম্পটা হাতে তুলে নিল।

দোতলায় গিয়ে তরফদার বললেন, 'নিবারণ, ল্যাম্পটা জ্বালাও।'

নিবারণ ল্যাম্পটা জ্বালালে তরফদার টেবিলের উপর চিঠি দু-টি রাখলেন, রিভলবারটা রাখলেন তার পাশে। বসে একটু সুস্থির হয়ে বললেন, 'নিবারণ, তুমি কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, ওটা যেন এক কোণে বসে ঠকঠক করে কাঁপছে।'

নিবারণ কুকুরটার দিকে এগিয়ে গেল।

তরফদারের মন রয়েছে চিঠি দু-খানির দিকে। একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের ধারে বসে একমনে চিঠি পড়তে লাগলেন।

চিঠি দু-খানিতে খুব বেশি কথা লেখা নেই। তারিখ দেখে বোঝা গেল ঠিক ছত্রিশ বছর আগেকার লেখা। স্ত্রীকে সম্বোধন করে চিঠি দু-খানা লিখছে কোনও ভদ্রলোক। লেখার ধরন দেখলেই বোঝা যায়, পত্রলেখক রীতিমতো শিক্ষিত। কিন্তু জায়গায় জায়গায় কথাগুলো অস্পষ্ট। তাতে পাওয়া যায় যেন কোনও গুপ্ত অপরাধের ইঙ্গিত। ইঙ্গিতগুলিও রহস্যপূর্ণ।

তরফদার খুব সন্দিগ্ধভাবেই পড়তে লাগলেন চিঠিগুলি...

(১) 'খুব সাবধান, জানাজানি হয়ে গেলে সবাই আমাদের অভিশাপ দেবে।'

(২) 'রাত্রে ঘরের ভেতর আর কোনও লোক নিয়ে শুয়ো না। তোমার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলার বদ অভ্যাস আছে।'

(৩) 'যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আমাদের ভয় কী, আমাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। মরা মানুষ আর বাঁচে না।'

—এইখানে মেয়েলি হাতে ব্র্যাকেটের ভেতর লেখা (হ্যাঁ, মরাও আবার বেঁচে ওঠে)।

অদ্ভুত হেঁয়ালিপূর্ণ চিঠি।

অথচ অনেক রহস্য, অনেক চক্রান্ত যেন লুকিয়ে রয়েছে লেখাগুলির ভেতর।

চিঠি দু-খানা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে তরফদার মনে মনে কথাগুলির মর্মার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

তখন রাত হয়েছে অনেক। চারিদিক নিস্তব্ধ।

চিঠি দু-খানা টেবিলের উপর রেখে তরফদার টেবিল ল্যাম্পটা একটু ডিম করে দিলেন। নিবারণকে বললেন, 'নিবারণ, তুমি সামনের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ো মাঝখানের দরজা খোলাই থাক।'

শুয়ে শুয়েও তরফদার চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। ঘুম যেন চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে। কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে খাটের তলায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটতে লাগল।

রাত তখন ক-টা কে জানে?

হঠাৎ মনে হল, সাঁ করে যেন একটা দমকা কনকনে হাওয়া গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল। খট করে যেন শব্দ হল একটা।

চমকে উঠলেন তরফদার। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল নাকি? তরফদার মাথা তুলে দেখলেন—না, যেমন খোলা ছিল তেমনি খোলাই আছে।

টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন বাতিটা তেমনি নিবু নিবু ভাবে জ্বলছে। কোথাও কেউ নেই। অথচ কী আশ্চর্য, টেবিলের উপর থেকে হাতঘড়িটা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে, একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সর্বনাশ, এবার রিভালভারটা উধাও হবে না তো?

তরফদার বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। চট করে টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলেন রিভলভারটা।

ঠিক সেই সময়ে দুটি ঘরের মাঝখানে কীসের যেন একটা শব্দ হল। যেন মেঝের উপর কিছু ঠোকার শব্দ হল। ঠক—ঠক—ঠক। ঠক—ঠক—ঠক, ঠক—ঠক—ঠক।

—পর পর তিনবার।

পাশের ঘর থেকে নিবারণ জিজ্ঞেস করল, 'ও শব্দ কি আপনিই করছেন কর্তা?'

তরফদার জবাব দিলেন, 'না, আমি করছি না।'

—'তবে কে এমন শব্দ করলে?'

তরফদার ভাবলেন, ঘরে কেউ ঢোকেনি তো? তিনি নিবু নিবু বাতিটা বাড়িয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি যেন তাঁর গায়ে লাগল। বাড়াতে গিয়ে উলটে বাতিটা কমে গিয়ে একেবারে নিভেই গেল।

টর্চলাইটটা খুঁজতে লাগলেন এবার। অন্ধকারে টেবিলের উপর হাতড়িয়ে তবে সেটা খুঁজে পেলেন। টর্চের আলো ফেললেন ঘরের মেঝের উপর এদিকে-ওদিকে।

কই, কোনও লোক নেই তো?

দেখা গেল কুকুরটা জেগে উঠে মেজের উপর চলে এসেছে। তার সর্বাঙ্গের লোম যেন খাড়া হয়ে হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিও তেমনি হিংস্র।

তরফদার বললেন, 'কী রে বাঘা, তোর হল কী? এমন করছিস কেন?'

বাঘা কিছু না বলে শুধু এদিক-ওদিক মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

তরফদার টর্চের আলোতে দেখলেন, ঘরের দরজা তেমনি ভেতর থেকে বন্ধ আছে। ঘরে কেউ ঢুকলে দরজা খোলা থাকত।

বাঘা কুকুরটাও ঘরের মাঝখানে তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঘেউ ঘেউ করছে না, ছোটাছুটিও করছে না। তার দৃষ্টিটা যেন বার বার গিয়ে পড়ছে ঘরের জানালাটার দিকে। জানালাটা খোলা।

কিন্তু কোনও লোক কি ওই জানালা দিয়ে ঢুকতে পারে? কী করে ঢুকবে?

তরফদার বললেন, 'নিবারণ, তুমি টেবিল ল্যাম্পটা আবার জ্বালাও।'

নিবারণ জেগে বিছানার উপর চুপচাপ বসেছিল। সে এবার সন্তর্পণে এগিয়ে এল। বলল, 'কর্তা, দেশলাইটা কোথায়?'

তরফদার পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে দিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নিবারণ টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালতে পারল না। দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বলেই নিভে যায়। হঠাৎ যেন কোনদিক দিয়ে ছুটে আসে দমকা হাওয়া।

তরফদার এগিয়ে যেতে লাগলেন জানালার দিকে। নিবারণের সঙ্গে তাঁর গায়ের ধাক্কা লাগল। তাতে ঘটে গেল আর এক বিভ্রাট। নিবারণ সেই সময়ে টেবিল ল্যাম্পের চিমনিটা সামলাতে গিয়েছিল, হঠাৎ হাত লেগে চিমনিটা ভেঙে গেল।

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল?'

নিবারণ জবাব দিল, 'চিমনিটা ভেঙে গেল কর্তা।'

—'যাক, তা হলে আর জ্বালাতে হবে না।'

হঠাৎ নিবারণের যেন কী হল। সে অন্ধকারের মধ্যেই খুলে ফেলল ঘরের দরজাটা তারপর বলল, 'কর্তা, পালান, পালান। আমাকে সে ধরতে আসছে।' বলে মুহূর্তের মধ্যে সে বাইরে চলে গেল।

তরফদার চেঁচিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও নিবারণ, দাঁড়াও, দাঁড়াও।'

কিন্তু সে তরফদারের কথা শুনল না। বেগে সিঁড়ি দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। শোনা গেল বাইরের সদর দরজা খোলার শব্দ। তারপর সব চুপচাপ।

ভূতুড়ে বাড়িতে তরফদার একা।

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি, নিবারণ ভিতু মানুষ হয়েও কেমন করে একা বাইরে চলে গেল? তা হলে কি বাড়ির ভিতরের ভয়টা বাইরের ভয়ের চেয়েও বেশি?

এখন এই নির্জন বাড়িতে বাঘা কুকুরটা ছাড়া তাঁর আর কোনও সঙ্গী নেই।

কিন্তু এ কী! কুকুরটা কী রকম শব্দ করছে যেন! ঘরের ভিতর আবার সেই ঠক ঠক শব্দ।

তরফদার টর্চের আলোটা বাঘার উপরে ফেললেন। এ কী দেখছেন তিনি? দুঃস্বপ্ন নয় তো?

একটা ছায়ামূর্তি কুকুরটাকে গলা টিপে ধরেছে। তার হাত দুটোই শুধু একটু একটু বোঝা যাচ্ছে যেন—মূর্তিটাকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না।

কুকুরটা বাঁচবার জন্য ছটফট করছে। অথচ চিৎকার করার উপায় নেই। মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে এক অস্বাভাবিক শব্দ।

তরফদার আর সহ্য করতে পারলেন না। ওই ছায়ামূর্তিটাকে লক্ষ্য করে রিভলভারের গুলি ছুড়লেন।

গ্রুম!

হঠাৎ যেন ঘরের ভেতর একটা তোলপাড় হল। কী হল তিনি নিজেও বুঝতে পারলেন না।

ছায়ামূর্তিটা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে নানাদিকে। তাঁর উপরও বুঝি এসে পড়বে। কোনও বুদ্ধি ঠিক করতে না পেরে তরফদার আবার রিভলভারের গুলি ছুড়লেন।

গ্রুম—গ্রুম—

এবার তাঁর লক্ষ্য হয়তো স্থির ছিল না, তাই একটা গুলি লাগল বাঘার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তির গায়েও হয়তো লাগল।

বাঘা রক্তাক্ত দেহে ছিটকে পড়ল মেঝের উপর।

এবার তরফদার বাঘার গায়ের উপর টর্চের আলো ফেলে দেখলেন, বাঘা নির্জীব হয়ে পড়ে আছে, তার দেহে প্রাণ নেই।

কিন্তু সেজন্য দুঃখ করার সময় এখন নেই।

এবার ছায়ামূর্তির সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

সেজন্য প্রস্তুত হলেন তরফদার। আজ তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এসপার-ওসপার একটা কিছু করতেই হবে।

কিন্তু কোথায় ছায়ামূর্তি?

সারা ঘরটা যেন ধোঁয়ার মতো কী একটা জিনিসে ভরে উঠতে লাগল। তরফদার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এভাবে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। এবার টেবিলের ধারে এসে চেয়ারের উপর বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলেন ঘরের ভেতর যেন জানালা দিয়ে একটু একটু চাঁদের আলো ঢুকছে। আজ কী তিথি তা তিনি জানেন না। তবু বুঝলেন, আকাশে চাঁদ উঠছে।

এবার চোখের সামনে যা দেখলেন তা অতি আশ্চর্য।

ঘরের ভেতর থেকেই আত্মপ্রকাশ করছে একটা বিরাট অন্ধকার। কিন্তু ওটা কী?

ক্রমে ক্রমে ওটা বেশি কালো হয়ে উঠছে। কী বীভৎস। কী ভয়ংকর! ওই অন্ধকার মূর্তির নিম্নার্ধ আছে কক্ষতলে, কিন্তু উপরার্ধ প্রায় স্পর্শ করছে ছাদের কড়িকাঠ।

তরফদার চেয়ার ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। যেন মহাভার কোনও শক্তি তাঁকে চেপে আছে। আর খুব উঁচু থেকে তাকে যেন লক্ষ করছে ভাঁটার মতো দুটো চক্ষু।

হঠাৎ তরফদারের মনে পড়ল টেবিলের উপর চিঠি দুটো রয়েছে। সেই চিঠি দুটো হস্তগত করা দরকার। তাই এবার টর্চের আলো ফেললেন টেবিলের উপর।

ওই তো, চিঠি দুটো টেবিলের উপর রয়েছে। তরফদার তা নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু পারলেন না। কে যেন হাত বাড়িয়ে চিঠি দুটো তুলে নিল।

ছায়ার মতো দুটো হাত। দু-হাতে দুটি চিঠি চোখের পলকে তুলে নিয়ে গেল অদৃশ্য কোনও মানুষ। লোকটিকে বাইরে যেতে দেখলেন না, কিন্তু চিঠি দুটিও আর দেখা গেল না।

একটু পরেই আবার শোনা গেল সেই শব্দ ঠক—ঠক—ঠক, ঠক—ঠক—ঠক।

কী আশ্চর্য!

শব্দ লক্ষ্য করে তরফদার সেদিকে টর্চের আলো ফেললেন। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না।

এমন সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়ির দিকে। তরফদার ভাবলেন, বুঝি নিবারণ ফিরে এল। তাঁর মনে সাহস ফিরে এল একটু। তিনি ডাকলেন, 'নিবারুণ! নিবারুণ!'

কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। নিবারণ এলে নিশ্চয়ই সাড়া দিত।

তা হলে? তার কী হল?

কার পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়ির উপর!

কোনও লোক এলে নিশ্চয়ই তার দেখা পাওয়া যেত!

তরফদার ভাবলেন, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখবেন কেউ আসছে কি না। কিন্তু একটু নড়বার শক্তিও যেন তাঁর নেই।

কী এক অজানা ভয়, অদৃশ্য শক্তি আর প্রবল অনিচ্ছা তাঁকে পাষাণের মতো নিথর করে দিয়েছে।

ভয়ানক দমে গেলেন তরফদার। তাঁর সঙ্গী ছিল দুজন, এই সংকট সময়ে একজনও কাছে নেই। একজন মৃত—একজন অতি আশ্চর্য ভাবে উধাও।

নিবারণকে সাহসী বলেই তরফদার জানতেন। কিন্তু এমনভাবে সে চলে গেল, সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার।

রহস্যজনকও বটে।

প্রভুকে এমনভাবে একলা ফেলে পালিয়ে যাবার মানুষ তো সে নয়।

তা হলে? তার কী হল?

অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে কেমন যেন হয়ে গেলেন তরফদার।

এমন সময় একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

॥ দশ ॥

বিভীষিকা

তরফদার যেখানে বসেছিলেন তার কাছাকাছি আর একটা খালি চেয়ার ছিল। সেই চেয়ারটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল। দৃশ্যমান কেউ তাকে নিয়ে গেল না, কিন্তু সে নিজে নিজেই হড় হড় শব্দে এগিয়ে টেবিলের ওপাশে গিয়ে নিতান্ত জড়ের মতোই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ সেই চেয়ারের উপর মূর্তিধারণ করল এক নারী। জীবন্ত আকৃতি নয়, মৃতবৎ পাংশুবর্ণ। কিন্তু সে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে।

কী তার উদ্দেশ্য কে জানে?

সে কি কাউকে দেখতে চায়?

এমন সময় আবার যা ঘটল তা আরও অদ্ভুত।

দরজার সামনেই আবির্ভূত হল এক পুরুষ মূর্তি। যুবক। কিন্তু মরার মতো পাংশুবর্ণ। ছায়ার উপরার্ধে জ্বলে জ্বলে উঠছে দুটো চক্ষু এবং তার দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে সোফায় বসা সেই নারীমূর্তির দিকে।

তরফদার দেখলেন, ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কে দরজা বন্ধ করছে তা বোঝা গেল না। নারীমূর্তিটিও ঠিক সেই সময়ে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল।

তরফদার বন্ধ দরজার উপর টর্চের আলো ফেললেন। দেখলেন, দরজাটা আঁটসাঁট ভাবে বন্ধ। কেউ যেন ভিতর থেকে ঠেলে অথবা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়েছে।

কে সে? কোথায় সে লোক?

আর সহ্য করতে পারলেন না তরফদার। একটা জীবন্ত মানুষের পক্ষে এ ব্যাপার সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব। সমস্ত গা তাঁর ছমছম করছে। চিৎকার করে তিনি বললেন, 'কে দরজা বন্ধ করছ? তাড়াতাড়ি খোলো দরজা।'

কিন্তু দরজা খুলল না।

পুরুষমূর্তি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল নারীমূর্তির দিকে। নারীমূর্তি চঞ্চল হয়ে উঠে

দাঁড়াল। সে যেন ভয় পেয়েছে। পুরুষটির হাতে দেখা গেল একটি ছোরা। সেই ছোরা নিয়ে সে আক্রমণ করতে গেল মেয়েটিকে। মেয়েটি চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠল।

মুখের ভঙ্গিতে বোঝা গেল সে চিৎকার করছে। কিন্তু সেই চিৎকারের শব্দ শোনা গেল না। এ যেন নির্বাক চলন্ত ছায়াচিত্র। লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির উপরে। ছোরা দিয়ে তাকে আঘাত করল। ধস্তাধস্তি শুরু হল দুজনের মধ্যে।

তরফদার কী করবেন, কিছু স্থির করতে পারলেন না। গুলি করবেন কি? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, তার পরিণাম কী হবে কে জানে? তাঁর নিজের কী সম্পর্ক আছে এই ঘটনার সঙ্গে? কাজেই যতক্ষণ নিজের উপর কোনও আঘাত না আসবে ততক্ষণ নীরব দর্শক হয়ে থাকাই উচিত; কিন্তু যা অবস্থা ঘটছে তা খুবই ভয়াবহ। হয়তো পুরুষটি নারীটিকে খুন করেই ফেলবে।

নারীর কপাল দিয়ে রক্তের ধারা বইছে। সে আর আঘাত সহ্য করতে পারছে না। এবার সে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল।

এমন সময় দেখা গেল সেই কালো ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে আসছে সেদিকে। সেই ছায়ামূর্তিটা বুঝি একটা বাধা সৃষ্টি করার জন্যই তাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

অকস্মাৎ তাদের প্রত্যেকেই ঢাকা পড়ে গেল নিবিড় এক অন্ধকারের ঘেরাটোপের মধ্যে। তারপর জ্বলে উঠল আবার একটা বিবর্ণ আলো এবং দেখা গেল দুই ভূতুড়ে নর-নারী মূর্তি যেন সেই অতিকায় ছায়ামূর্তির কবলগত।

আবার জ্বলে জ্বলে উঠল ছোট্ট ছোট্ট আলোর ফানুসগুলো! আবার তারা ব্যস্তভাবে আনাগোনা ও ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক-ওদিক, উপরে-নীচে সর্বত্র। তারা হয়ে উঠল আরও বেশি পুঞ্জীভূত, তাদের গতি যেন আরও বেশি বন্য ও দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা।

সুমন্ত তরফদার বুঝতে পারলেন না কী ব্যাপার ঘটছে।

সব যেন এলোমেলো—বীভৎস—ভয়ংকর!

ছায়াছবির মতো যেন ব্যাপার ঘটছে।

মূর্তি ধারণ করল এক বৃদ্ধা নারী—আর দেখা গেল টেবিলের উপর থেকে যা অদৃশ্য হয়েছিল, সেই চিঠি দু-খানা তার হাতে রয়েছে। তার পরেই নারীমূর্তির পায়ের তলায় মেঝের উপরে আর এক দৃশ্য জেগে উঠল। একটা ছন্নছাড়া অপরিচ্ছন্ন শিশুমূর্তি হুমড়ি খেয়ে রয়েছে—তার মুখে-চোখে কেমন এক আতঙ্কের আভাস। তরফদার নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলেন, বৃদ্ধার মুখের উপর থেকে ধীরে ধীরে জরার চিহ্ন মুছে গিয়ে যৌবনের লালিত্য ফুটে উঠেছে। তারপর এগিয়ে এল সেই কালো ছায়া, তার নিরেট কালিমার মধ্যে সবকিছু অবলুপ্ত হয়ে গেল।

ঘরের ভেতর তখন শুধু ক্ষুদ্র লৌকিক জীব সুমন্ত তরফদার, আর সেই বিপুল অলৌকিক ছায়ামূর্তি। আবার দেখা দিল কেউটের মতো দুটো উৎকট চক্ষু। আলোর বুদবুদগুলো আবার

অনিয়মিত, এলোমেলো গতিতে উঠছে, নামছে, ছটোছুটি করছে, ঘরের ভেতর এসে পড়া চন্দ্রকিরণের সঙ্গে করছে মেলামেশা।...

ঘরের অন্ধকার সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, কালো ছায়াও হয়ে আসছে ক্ষীণ, ক্রমেই ক্ষীণ। ছায়া যত ক্ষীণতর হচ্ছে, জানালার ভেতর দিয়ে গলিয়ে আসা চাঁদের আলো হয়ে উঠেছে ততই উজ্জ্বলতর।

ঘরের এক জায়গায় কুকুরটা স্থির হয়ে শুয়ে আছে। তরফদার তাকে ডাকলেন। সে জাগল না, নড়লও না' সে মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে। তার চোখ দুটো বেরিয়ে পড়েছে কোটরের ভিতর থেকে। জিভখানাও মুখের বাইরে ঝুলছে।

আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার। তরফদার তার ঘড়িটাও আবার টেবিলের উপরেই দেখতে পেলেন। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, চলছে না।

সত্যি, এ এক অসহনীয় ব্যাপার!

এই অবস্থার মধ্যেও তরফদার নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। সেখানেই সূর্যোদয় পর্যন্ত রইলেন। কিন্তু বাকি রাতটুকুর মধ্যে আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবু দিনের আলোতেও বুকের মধ্যে অনুভব করলেন কেমন বিষম আতঙ্কের শিহরন! ...তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। আবার কালকের মতো শুনতে পেলেন তাঁর আগে কার যেন পদশব্দ।

তারপর নীচে এসে যখন দরজা খুললেন, তখন স্পষ্ট শুনতে পেলেন, তাঁর পেছন থেকে নিম্নকণ্ঠে কে হেসে উঠল। কিন্তু পেছনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না।

॥ এগারো ॥

নিবারণ নিরুদ্দেশ

বাড়িতে ফিরে তরফদার ভেবেছিলেন নিবারণের দেখা পাবেন। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি।

কিছুক্ষণ পরেই তরফদার রমেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন, 'আমার কৌতূহল তৃপ্ত হয়েছে। কালকের রাত্রের কথা শুনতে চান?'

রমেনবাবু বললেন, 'ও রকম কথা অনেক শুনেছি, আর শোনবার আগ্রহ নেই। আমি শুধু জানতে চাই, আপনি এই ভূতুড়ে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন কি না?'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আপনাকেও একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি 'হিপনোটিজম' বা সম্মোহন বিদ্যার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

'হ্যাঁ!'

'জানেন তো, সম্মোহিত ব্যক্তি সম্মোহনকারীর প্রভাবে পড়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই নানা কাজ করে। সম্মোহনকারী ঘটনাস্থানে উপস্থিত না থাকলেও বিদ্যমান থাকে তার সম্মোহনের প্রভাব। সে দূর থেকেই যা দেখতে চায়—তা যত উদ্ভট বা আশ্চর্যই হোক না কেন—সম্মোহিত ব্যক্তি দেখে সেইসব বস্তু বা দৃশ্য।'

'এই রকম সব কথা শুনেছি বটে। কিন্তু সম্মোহন বিদ্যার সঙ্গে বাড়ির ভৌতিক ঘটনাগুলোর সম্পর্ক কী?'

'বলছি। আপনি প্রেততত্ত্ববিদদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন?'

'না।'

'তাদের কার্যকলাপের কথা শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'কী শুনেছেন?'

'শুনেছি তাঁরা নাকি ভূতের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ছায়াটাকে টেনে এনে অনেক কাণ্ডকারখানা করেন।'

'সেই কাণ্ডকারখানা দেখেছেন কখনও?'

'না।'

'সে সম্বন্ধে কিছু শুনতে চান?'

'বলুন।'

'তারা টেবিল-চেয়ার সচল করেন, শরীরী প্রেতও নাকি দেখান। ভারতের এক শ্রেণির জাদুকরের কীর্তি পৃথিবী বিখ্যাত। তাদের খেলার নাম রোপট্রিক বা দড়ির ফাঁসি। জাদুকরের একগাছা মোটা দড়ি সোজা লাঠির মতো শূন্যে বহু ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে স্থির হয়ে থাকে। তারপর একটা ছেলে সেই দড়ি অবলম্বন করে উপরে উঠে সকলের চোখের আড়ালে কোথায় মিলিয়ে যায়। তারপর নাকি শূন্য থেকে ঝুপ-ঝুপ করে নীচে এসে পড়ে ছেলেটার খণ্ড খণ্ড দেহ। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। জাদুকর আবার দেহের অংশগুলো জুড়ে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে তোলে।'

'আপনার বক্তব্য কী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এসব বলার অর্থ কী?'

'রমেনবাবু, আমার মতে ওই সব ব্যাপারের প্রত্যেকটির মধ্যে কাজ করে সম্মোহন। আমার সৃষ্ট মোহিনীশক্তির গণ্ডির ভিতরে যে এসে পড়বে, তাকে আমি যা দেখাব, সে তাই দেখবে, আমি যা শোনাব, সে তাই শুনবে। তারা হবে আমার মস্তিষ্ক বা ইচ্ছাশক্তির দাস—আমার প্রভাবে সকল রকম অসম্ভবই তাদের কাছে হবে সম্ভবপর। এসব কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

'বেশ। আমি তর্ক করতে চাই না। বলুন, তারপর আপনি কী বলতে চান?'

'রমেনবাবু, আমার বিশ্বাস আপনাদের ওই বাড়ির ভিতরে ওই রকমের কোনও মস্তিষ্কের

প্রবল ইচ্ছাশক্তি কাজ করে। সে কে বা তার কার্যপদ্ধতি কী আমি তা জানি না। হয়তো আজ সে জীবিত নেই, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব তবু লুপ্ত হয়নি। সেই শক্তিই অদৃশ্যভাবে কাজ করে যাচ্ছে।'

'আপনার কথা শুনে খুবই বিস্ময় বোধ হচ্ছে। এখন আপনার শেষ বক্তব্য কী বলুন।'

তরফদার বললেন, 'আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তবে আমার মনে হয় ওই বাড়িটাকে আমি ভূতের উপদ্রব থেকে মুক্ত করতে পারব।'

রমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী আমাকে করতে হবে তাই আমাকে বলুন?'

তরফদার বললেন, 'আপনাকে সঙ্গে করে আমি ওই বাড়িটা একটু ঘুরে দেখতে চাই।'

রমেনবাবু বললেন, 'বেশ তাই হবে। অসুবিধা কী আছে, কবে যাবেন বলুন?'

তরফদার বললেন, 'আমার সহকারী নিবারণ এখনও বাড়ি ফেরেনি, তার জন্য চিন্তায় আছি। তাকে আজ খোঁজ করতে হবে। কাল সকালে চলুন।'

'বেশ, তাই হবে। আমি কাল সকাল আটটায় ওই বাড়ির সামনে থাকব। আপনি যাবেন।'

কথাবার্তা ঠিক করে তরফদার বাড়ি ফিরে দেখলেন নিবারণ ফেরেনি। তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, কোথায় গেল নিবারণ? কোথায় সে যেতে পারে?

কিন্তু সেজন্য বসে থাকলে চলবে না। কর্তব্য তাঁকে করতেই হবে।

পরদিন আটটার সময় তরফদার সেই বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলেন, রমেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুরে ঘুরে তাঁরা গোটা বাড়িটা দেখলেন নীচতলার শেষ ঘরটার সংলগ্ন একটি ছোটো ঘর দেখে তরফদারের কেমন যেন সন্দেহ হল। এই ঘরটাতে কিছু নেই। হয়তো কয়লা ঘুঁটে বা অন্য কিছু জিনিস রাখবার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। এখন সেখানে কয়েকটি পাথর পড়ে আছে। তরফদার একটু নেড়েচেড়ে দেখলেন, সেগুলো যেন সিঁদুরমাখা।

অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন তরফদার।

রমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাবছেন?'

তরফদার বললেন, 'আমার মনে হয় যত উপদ্রব আর অমঙ্গলের মূল আছে এই ঘরেই। যদি আমার কথা শোনেন, তবে ওই ঘরটা ভেঙে ফেলতে হবে।'

রমেনবাবু বললেন, 'বেশ ভেঙে ফেলব।'

তরফদার বললেন, 'এই বাড়ি যে বুড়ির জিম্মায় ছিল, বোধহয় তাকেই লেখা দু-খানা চিঠি আমি দেখেছি। খুব সন্দেহজনক চিঠি। চিঠি দু-খানা টেবিলের দেরাজে রেখে দিয়েছি। আপনিও পড়ে দেখতে পারেন। তারপর যদি ইচ্ছা করেন, বুড়ির পূর্বজীবন সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবেন।'

রমেনবাবু চিঠি দু-খানি পকেটে পুরলেন। তারপর বললেন, 'বেশ, খোঁজখবর নেব। যথাসময়েই সব খবর পাবেন।'

দুজনেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কয়েকদিন পর তরফদার রমেনবাবুর কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন। তাতে লেখা—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার দু-দিন পরেই আমি সেই হানাবাড়িতে গিয়েছিলাম। ভজহরিকে সঙ্গে নিয়ে নানারকম খোঁজখবর সংগ্রহ করেছি। বৃদ্ধাকে লেখা চিঠি দু-খানি আমি পাঠ করেছি এবং পাঠ করে বিস্মিত হয়েছি। কোনও অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। তবে খোঁজখবর নিয়ে যা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে এই

বৃদ্ধার নাম সৌদামিনী। সে সম্পন্ন গৃহস্থের মেয়ে। আগে সহোদর অনন্তলালের কাছেই থাকত। অনন্তলাল বিপত্নীক, ছয় বৎসরের একটি পুত্রের পিতা। সেই ছেলেটির লালনপালনের ভার ছিল সৌদামিনীর ওপরে।

ছত্রিশ-সায়ত্রিশ বৎসর আগে সৌদামিনী তার ভাই অনন্তলালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন একটি লোককে বিবাহ করেছিল, প্রথম জীবনে সে নাকি ছিল ডাকাত। বিবাহের ঠিক এক মাস পরেই অনন্তলাল হাওড়া পুলের তলায় জলে ডুবে মারা যায়। কিন্তু লাশ পাওয়া যাবার পর দেখা যায়, তার গলায় রয়েছে আঙুলের দাগ—যেন কেউ গলা টিপে তাকে হত্যা করেছে। কী কারণে জানি না, ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশ প্রথমে মাথা ঘামালেও পরে সব কিছু চাপা পড়ে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক।

ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবিকা হয় সৌদামিনীই। কিন্তু পিতার মৃত্যুর ছয় মাস পরেই শিশুপুত্রটিও মারা পড়ে। সেই মৃত্যুর কারণও দৈব দুর্ঘটনা। শিশু নাকি কেমন করে দোতলা থেকে একতলার উঠানের উপরে পড়ে যায়। কেউ কেউ মনে করে এর পেছনে কোনও ষড়যন্ত্র আছে। এরপর স্বাভাবিকভাবেই পৈর্তৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় সৌদামিনী।

কিন্তু ভাগ্যের কী নির্ম্মম পরিহাস! বিবাহের পর বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই তার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়। তারপর আর সে ফিরে আসেনি। কানাঘুষায় শোনা যায়, বিদেশে কোথায় ডাকাতি করতে গিয়ে সে মারা পড়েছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলেও সৌদামিনীর অর্থের অভাব রইল না। তবে সে সুখও হল অল্পকালের জন্য স্থায়ী। হঠাৎ একটি বড়ো ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বেলে তার আর্থিক সৌভাগ্যকে ব্যর্থ করে দিল। তখন সে এক ধনী লোকের কাছে বাড়ি বিক্রি করে দেয়। সেই বড়োলোক সৌদামিনীকে তার জীবিতকাল পর্যন্ত বাড়িতে বাস করবার অনুমতি দেন। এই হল সংক্ষেপে সৌদামিনীর ইতিহাস। আমি সেই বাড়ির মালিকেরই নিযুক্ত করা লোক।

এবার এদিকের কথা শুনুন। আপনি যে ছোটো ঘরখানা ভেঙে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন, সে ঘরে আমি অনেকক্ষণ ছিলাম। অবশ্য সেখানে আমি কিছু দেখিনি, কোন শব্দও শুনিনি, কিন্তু কেন জানি না সারাক্ষণই আমার মনের ভিতরে জেগে উঠেছিল এক প্রবল আতঙ্ক। মেঝে ভেদ করে যেন কেমন একটা বিষাক্ত ভাপ বাইরে বেরিয়ে আসছিল। সর্বাঙ্গ আমার শিউরে উঠছিল।

আমি আপনার পরামর্শ মতোই কাজ করব। জনকয় মজুর ঠিক করেছি, তারা আসছে, রবিবার সকালেই ওই ঘরখানা ভেঙে ফেলতে শুরু করবে। সেই সময়ে আপনি উপস্থিত থাকলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। ইতি—

রমেন্দ্রনাথ রায়

॥ বারো ॥

ঘটনার রহস্যজাল

চিঠি পড়ে তরফদার আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। বৃদ্ধা সৌদামিনীর জীবনের রহস্য যে কী তা যেন ক্রমেই তাঁর কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে লাগল।

দুর্বোধ্য হয়তো থেকেই যেত যদি না হঠাৎ সেই বাড়ির মালিক বেড়াতে এসে দু-দিনের জন্য কলকাতায় এসে না উঠতেন।

আর দৈবচক্রেই বাড়িওয়ালা পরিতোষ চৌধুরির সঙ্গে তরফদারের দেখা হয়ে গেল। পরিতোষবাবু বৃদ্ধার মৃত্যুসংবাদ রমেনবাবুর কাছে শুনেই কী মনে করে বাড়িটি দেখতে এলেন। সেই সময়ে তরফদারও সেই বাড়িতে ছিলেন।

তরফদার পরিতোষ চৌধুরির সঙ্গে আলাপ করে সব ঘটনা খুলে বললেন। রমেনবাবু কিন্তু চাইছিলেন তরফদার যেন খুঁটিনাটি সব ঘটনা বাড়িওয়ালার কাছে না বলে। কারণ তাতে তাঁর স্বার্থহানি ঘটতে পারে।

বাড়ির ব্যাপারে রমেনবাবুর কী গোপন স্বার্থ আছে তা তরফদার জানেন না। তাই তিনি রমেনবাবুর নানা রকম ইশারা ও বারণ অগ্রাহ্য করে অকপটে সব বলে যেতে লাগলেন।

পরিতোষ চৌধুরি বিস্মিতভাবেই বললেন, 'এত সব ব্যাপার তো আমি জানি না। আমি শুধু শুনেছি এটা ভূতুড়ে বাড়ি, এ বাড়িতে যে বাস করে সে-ই নির্বংশ হয়। ভয়ে কেউ এ বাড়ি ভাড়া নেয় না। কিন্তু আপনার কাছে থেকে সব ঘটনা শুনে যেন আমার কেমন মনে হচ্ছে।'

তরফদার বললেন, 'আমিও সেই রকম শুনেছিলাম। তবে আমারও মনে হয় এ বাড়ির ভেতর কোনও রহস্য রয়েছে।'

পরিতোষবাবু বললেন, 'আপনি কি সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন বলে মনে করেন?'

তরফদার বললেন, 'হ্যাঁ, পারব বলে মনে হয়। তবে আপনাকেও এই ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।'

'কী রকম সাহায্য করব বলুন?'

'এই বাড়ির বৃদ্ধা সৌদামিনীর সম্বন্ধে আপনার যদি কিছু জানা থাকে আমাকে খুলে বলতে হবে।'

পরিতোষবাবু বলতে লাগলেন,—'অনন্তলালের নাম নিশ্চয়ই আপনি আমাদের বাড়ির সরকার রমেন রায়ের মুখে শুনেছেন। সে ছিল সত্যি ভালো লোক। কিন্তু ওই সৌদামিনী জীবনে এমন ভুল করেছিল যার জন্য সারা জীবন তাকে ভুগতে হয়েছিল।

সৌদামিনী যাকে বিয়ে করেছিল সে ছিল অনন্তলালের খুবই পরিচিত। লোকটির নাম বঙ্কুবিহারী। এমন কোনও জঘন্য কাজ ছিল না যা বঙ্কুবিহারী না করতে পারত।

বঙ্কুবিহারী যে খারাপ লোক তা অনন্তলাল জানত। কাজেই বিয়েতে তার মত ছিল না। কিন্তু সৌদামিনীর দিকে তাকিয়েই তাকে সম্মতি দিতে হয়েছিল।

বঙ্কুবিহারী যতই ভালো মানুষ সেজে থাকুক না কেন কিছুদিনের মধ্যেই তার স্বরূপ প্রকাশ হতে লাগল।

প্রথম থেকেই বাড়িটার উপর তার লোভ ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল অনন্তলালকে না সরাতে পারলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই অনন্তলালকে সে-ই খুন করে। বঙ্কুবিহারীর এক সাকরেদ ছিল তার এই অপকর্মের সহায়। তার সাহায্যেই বঙ্কু এই গুরুতর কাণ্ড করতে সাহস পায়।

হাওড়ায় পুলের নীচে অনন্তলালের মৃতদেহ যখন পাওয়া গেল তারপর পুলিশ বঙ্কুবিহারীর খোঁজ করে। বঙ্কুবিহারীর গোপন আড্ডায় হানা দিয়ে তার সাকরেদকে গ্রেফতার করে। বঙ্কুবিহারী পালিয়ে যায়। এরপর থেকেই সে আত্মগোপন করে থাকে।

কিন্তু আত্মগোপন করে থাকলেও তার গোপন কার্যকলাপ বন্ধ হয় না। অনন্তলালের ছেলেকে সে-ই হত্যা করে। প্রথমে সৌদামিনী দোতলাতেই বাস করত। অনন্তলালের ছেলেটিও থাকত তার সঙ্গে। রাত্রিবেলায় মাঝে মাঝে বঙ্কু সেই বাড়িতে আসত। সৌদামিনীকে বলত সে যেন কোনও কথা প্রকাশ না করে। ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য নানারকম পরামর্শ দিত।

সৌদামিনী তাতে রাজি হয়নি। অনন্তলালের ছেলেকে সে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসত। তখন বঙ্কুই একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় ছেলেটিকে দোতলা থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। ছেলেটি মারা যায়। সৌদামিনী বঙ্কুর কথামতোই পাড়ার লোককে বলে, ছেলেটি দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে।

সৌদামিনী বুঝতে পেরেছিল তার জীবন সুখের হবে না। সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তখন কিছু করার আর উপায় ছিল না। বঙ্কুর কবল থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছা থাকলেও সে তখন হয়ে পড়েছিল অসহায়। বঙ্কু ছাড়া তার আপনজনও আর কেউ ছিল না।

কিন্তু বঙ্কুর জীবনও ছিল অভিশপ্ত। ইচ্ছা থাকলেও স্বাধীনভাবে সে চলাফেরা করতে পারত না। প্রায় আত্মগোপন করেই তাকে থাকতে হত।

যখনই লুকিয়ে মাঝে মাঝে সে এই বাড়িতে আসত তখনই সৌদামিনী তাকে ভর্ৎসনা করত। কাজেই তার জীবনেও শান্তি ছিল না।

বঙ্কুবিহারী চেয়েছিল সৌদামিনীর উপর প্রভাব বিস্তার করে বাড়িটা তার কাছ থেকে নিজের নামে লিখিয়ে নিতে। অনেক রকম ফন্দিফিকির সে করেছিল। ভেবেছিল সেই ফন্দি সফল হলে সে আত্মপ্রকাশ করবে।

কিন্তু সৌদামিনী রাজি হয়নি।

তখন বঙ্কুবিহারী সৌদামিনীকে হত্যা করবার ভয় দেখায়। সৌদামিনী তখন পাল্টা ভয় দেখাতে থাকে যে তার আগেই সে সব ঘটনা পুলিশের কাছে প্রকাশ করে দেবে।

কাজেই বঙ্কুবিহারী খুবই মুশকিলে পড়ে যায়।

তবু বঙ্কুবিহারী তার স্বভাবগত হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে ছাড়েনি। সে বহুদিন সৌদামিনীকে মারধর করেছে। খুন করবার চেষ্টাও করেছে।

সৌদামিনী নিজের শক্তির জোরে বেঁচে গেছে মৃত্যুর হাত থেকে।

অবশেষে বঙ্কুবিহারী বোধহয় স্থির করে এই বাড়ির আশা ত্যাগ করে সে অন্য প্রদেশে চলে যাবে। একদিন সে সৌদামিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করে। তারপরেও সে মাঝে মাঝে এই বাড়িতে আসত। চুপচাপ থাকত—সৌদামিনীর সঙ্গে কথা বলত না। মাঝে মাঝে গভীর রাতে কয়েকজন লোক নিয়ে বাড়িতে আসত। সৌদামিনীর ঘরে ঢুকত না। তারা কী করত সৌদামিনী জানে না। রাত শেষ হবার আগেই সবাই চলে যেত।

যেদিন বঙ্কু শেষবারের মতো এই বাড়িতে আসে, সেদিন যাবার সময় বলে যায়, 'এই বাড়িতে আমি আর কোনওদিন আসব না। কিন্তু এ কথা জেনে রেখো এই বাড়িতে তুমিও সুখে বাস করতে পারবে না।'

এরপর বঙ্কুবিহারী সত্যি আর এই বাড়িতে আসেনি। দিনের পর দিন যেতে লাগল। অনুতপ্ত জীবন নিয়ে দিন কাটাতে লাগল সৌদামিনী। উপরের ঘর ভাড়া দিয়ে নীচে বাস করতে লাগল সে। আর্থিক অনটন তার হয়তো কোনওদিনই হত না, যদি না তার সঞ্চিত অর্থ যে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল সেই ব্যাঙ্ক ফেল করত।

বাংলার বাইরে অন্য এক প্রদেশে ডাকাতি করতে গিয়ে বঙ্কুবিহারী মারা পড়েছিল সে খবর কী ভাবে যেন জানতে পেরেছিল সৌদামিনী। তারপরেই সে এই বাড়িটা বিক্রি করবার চেষ্টা করে। ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। কান্নাকাটি করে আমার কাছে

অনেক কথাই সে বলেছিল। তবে অনুরোধ করেছিল, আমি যেন কাউকে এই কথা না বলি। আমি তার অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম। অসহায় বিধবার মুখের দিকে তাকিয়েই তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলাম। তার ইচ্ছানুসারেই স্বীকার করেছিলাম যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন এই বাড়িতেই বাস করবে।

সৌদামিনী মারা গেছে, তাই এখন আর কোনও কথা প্রকাশ করতে বাধা নেই। বাড়ির আমার দরকার ছিল না। শুধু বিধবাকে সাহায্য করবার জন্যই বাড়িটা কিনেছিলাম। কিন্তু এই বাড়িটা যে এত অভিশপ্ত তা কে জানত? আপনার কাছে সব কথা শুনে আমার তো মশাই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে।

তরফদার বললেন, 'আমারও আক্কেল গুড়ুম হবার জোগাড়! কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে আমার কৌতূহল আছে বলেই আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। চিন্তা করছি, যে কোনও উপায়ে এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায় কি না।'

পরিতোষ চৌধুরি বললেন, যদি রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে পারেন তবে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।'

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, পরিতোষবাবু, বঙ্কুর সেই গোপন আড্ডাটি কোথায় ছিল তা বলতে পারেন?'

পরিতোষবাবু বললেন, 'না, আমি তা জানি না। ও সম্বন্ধে জানবার কৌতূহলও আমার কোনওদিন হয়নি।'

তরফদার আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বঙ্কুবিহারীর সেই সাগরেদটির খবর কিছু রাখেন কি? সে কি বেঁচে আছে, না এখনও জেলে আছে অথবা নিজের ব্যবসাই শুরু করেছে আবার?'

পরিতোষবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'নিজের ব্যাবসা আবার কী? তারও কোনও নিজের ব্যবসা ছিল নাকি? আপনি কি তার খবর রাখতেন? আমি তো তার ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু বলিনি আপনাকে।

তরফদার বললেন, 'সে আবার কি বলতে হয়? ছিনতাই, রাহাজানি এ সবই তো ছিল তাদের জাত-ব্যবসায়।'

এবার হো হো করে হেসে উঠলেন পরিতোষবাবু। বললেন, 'ও, আমি আপনার কথার রহস্য বুঝতে পারিনি।'

পরিতোষ চৌধুরি সেদিনই চলে গেলেন। তরফদার ভাবতে লাগলেন আকাশ-পাতাল। কিন্তু সবার আগে, তাঁর দুশ্চিন্তা হতে লাগল নিবারণের ব্যাপার নিয়ে। নিবারণ কোথায় গেল? তার বাড়িতেও সে ফেরেনি। তা হলে তার অন্তর্ধানের পেছনেও কি কোনও রহস্য আছে?

কে জানে?

॥ তেরো ॥

নিবারণের অন্তর্ধানের রহস্য

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল।

নিবারণ সেই যে ছুটে চলে গেছে আর সে আসেনি। কোথায় গেল সে?

তরফদার নানা জায়গায় তার খোঁজ করলেন। কোথাও খোঁজ না পেয়ে চলে গেলেন থানায়। থানার ও সি চঞ্চল লাহিড়ী তরফদারকে চিনতেন। তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার? আমাদের এখানে কী মনে করে? কোনও খুনের ঘটনা ঘটেছে নাকি?'

তরফদার বললেন, 'খুনের ঘটনা না ঘটলেও ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক। আমার ভৃত্য ও সহকারী নিবারণ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'

সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন তরফদার।

চঞ্চল লাহিড়ী বললেন, 'ভয় পেয়ে সে তার দেশের বাড়িতে চলে যায়নি তো?'

তরফদার বললেন, 'যে ভূতকে এত ভয় পায় সে কি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারবে?'

চঞ্চল লাহিড়ী বললেন, 'কথাটা মন্দ বলেননি। কিন্তু যাবেই বা কোথায়? রাস্তায় খুনটুন হয়নি তো?'

তরফদার বললেন, 'খুনটুন হলে তো আপনাদের এখানেই রিপোর্ট আসত।'

চঞ্চল লাহিড়ী বললেন, 'আমার এরিয়া হলে এই থানার খবর আসত, কিন্তু অন্য এরিয়ায় এই ঘটনা ঘটলে তা তো আর এখানে আসবে না।'

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কী মনে হয়?'

চঞ্চল লাহিড়ী জবাব দিলেন, 'কলকাতায় কত রকম বিচিত্র ঘটনা ঘটে, কাজেই আগাম কিছু বলা অসম্ভব। তবে আমি একটা ডায়েরি লিখে রাখছি।'

তরফদার থানা থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে গেলেন। বিকেলের দিকে তৈরি হয়ে আবার এসে উপস্থিত হলেন সেই ভূতুড়ে বাড়িতে। কিন্তু মনটা তার ভয়ানক নিঃসঙ্গ। বাঘা নেই, নিবারণও নেই। একজন সঙ্গী থাকলে কাজে খুব সাহস বাড়ত।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে তরফদার বাড়ির ভিতরে পা দিলেন। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বাড়ির ভিতরটায় কী রকম যেন একটা গুমোট ভাব।

নীচের তলার সামনের ঘরে পা দিয়েই থমকে গেলেন তরফদার। এ কী? মেঝের উপর কে পড়ে আছে অমন ভাবে?

কাছে গিয়ে দেখলেন, নিবারণ। একটা গোঙানির শব্দ তার মুখ থেকে বেরুচ্ছে। একেবারে জ্ঞানহারা সে হয়নি। জ্ঞান কিছুটা তখনও আছে।

বিস্মিত হয়ে গেলেন তরফদার। বাড়ির ভেতরেই একটা জলের কল ছিল। সেখান থেকে

রুমালটা ভিজিয়ে এনে নিবারণের মুখে চোখে ঘষতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে প্রকৃতিস্থ হল।

স্থির হয়ে মেঝের উপরে উঠে বসল নিবারণ। তারপর তার মুখ থেকে যে ঘটনা শোনা গেল তা খুবই আশ্চর্যজনক।

নিবারণ ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এমন ভয় পেয়েছিল যে কিছুতেই সে নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। পথে বেরিয়েও স্থির করতে পারছিল না কোথায় যাবে। তারপর কীসের যেন আকর্ষণে সে ছুটে গিয়েছিল পথের বাঁক ঘুরে ছোট্ট ঝিলটার পাশে।

তরফদার এবার তাকে একটু থামতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, তুমি বাড়িতে চলে যেতে পারলে না?'

নিবারণ জবাব দিল, 'আমার যে একটা থাকবার আস্তানা আছে সে কথাও ভুলে গিয়েছিলাম কর্তা।'

তরফদার বললেন, 'আর এটাও তো জানো, আমি বাড়িতেই রয়েছি, আমি থাকতে তোমার কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। বিপদ হলে দুজনেরই হবে।'

নিবারণ বলল, 'আমার কোনও কিছুই খেয়াল ছিল না কর্তা। আমার কী যে হয়েছে তা নিজেই জানি না। হয়তো কোনও মায়াবী ভর করেছিল।'

তরফদার বললেন, 'বাজে কথা রাখো। তারপর কী হয়েছিল বলো।'

নিবারণ বলল, 'সত্যি আমি যেন নেশার ঘোরে ছুটে চলেছিলাম। কোনদিকে যাচ্ছিলাম নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। চলতে চলতে দেখলাম একটা ঝিলের পাশে এসে পড়েছি।

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কী হল?'

নিবারণ জবাব দিল, 'তারপর কী হল আমি কিছুই জানি না কর্তা। আমার মাথাটা ঘুরছিল। তারপর বোধহয় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।'

তরফদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তুমি এখানে আবার এলে কী করে?'

নিবারণ বলল, 'আজ দুপুরবেলায় আমার জ্ঞান ফিরে এল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। ভাবলাম, আপনি এই বাড়িতে একা রয়েছেন। তাই আপনার খোঁজে এই বাড়ির দিকে রওনা হলাম।'

'তারপর?'

'বাড়িতে ঢুকবার মুখেই আমি শুনতে পেলাম বাঘা যেন ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে।'

'বাঘা ডাকছে? এ কী কথা তুমি বলছ নিবারণ?'

'হ্যাঁ কর্তা। আমি নিজের কানে শুনেছি।'

'কিন্তু বাঘা যে মারা গেছে তা তো তুমি জানো? তার মৃতদেহটা এখনও পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে।'

'হ্যাঁ, তা তো জানি। কিন্তু—'

'চলো নিজের চোখেই তার মৃতদেহটা দেখে আসি। ওটাকে তো ঘর থেকে সরানোও দরকার। নইলে পচে দুর্গন্ধ বের হবে।'

'চলুন কর্তা।'

নিবারণকে নিয়ে তরফদার দোতলার ঘরে গেলেন যেখানে কাল রাত্রে অনেক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখলেন সেখানে বাঘার মৃতদেহ নেই।

চাপ চাপ রক্তের দাগ রয়েছে মেঝেতে, কিন্তু মনে হয় সেই রক্তের দাগ যেন আগের চেয়ে অস্পষ্ট—কিছুটা ম্লান। তা হলে অন্য কোনও জন্তু কি সেই রক্ত চেটে খেয়েছে?

সব কিছুই যেন রহস্যজনক মনে হতে লাগল তরফদারের কাছে। কী ব্যাপার?

নিবারণ জিজ্ঞেস করল, 'কর্তা, কেউ কি তা হলে এ বাড়িতে এসেছিল আমাদের চলে যাওয়ার পর? মরা কুকুরটাকে কি কেউ টেনে নিয়ে বাইরে ফেলে দিল, না ওটা আবার বেঁচে উঠল? আমি ঘেউ ঘেউ শব্দই বা শুনলাম কীসের?'

তরফদার বললেন, 'ওসব কথা এখন থাক নিবারণ। এখন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসো। তোমার কাছে ব্যাপারটা শুনি।

দুজনে ঘরে বসলেন। নিবারণ বসল খাটটার ওপর আর তরফদার বসলেন চেয়ারে। তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল এ বাড়িতে পা দিয়েই তুমি কুকুরের ডাক শুনতে পেয়েছিলে, সেটা কি বাঘার ডাক না অন্য কোনও কুকুরের ডাক?'

নিবারণ বলল, 'না কর্তা, ওটা ঠিক বাঘার ডাক। আমি কি বাঘার ডাক আর অন্য কুকুরের ডাক বুঝতে পারি না?'

'তখন তোমার কী মনে হল?'

তখন আমার মনে হল—বাঘা কি তাহলে বেঁচে উঠেছে? বাঘা কি মরেনি?

'বেশ তারপর?'

'ঘেউ ঘেউ শব্দটা কোনদিক থেকে আসছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কর্তা। একবার মনে হয় ওপরে—একবার মনে হয় নীচের ঘরে। ওপরের ঘরের দিকে যাবার জন্য সিঁড়ির অর্ধেক পথে উঠতেই আবার বাঘার ঘেউ ঘেউ শব্দ নীচের দিকে শুনতে পেলাম। তখন নীচের ঘরে এসে ঢুকলাম। কিন্তু দেখি ঘর ফাঁকা। তখন বেরিয়ে আসবার জন্য পা বাড়ালাম। কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারি না। হঠাৎ একটা আবছা ছায়ামূর্তি আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। কিছুতেই আমাকে বের হতে দিল না। সাহস করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু এক প্রবল ধাক্কায় মেঝের ওপর পড়ে গেলাম।

তরফদার এবার সত্যি মনের মধ্যে একটা প্রবল ধাক্কা খেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কী হল?'

নিবারণ বলল, 'তারপর কী হল, আমি কী করে বলব কর্তা। আপনিই তো আমাকে চোখে মুখে জল দিয়ে সুস্থ করে তুললেন। আমার বড়ো ভয় লাগছে কর্তা।'

তরফদার একটু থেমে বললেন,—'আর কোনও ভয় নেই নিবারণ। আজ রাতটা এখানে কাটাব ভেবেছিলাম, কিন্তু আর কাটাব না। আজ ফিরে চলো। বাড়িওয়ালার সরকারের সঙ্গে আমার সব কথাবার্তা হয়ে গেছে। রবিবার দিন আমরা আবার এখানে এসে মিলিত হব। এবার আর একা নয়—সঙ্গে থাকবে কয়েকজন লোক আর কুলি-মজুর। ভূতের আড্ডা এবার ভাঙতে পারব আশা করি। তোমাকে ফিরে পেয়ে আমার প্রাণটাও যেন ফিরে এসেছে। চলো বাড়ি যাই।'

সদরটা এবার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন তরফদার। তারপর দুজনে ফিরে চললেন।

॥ চৌদ্দ ॥

রহস্যের অনুসন্ধান

যথানির্দিষ্ট দিনে ও যথাসময়ে আবার তরফদারের হানাবাড়িতে আবির্ভাব ঘটল। গিয়ে দেখলেন, মিস্ত্রি ও মজুরদের নিয়ে রমেনবাবু তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

সেই ছোটো ঘরটাতেই আগে ঢোকা হল। ঘরে সিঁদুর মাখা কয়েকটা পাথর ও কতগুলি ভাঙা জিনিসপত্র দেখে তরফদার বললেন, '—এই জিনিসগুলি আগে সরানো দরকার।'

মজুরদের সাহায্যে সেই সব পাথর ও ভাঙা জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে ফেলা হল। দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল, মেঝের ওপর চৌকো দরজার মতো কী একটা জিনিস বসানো রয়েছে। সেটা লোহার শিকল ও তালা দিয়ে বন্ধ।

তরফদার বললেন, 'এটা কী? মনে হয় কোনও চোরাদরজা।'

মজুররা বলল, 'আমাদেরও তাই মনে হয় হুজুর।'

তরফদার বললেন, 'ভেঙে ফ্যালো দরজার শিকল ও তালা।'

হাতুড়ি ও শাবল প্রভৃতির সাহায্যে তালা ও শিকল ভেঙে ফেলা হল। দরজা খুলতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল স্যাঁতসেঁতে বন্ধ বাতাসের দুর্গন্ধ।

রমেনবাবু উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন। তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'রমেনবাবু, কী দেখছেন ভিতরে?'

রমেনবাবু বললেন, 'মশাই, এটা তো একটা চোরাকুঠুরি বলে মনে হচ্ছে, ভেতরটা যে একেবারে অন্ধকার!'

তরফদার উঁকি দিয়ে দেখলেন, তাঁর মনে হল বহুকাল এই চোরাকুঠুরি ব্যবহার হয়নি। এর মধ্যে সাপ আছে কি ব্যাং আছে বোঝবার উপায় নেই। তাই বললেন, 'আলো না নিয়ে নীচে নামা কিছুতেই নিরাপদ নয়।'

রমেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

লণ্ঠন জ্বালিয়ে আনার ব্যবস্থা হল। তরফদার বললেন, 'আসুন রমেনবাবু আমার পেছনে।'

রমেনবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'এবার আমার পৈতৃক প্রাণটা যাবে দেখছি।'

তরফদার একটুখানি ঢুকেই বললেন, 'পাশের ওই দেয়ালটাও ভাঙতে হবে, নইলে ঢোকা যাবে না।'

মজুরদের দিয়ে দেয়ালটারও কিছু অংশ ভাঙতে হল। তখন ভিতরে যাবার পথটি যেন আরও প্রশস্ত হল। তখন তরফদার রমেনবাবুকে বললেন, 'এবার এগিয়ে আসুন।'

তরফদার নিজেও এগিয়ে যেতে লাগলেন।

রমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকেও সত্যি ওখানে ঢুকতে হবে নাকি?'

তরফদার জবাব দিলেন, 'ঢুকতে হবে না তো কী? দেখছেন না আমি ঢুকছি।'

রমেনবাবু বললেন, 'আমার ঢুকে কী লাভ বলুন?'

তরফদার বললেন, 'লোকসান হবে বলেই বা ভাবছেন কেন? লাভও তো হতে পারে।'

রমেনবাবু বললেন, 'কিন্তু—'

তরফদার বললেন, 'কিন্তু নয়, আসুন, লাভ লোকসান যা হবে দুজনেই না হয় ভাগ করে নেব।'

রমেনবাবু সেই গন্তব্যস্থলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও মশায়, আপনি কি মনে করেন ওখানে গুপ্তধন আছে নাকি?'

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কী মনে হয়?'

রমেনবাবু জবাব দিলেন, 'আমার মনে হয়, গুপ্তধনের আশা যদি আপনি করে থাকেন তবে খুবই ভুল করছেন।'

তরফদার বললেন, 'আপনার ভয় করছে নাকি? জানেন তো গোলাপ তুলতে গেলে কাঁটার আঘাত পেতে হয়।'

রমেনবাবু বললেন, 'তা জানি।'

তরফদার বললেন, 'তবে আর দেরি করছেন কেন? দেখছেন তো আমি ঢুকছি।'

রমেনবাবু আর আপত্তি করতে পারলেন না। তরফদারের পদাঙ্ক অনুসরণ তাঁকে করতে হল।

কোনওরকমে হামাগুড়ি দিয়ে দুজন সেই চোরাকুঠুরিতে ঢুকলেন। দুজন মজুরকেও সঙ্গে নেওয়া হল। অন্ধকার চোরাকুঠুরি। কোনও দিক থেকে আলো ঢুকবার ব্যবস্থা নেই। প্রথমে সবাই সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে সবারই চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর অন্ধকারটা যেন চোখে একটু সয়ে এল। কিছু কিছু দেখা যেতে লাগল ঘরের ভেতরটা।

চোরাকুঠুরির ভেতরে আসবাবপত্র কিছুই নেই, আছে শুধু একটা লোহার সিন্দুক।

সিন্দুকটায় মরচে ধরে গেছে, কিন্তু অত্যন্ত মজবুত। চাবি বন্ধ করা। কিন্তু চাবি কোথায়! অনেক খুঁজেও চাবি পাওয়া গেল না। তখন মজুরদের সাহায্যেই অনেক চেষ্টা করে সিন্দুকটার ডালা খোলা হল।

সকলেরই কৌতূহল ছিল, ভিতরে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনও ধনদৌলত বা বহুমূল্য জিনিস পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল একখানি হাতে লেখা পুথি আর তার উপরে বসিয়ে রাখা একখানা চিনেমাটির রেকাবি।

রমেনবাবু বললেন, ওটা কী?'

সবার মনেই কৌতূহল আর আশঙ্কার ভাব। কিন্তু কেউ ওটাকে ধরবার সাহস পেল না।

তরফদার টর্চের আলোতে ভালো করে জিনিসটা দেখলেন। তারপর রমেনবাবুকে বললেন, 'আমার টর্চটা ধরুন।'

রমেনবাবু টর্চটা হাতে নিলে সাহস সঞ্চয় করে আস্তে আস্তে রেকাবিখানা হাতে করে তুলে নিলেন তরফদার।

সবার তখন কৌতূহল সেদিকে।

তরফদার রমেনবাবুকে বললেন, 'টর্চের আলোটা ভালো করে এটার উপর ফেলুন তো।'

রমেনবাবু টর্চের আলো নিবদ্ধ করলেন সেই রেকাবিটার উপরে। দেখা গেল তাতে জলের মতো টলমল করছে কী একটা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও তরল পদার্থ। তারই ভিতরে বসানো আছে কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্রের মতো দেখতে একটি ছোটো যন্ত্র। একটি কাঁটাও রয়েছে যন্ত্রের মধ্যে এবং সেটা অতি দ্রুত গতিতে ঘোরাফেরা করছে এদিকে আর ওদিকে।

সবাই একটু অবাক হয়ে গেল, সেই জিনিসটি দেখে। কারুর মুখে কোনও কথা নেই, নির্বাক দর্শকের মতো সবাই সেই আশ্চর্য জিনিসটি দেখতে লাগল।

সবাই ক্রমে ক্রমে অনুভব করল, সেই জলের মতো পদার্থ থেকে চারদিকে যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। গন্ধটা তীব্র নয়, খারাপ কিছু বলেও মনে হল না।

কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যেন কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলেন তরফদার। তাঁর দেহমন ও শিরা উপশিরার মধ্যে সেই অজানা গন্ধ আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করল। তাঁর শরীরে যেন একটা মৃদু কম্পন অনুভব করতে লাগলেন। তারপর শুধু তরফদারের উপরে নয়, অন্যান্য সকলের উপরেও সেই প্রভাব পড়তে বিলম্ব হল না। তারাও যেন দেহে মৃদু কম্পন অনুভব করতে লাগলেন।

ক্রমেই যেন বাড়তে লাগল সেই প্রতিক্রিয়া।

তরফদারের হাতের আঙুল থেকে মাথার চুলে পর্যন্ত এমন অসহনীয় বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাচল করতে লাগল যে, তিনি যেন কী রকম একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কী

রকম যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি! রেকাবিখানা আর ধরে রাখতে পারলেন না তরফদার। সেটা মাটির উপরে পড়ে সশব্দে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তরল পদার্থটা মেঝের উপরে গড়াতে লাগল এবং যন্ত্রটাও ছিটকে পড়ল একদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে লাগল এক অলৌকিক ব্যাপার।

ঘরের চারদিকের দেওয়াল কাঁপতে কাঁপতে দুলতে লাগল—মনে হল যেন কোনও বিপুলবপু মহাদানব প্রচণ্ড আক্রোশে ঘরের সব মানুষের উপর ধাক্কার পর ধাক্কা মারছে।

প্রথমে কেউ কিছু বুঝতে পারল না। সবাই নির্বাক, নিস্তব্ধ। কিন্তু তারপরেই সকলের মুখে ভাষা ফুটে উঠল। 'পালান! পালান!' রব উঠল কুঠুরির মধ্যে।

সবাই সন্ত্রস্ত। সবাই চঞ্চল। সকলেই বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল। কিন্তু হতবুদ্ধি হয়ে তারা যেন বাইরে বেরুবার পথও হারিয়ে ফেলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীষণ আতঙ্ক নিয়ে সকলে কোনওরকমে চোরাকুঠুরির বাইরে পালিয়ে এল।

কিন্তু ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে পালাবার সময়ও তরফদার পুথিখানা আনতে ভুললেন না। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন—সেটা কোনও ছাপানো বই নয়—হাতে লেখা 'মহানির্বাণতন্ত্র'।

বাইরে আসার পর কোনও কম্পন আর কেউ অনুভব করতে পারল না। তরফদার একটু নিশ্চিন্তভাবেই পুথিখানা খুলে দেখতে লাগলেন। ভিতরে পাওয়া গেল একখণ্ড কাগজ। তার উপরে কতগুলি কথা লেখা। অনেকদিন আগেকার লেখা বলেই মনে হয়। বিবর্ণ হয়ে গেছে লেখাগুলি।

তরফদার লেখাগুলির বক্তব্য উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন। সকলেই সেই কাগজখণ্ডটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর তরফদার কথাগুলির মর্ম উদ্ধার করতে সমর্থ হলেন। কাগজটিতে এই কথাগুলি লেখা—

'এই বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে সচেতন বা অচেতন জীবন্ত বা মৃত যা কিছু আছে, যন্ত্রের কাঁটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে তারাও চলবে আমার ইচ্ছাশক্তির বশবর্তী হয়ে। অভিশপ্ত হোক এই বাড়ি—অশান্তিপূর্ণ হোক এখানকার প্রত্যেক আত্মা।'

সুমন্ত তরফদার ভাবতে লাগলেন এগুলি দিয়ে কী করবেন।

রমেনবাবু এতক্ষণ প্রায় হতভম্ব নীরব দর্শকই ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাবছেন তরফদারবাবু?'

তরফদার জবাব দিলেন, 'এগুলি নিয়ে কী করব তাই ভাবছি।'

রমেনবাবু বললেন, 'এসব শত্রুকে নষ্ট করে ফেলুন, পুড়িয়ে দিন।'

—'হ্যাঁ, তাই করব।'

—'করব নয়, এখনই করুন।'

—'বেশ তাই হোক।'

পুথি, কাগজপত্র ও যন্ত্র সব বাইরে এনে জড়ো করা হল। জড়ো করা হল কিছু শুকনো কাঠ ও নানা জিনিসপত্র। তারপর তরফদার মজুরদের বললেন, 'এগুলোতে আগুন ধরিয়ে দাও।'

আগুনে সব কিছু পুড়িয়ে দেওয়া হল।

তরফদার বললেন, 'এ বাড়ি নিয়ে আমার গবেষণা শেষ। আজ থেকে আমার ছুটি।'

রমেনবাবু বললেন, 'আপনি কি মনে করেন, ভূতের উপদ্রব আর এ বাড়িতে হবে না?'

তরফদার বললেন, 'হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়।'

রমেনবাবু বললেন, 'কিন্তু—'

তরফদার বললেন, 'যদি এর পরও কোনও কিছু উপদ্রবের কথা শোনেন, তবে আমাকে খবর দেবেন। আমি আবার নতুনভাবে গবেষণা করব।'

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তরফদার।

তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। এরপর ওই বাড়িতে আর কোনও উপদ্রবের কথা শোনা যায়নি।

রহস্যের আলো-ছায়া
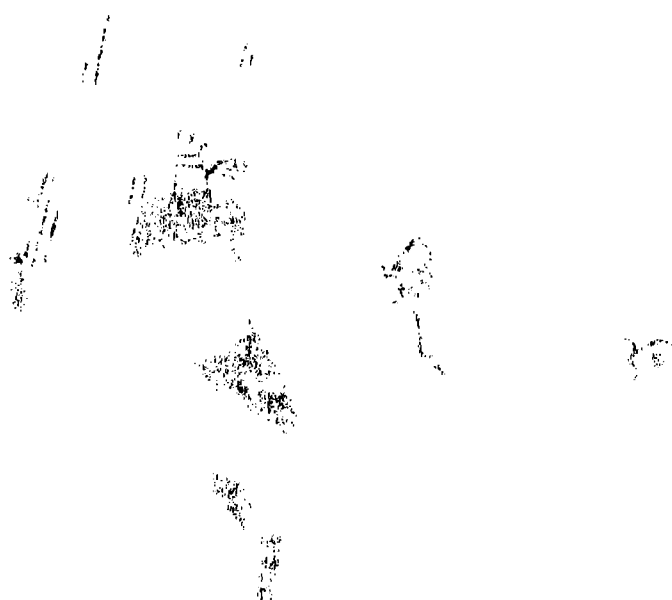
'রহস্যের আলো-ছায়া' গ্রন্থটি অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে আষাঢ়
১৩৭০/জুন ১৯৬৩-তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রথম অংশ
অপরাধের কলাকৌশল

॥ প্রথম ॥

অক্ষয়কুমার চৌধুরি পণ্ডিতদের একটি মস্ত বড়ো উক্তি ব্যর্থ করে দিয়েছে।

পণ্ডিতরা বলেন, 'মানুষের মুখ হচ্ছে মনের আয়না।'

কিন্তু অক্ষয়ের মুখের পানে তাকিয়ে তার চরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে, এমন লোক কেউ আছে বলে জানি না। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে পণ্ডিতদের মুখ হবে বন্ধ।

কী হাসি হাসি সরল মুখ তার! সে হাসির ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে যেন সদাশয়তা আর ন্যায়পরায়ণতা! বসুধার সবাই যেন তার কুটুম্ব!

কিন্তু অক্ষয় নিজেই জানে, কেউ যদি তাকে চোর, জুয়াচোর, অসাধু বা দাগাবাজ বলে ডাকে, তবে একটুও মিথ্যা বলা হবে না।

তার ছোটো বাড়িখানিতে থাকে একটি মাত্র আধবুড়ো লোক—একাধারে সেই-ই হচ্ছে পাচক ও বেয়ারা। নাম রামচরণ। সকলের কাছেই সে বলে বেড়ায়, 'আমার মনিবের মতন সৎ, আমুদে আর ভালোমানুষ লোক আর দেখা যায় না। মুখে তাঁর গান আর মিষ্টি কথা লেগেই আছে।'

কিন্তু রামচরণ যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারত, অক্ষয় তার মাইনের টাকা জোগাড় করে বড়ো বিদ্যা চুরিবিদ্যার দ্বারা, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডেও তার প্রকাণ্ড বিস্ময়ের স্থান সংকুলান হত না।

চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা হতে পারে, কিন্তু বিপজ্জনকও বটে। এ সত্য অক্ষয়ের অজানা ছিল না। চোরের পক্ষে কেউ নেই—বিপক্ষে সবাই।

কিন্তু অক্ষয় এও জানে, মাথা খাটাতে আর অতিলোভ সামলাতে পারলে, চুরিবিদ্যাও লাভজনক হতে পারে।

অক্ষয় অতিলোভী নয়। তার মাথাও আছে। তার দলবল নেই—সে একলা চুরি করে। তার বিরুদ্ধে কেউ 'রাজার সাক্ষী' হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সে ঘন ঘন চুরি করে না। অনেক বুঝে-সুঝে ফন্দি এঁটে মাঝে মাঝে চুরি করে, তারপর চোরাই মাল বেচে যে টাকা পায় তা নানাবিধ বৈধ উপায়ে খাটায়। আমাদের অক্ষয় চৌধুরি ভারী হুঁশিয়ার লোক। পুলিশ তার কাছে হার মেনেছে।

সে প্রকাশ্যে জহুরির কাজ করত। কিন্তু তার কোনও কোনও সম-ব্যবসায়ীর বিশ্বাস ছিল, অক্ষয়ের কারবার নাকি চোরাই পাথর নিয়ে। তবে এ হচ্ছে সন্দেহমাত্র। কেউ তাকে হাতেনাতে ধরতে পারেনি। কাজেই অক্ষয়ের হাসিখুসি অম্লানই আছে আজ পর্যন্ত।

সুবিধা পেলেই সে চোরাই হিরা-পান্না-মুক্তা নিয়ে কাজ গোছাতে ভোলে না।

গল্পের আরম্ভেই দেখতে পাবেন, অতি গুণধর অক্ষয় সান্ধ্যবায়ু সেবন করছে বাড়ির সামনেকার বাগানে।

এটি একটি গ্রামের বাড়ি। গ্রামের আসল নাম বলব না, আমরা চাঁদনগর নামেই ডাকব। এখান থেকে কলকাতা খুব বেশি দূরে নয়।

বাড়িতে অক্ষয় আজ একলা। রামচরণ ভিন গাঁয়ে কী কাজে গেছে, ফিরবে বেশি রাতে। অক্ষয়কে যখন তখন হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে যেতে হত, তাই সে বাড়ির সদরের চাবি করেছিল দুটি। একটি থাকত তার নিজের কাছে, আর একটি থাকত রামচরণের জিম্মায়। যে যখন আসত, তার নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাড়ির ভিতরে ঢুকত। আজও রামচরণ জেনেই গিয়েছে যে, রাত্রে বাড়িতে এসে সে তার মনিবকে দেখতে পাবে না। অক্ষয়কে খানিক পরেই কলকাতায় যেতে হবে। উদ্দেশ্য, খানকয় ছোটো-বড়ো হিরা বেচা। সেগুলি চোরাই বলে অক্ষয়ের মানহানি করব না। কিন্তু সে হিরাগুলি কোথায় আছে জানেন? তার জুতার গোড়ালির ভিতরে!

অবাক হবার কিছুই নেই। অক্ষয়ের একপাটি জুতার গোড়ালি হচ্ছে দেরাজের পুঁচকে সংস্করণ। কৌশলে টানলে তার একটি অংশ 'টানা'র মতন বেরিয়ে আসে। এই উপায়ে পকেটকাটার ও পুলিশের অন্যায় কৌতূহল জব্দ হয়।

সন্ধ্যা। বাতাসে বন্য গন্ধ, অন্ধকারের গায়ে চুমকির মতন জোনাকি। চারিদিক নিঃসাড়। অক্ষয় বাইরে যাবার পোশাক পরেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখনও ট্রেনের সময় হয়নি।

হঠাৎ অদূরে রাস্তায় জাগল কার পায়ের শব্দ।

অক্ষয় ভাবতে লাগল। কোনও অতিথি আসছে নাকি? কিন্তু তার বাড়িতে অতিথি আসে তো কালেভদ্রে!......এখানে কাছাকাছি অন্য কারুর বাড়ি নেই। তার বাড়ির পরেই হচ্ছে পোড়োজমি—একটা অর্ধনির্মিত রাস্তা শেষ হয়েছে সেখানে গিয়েই। এ নতুন পথে তো গাঁয়ের লোক আসে না!

বাগানে ঢোকবার মুখেই ছিল একটি বেড়া। কৌতূহলী অক্ষয় তার উপরে ঝুঁকে ভর দিয়ে অন্ধকারের ভিতরে চোখ চালাবার চেষ্টা করলে।

অন্ধকারের বুকে জ্বলল একটা দেশলাইয়ের কাঠি, দেখা গেল একখানা মুখ, অস্পষ্ট দেহ। আগন্তুক সিগারেট ধরাচ্ছে।

অক্ষয় শুধোলে, 'কে?'

আগন্তুক এগিয়ে এল। কাছে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলে, 'এই পথ দিয়ে কি মানিকপুর জংশনে যাওয়া যায়?'

অক্ষয় ইংরেজিতে বললে, 'না; স্টেশনে যাবার অন্য রাস্তা আছে।'

—'আবার অন্য রাস্তা! রক্ষে করুন মশাই, যথেষ্ট হয়েছে! কে এক বোকা আমায় এমন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে, ঘুরে ঘুরে পায়ের নাড়ি ছিঁড়ে গেল।'

—'মশাইয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

—'কলকাতা থেকে এসেছিলুম এখানকার জমিদারবাড়িতে। যাব আবার কলকাতায়। এখন পথ হারিয়ে অন্ধের মতন ঘুরে মরছি। একে আমি চোখে খাটো, তায় এই অন্ধকার। আর পারি না!'

—'আপনি ক-টার ট্রেন ধরতে চান?'

—'সাড়ে আটটার।'

—'তাই নাকি? আমিও ওই ট্রেনে আজ কলকাতায় যাব। কিন্তু এখন সবে সাতটা, আমি আটটা পনেরোর আগে বাড়ি থেকে বেরুব না। আপনি যদি আমার বৈঠকখানায় এসে খানিকক্ষণ বসেন, তাহলে আমরা একসঙ্গেই স্টেশনে যেতে পারি। স্টেশন এখান থেকে আধ মাইলের বেশি হবে না।'

মুখখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে চশমাপরা চোখে বাড়ির দিকে তাকিয়ে আগন্তুক কৃতজ্ঞকণ্ঠে বললে, 'ধন্যবাদ মশাই, ধন্যবাদ!'

অক্ষয় বেড়ার দরজা খুলে দিলে। আগন্তুক একটু ইতস্তত ভাব দেখালে। তারপর মুখের আধপোড়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে।

॥ দ্বিতীয় ॥

বৈঠকখানা অন্ধকার ছিল। অক্ষয় কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো একটা ল্যাম্পে অগ্নিসংযোগ করলে। এতক্ষণ পরে দুজনেরই দুজনকে ভালো করে দেখবার সুবিধা হল।

অক্ষয় সচমকে নিজের মনে মনে বললে, 'ও হরি, এ যে দেখছি জহুরি মণিলাল বুলাভাই! হুঁ, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমাকে চেনে না।'

প্রকাশ্যে বললে, 'বসুন মশাই, আরাম করে বসুন! অনেক হাঁটাহাঁটি করেছেন, একটু চা-টা ইচ্ছা করেন?'

মণিলাল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। তার পরনে কোট-পেন্টুলুন। মাথায় ধূসর রঙের নেমদার টুপি—অর্থাৎ ফেল্ট হ্যাট। সে টুপিটা ঘরের কোণে একখানা চেয়ারের উপরে রাখলে এবং হাতের ছোটো ব্যাগটা রাখলে একটা টেবিলের উপরে। ছাতাটাও তার গায়ে ঠেসিয়ে দাঁড় করিয়ে সোফার উপরে বসে পড়ল।

বৈঠকখানার একপাশে রান্নাঘর। উনুনে আগুন ছিল। চায়ের জল গরম করতে দেরি লাগল না। চা তৈরি করে অক্ষয় আবার বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। চায়ের 'ট্রে'-খানা টেবিলের উপরে রাখলে। একখানা থালায় দুটি রসগোল্লা ও আর একখানা থালায় খান-দুই 'ক্রিম ক্র্যাকার' বিস্কুট দিতেও ভুললে না।

একটি তারা-কাটা দামি কাচের গেলাসে জল ঢেলে বললে, 'কিছু মনে করবেন না, বাড়িতে আপাতত আর কিছু খাবার খুঁজে পেলুম না।'

মণিলাল বললে, 'সঙ্কোচের কারণ নেই। যে-দুটি খাবার দিয়েছেন, ও-দুটিই আমি ভালোবাসি'—বলেই একটি রসগোল্লা তুলে মুখের ভিতর ফেলে দিলে।

মণিলাল যে কেন জমিদারবাড়িতে গিয়েছিল, একথা জানবার জন্যে অক্ষয়ের মনে আগ্রহ হল। কিন্তু অক্ষয় এ সম্বন্ধে তাকে সরাসরি কোনও প্রশ্ন করতে ভরসা পেলে না এবং মণিলালও প্রায় নীরবেই নিজের চা ও খাবার নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইল।

অক্ষয় ভাবতে লাগল, মণিলাল বুলাভাই হচ্ছে একজন নামজাদা জহুরি। সে যখন নিজে জমিদারবাড়িতে এসেছে তখন কাজটা নিশ্চয়ই জরুরি।

কিন্তু কীরকম জরুরি...? হুঁ, বোঝা গেছে।

দিন দশ পরে জমিদারের একমাত্র মেয়ের বিয়ে! এত বড়ো ডাকসাইটে জমিদারের একমাত্র মেয়ের বিয়ে, না জানি কত হাজার টাকার জড়োয়া গহনা যৌতুক দেওয়া হবে। মণিলাল নিশ্চয়ই রাশি রাশি হিরা-চুনি-পান্নার নমুনা নিয়ে এসেছে। ওর জামার আর ওই ব্যাগের ভিতরে খুঁজলে পাওয়া যাবে হয়তো লক্ষপতির ঐশ্বর্য!

অক্ষয় ছিঁচকে চোর নয়। তার মূলমন্ত্র—মারি তো হাতি, লুটিতো ভাণ্ডার! সোনা-দানা সে অপছন্দ করে না বটে, কিন্তু হিরা-পান্নার দিকেই ঝোঁক তার বেশি। হিরা-পান্না বড়ো ভালো জিনিস; ভারী নয়, মস্ত নয়, হাতের মুঠার ভিতরে লুকিয়ে রাখা যায় দস্তুর মতন সাত-রাজার ধন!

অক্ষয় ভাবতে লাগল, মণিলালের কাছে কত টাকার পাথর আছে?

মণিলাল বললে, 'আজ ভারী শীত পড়েছে।'

অক্ষয় বললে, 'হ্যাঁ বড্ড।' তারপর আবার ভাবতে লাগল, 'কত টাকার পাথর আছে? পাঁচ হাজার? দশ হাজার?......উঁহু, তার চেয়েও বেশি! জমিদার যত টাকার পাথর কিনবেন, তাঁকে দেখাবার জন্য মণিলাল নিশ্চয়ই তার চেয়ে ঢের বেশি টাকার জিনিস এনেছে। নইলে ও নিজে আসত না। ওর কাছে বোধহয় পঞ্চাশ হাজার টাকার পাথর আছে!'

অক্ষয় কেমন অস্থির হয়ে উঠল। নিজের অস্থিরতা ঢাকবার জন্যে বললে, 'আপনি ফুলের বাগান ভালোবাসেন?'

মণিলাল শুষ্ক স্বরে বললে, 'মাঝে মাঝে পার্কে হাওয়া খেতে যাই। আমি কলকাতায় থাকি কিনা?'

আবার সে বোবা। এইটেই স্বাভাবিক। অক্ষয় বুঝলে, মণিলাল বেশি কথা কইতে নারাজ, হাজার হাজার টাকার সম্পত্তি যার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, মুখরতা তার সাজে না। ....ধরলুম ওর কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকার পাথর আছে। পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ আধ লক্ষ টাকা! ও-টাকায় কোম্পানির কাগজ কিনলে মাসে কত টাকা আয় হয়? তার সঙ্গে যদি

আমার জমানো টাকা যোগ করি—তাহলে? ওঃ, তাহলে আর আমাকে চুরি-চামারি করতে হয় না—সারাজীবন পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে বসে খেতে পারি।

অক্ষয় একবার আড়চোখে মণিলালের দিকে তাকিয়ে চট করে আবার নজর ফিরিয়ে নিলে। তার মনের ভিতরে জেগে উঠছে একটা বিশ্রী ভাব—একে দমন করতেই হবে! আমি চুরি করি বটে কিন্তু খুন? না, না, এ হচ্ছে ভয়াবহ পাগলামি! ......হ্যাঁ, একবার শ্যামবাজারের একটা পাহারাওয়ালাকে ছোরা মারতে হয়েছিল বটে, কিন্তু সে তো হচ্ছে তার নিজেরই দোষ! তারপর হাটখোলার সেই বুড়োটা! তার মুখবন্ধ না করলে উপায় ছিল না, আমাকে দেখে সে যা ষাঁড়ের মতন চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল! এ-দুটো হচ্ছে দৈব-দুর্ঘটনা—ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে কাজ করতে হয়েছিল। এজন্যে আমি নিজেও কম দুঃখিত নই। কিন্তু স্বেচ্ছায় নরহত্যা! খুন করে টাকা কেড়ে নেওয়া! উন্মত্ত না হলে এমন কাজ কেউ করে!......

তবে এ-কথাও ঠিক, আমি যদি খুনি হতুম, এমন সুযোগ আর পেতুম না। এত টাকার সম্পত্তি, খালি বাড়ি, পল্লির বাইরে নির্জন ঠাঁই, রাত্রিবেলা, ঘুটঘুটে অন্ধকার......

কিন্তু এই লাশটা! খুনের পরে যত মুশকিল বাধে এই লাশ নিয়ে। লাশের গতি করা বড়ো দায়—

এমনি সময়ে হঠাৎ একখানা চলন্ত রেলগাড়ির শব্দ শোনা গেল। বাড়ির পিছনকার পোড়োজমির ওপাশ দিয়ে লাইন যেখানে মোড় ফিরে গিয়েছে, গাড়ি আসছে সেইখান দিয়ে।

অক্ষয়ের মাথার ভিতর দিয়ে ধাঁ করে একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল। সেই চিন্তা সূত্র ধরে তার মন হল অগ্রসর এবং তার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল মণিলালের দিকে—সে নিজের মনেই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

অক্ষয়ের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি উঠে মণিলালের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দেয়ালের বড়ো ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মন যেন বললে—অক্ষয়, শিগগির বাড়ির বাইরে পালিয়ে যাও!

যদিও অক্ষয়ের দেহ হয়ে উঠেছিল তখন উত্তপ্ত, তবু তার বুকের ভিতরে জাগল যেন শীতের কাঁপন! মাথা ঘুরিয়ে দরজার পানে তাকিয়ে সে বললে, 'কী কনকনে হাওয়া! আমি কি ভালো করে দরজা বন্ধ করে দিইনি?' এগিয়ে গিয়ে দু-হাট করে দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারলে। তার ইচ্ছা হল দৌড়ে খোলা বাতাসের কোলে গিয়ে পড়ে, একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়, এই আকস্মিক খ্যাপামির কবল থেকে মুক্তিলাভ করে।

বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে বললে, 'এইবার স্টেশনের দিকে পা চালালে কেমন হয়, তাই ভাবছি।'

মণিলাল চায়ের শূন্য পেয়ালাটা রেখে দিয়ে মুখ তুলে বললে, 'আপনার ঘড়ি কি ঠিক?'

অক্ষয় যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাড় নেড়ে জানালে, হাঁ।

মণিলাল বললে, 'স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগবে?'

—'বড়ো জোর দশ মিনিট।'

—'এই তো সবে সাতটা-বিশ! এখনও এক ঘণ্টারও বেশি সময় আছে। বাইরের ঠান্ডা অন্ধকারের চেয়ে এ ঘর ঢের ভালো। মিছে তাড়াতাড়ি করবার দরকার আছে কি?'

—'কিছু না, কিছু না।'—অক্ষয়ের কণ্ঠস্বর খানিক খুশি, খানিক বিষাদমাখা। আরও খানিকক্ষণ সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল—কালো রাত্রির মধ্যে দুই চোখ ডুবিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো। তারপর দরজা বন্ধ করে দিলে, নিঃশব্দে।

তারপর সে নিজের চেয়ারে বসে বাক্যব্যয়ে নারাজ মণিলালের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার কথাগুলো হল কেমন যেন বাধো-বাধো অসংলগ্ন! সে অনুভব করলে তার মুখ যেন ক্রমেই তপ্ত, তার মস্তিষ্ক যেন ক্রমেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং তার কান যেন করছে ভোঁ ভোঁ! তার চোখ যেন কী এক ভয়াবহ একাগ্রতার সঙ্গে মণিলালের দিকে নজর দিতে চায়! প্রাণপণে সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালে বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আরও ভয়ানক ভাবে আবার তার দিকেই তাকাতে বাধ্য হল এবং তার মনের ভিতরে কেবল এই প্রশ্নই চলা-ফেরা করতে লাগল—এমন অবস্থায় পড়লে অন্য কোনও খুনি কী করত, কী করত, কী করত? ......দেখতে দেখতে সে ধীরে ধীরে প্রত্যেক দিক থেকে নিজের ভীষণ সংকল্পকে পরিপূর্ণ করে তুললে—কোনও দিকেই কোনও ছিদ্র রাখলে না।

তার মনে জাগল অস্বস্তি। মণিলালের দিকে খর-নজর রেখেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পকেটে যার অতুল ঐশ্বর্য তার সুমুখে সে আর বসে থাকতে পারলে না। সভয়ে অনুভব করলে, তার মনের ঝোঁকটা ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে। এখানে বসে থাকলে সে হঠাৎ নিজের উপরে সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলবে এবং তারপর—

তারপর যা হতে পারে সেটা ভাবতেই অক্ষয়ের সমস্ত শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল, কিন্তু সেইসঙ্গে রত্নের পুঁজি হাতাবার জন্যে তার হাত যেন নিশপিশ করতেও লাগল।

হাজার হোক, অক্ষয় অপরাধী ছাড়া কিছুই নয়। এইসব কাজেই অভ্যস্ত। সে হচ্ছে শিকারি বাঘ! সৎপথে কোনও দিন অর্থোপার্জন করেনি—তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে হিংস্র। সুতরাং এমন সহজলভ্য ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করবার প্রবৃত্তি তার হতেই পারে না। এত হিরা-পান্না তার হাতের কাছে এসেও হাত ছাড়িয়ে যাবে, এই সম্ভাবনা অক্ষয়ের চিত্তকে ক্রমেই বেপরোয়া করে তুলতে লাগল।

এই বিষম লোভের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে সে আর একবার শেষ চেষ্টা করবে স্থির করলে, যতক্ষণ না ট্রেনের সময় আসে ততক্ষণ মণিলালের সামনে থাকবে না।

অক্ষয় বললে, 'মশাই, আমি জামা-জুতো-কাপড় বদলে আসি। যেরকম ঠান্ডা পড়েছে, এ পোশাকে বাইরে যাওয়া উচিত নয়।'

মণিলাল বললে, 'নিশ্চয়ই নয়। অসুখ হতে পারে।'

বৈঠকখানার একপাশে ছিল দালান, ঘর থেকে বেরিয়ে অক্ষয় সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। তার জামা-কাপড় বদলাবার দরকার নেই—ওটা বাজে ওজর মাত্র। তবু সে আনলার কাছে গিয়ে অকারণেই পোশাক পরিবর্তনে নিযুক্ত হল। ভাবলে, এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাকি সময়টা কাটিয়ে দেবে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে—আশ্বস্তির! ওঃ, ও-ঘর হচ্ছে অভিশপ্ত—ওখানকার বাতাস বিষাক্ত। ওখান থেকে পালিয়ে এসে বাঁচলুম—নইলে এখনই হয়তো কী করতে গিয়ে কী করে ফেলতুম! এখানে থাকলে প্রলোভন আর আমাকে আক্রমণ করতে পারবে না।

॥ তৃতীয় ॥

এখানে থাকলে হয়তো প্রলোভন আর আমাকে আক্রমণ করতে পারবে না—হয়তো সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে মণিলাল নিজেই চলে যাবে! হ্যাঁ, সে একলা চলে গেলেই আমি খুশি হই, তাহলে সমস্ত আপদই চুকে যায়—অন্তত এই ভীষণ সুযোগ বা সম্ভাবনার দায় থেকে আমি রেহাই পাই—আর ওই হিরা-পান্নাগুলো—

একজোড়া নতুন জুতো পরতে পরতে অক্ষয় ধীরে ধীরে মাথা তুললে......

খোলা দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে মণিলাল। কাগজ আর তামাক দিয়ে আপন মনে সে নতুন সিগারেট পাকাচ্ছে।

অক্ষয় আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তার জুতো পরা আর হল না। মণিলালের পৃষ্ঠদেশের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে স্থির হয়ে রইল সে মূর্তির মতো। তারপর দৃষ্টি না ফিরিয়েই পা থেকে জুতোজোড়া খুলে ফেললে!

মণিলাল নিশ্চিন্তভাবে সিগারেট পাকিয়ে তামাকের রবারের থলিটা পকেটের ভিতরে রেখে দিলে। তারপর জামার উপর থেকে তামাকের গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলে দেশলাই বার করলে।

আচম্বিতে কী এক প্রবল ঝোঁকের তাড়নায় অক্ষয় চট করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং চোরের মতন গুড়ি মেরে পা টিপে টিপে বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তার পায়ে এখন জুতো নেই, কোনও শব্দ হল না। বিড়ালের মতন চুপিচুপি সে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। তার মুখ চকচকে, তার দুই চক্ষু উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত এবং নিজের কানে সে শুনতে পেলে ধমনির রক্ত-চলাচল-ধ্বনি!

মণিলাল দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালে এবং তারপর ধূমপান করতে লাগল।

ধাপে ধাপে নিঃশব্দে এগিয়ে অক্ষয় গিয়ে দাঁড়াল একেবারে মণিলালের চেয়ারের পিছনে। পাছে তার নিশ্বাস মণিলালের মাথার উপরে গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিলে। ...এইভাবে কেটে গেল আধ মিনিট! সে যেন সাক্ষাৎ হত্যার মূর্তি—বলির জীবের দিকে তাকিয়ে আছে ভয়াল প্রদীপ্ত চক্ষে, উন্মুক্ত মুখবিবর দিয়ে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে নীরবে, দুই হাতের আঙুলগুলো যেন ধড়ফড় করছে বহুমুখ সর্পের মতো।

তারপর আবার তেমনি নিঃশব্দেই অক্ষয় ফিরে গেল দালানের দিকে। একটা গভীর নিশ্বাস ফেললে। একটু হলেই হয়েছিল আর কী! মণিলালের জীবন ঝুলছিল একগাছা সরু সুতোর ডগায়। সত্যিকথা বলতে কী, আমি যখন চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, তখন যদি আমার হাতে কোনও অস্ত্র থাকত,—এমনকি একটা হাতুড়ি বা একখানা পাথর—

হঠাৎ অক্ষয়ের চোখ পড়ল দালানের কোণে। সেখানে দেওয়ালের কোণে দাঁড় করানো রয়েছে একটা লোহার গরাদে। বাড়ির জানলা থেকে এটা কবে খুলে পড়েছিল, ভৃত্য রামচরণ এখানে এনে রেখেছিল? ......'এক মিনিট আগে এইটেই যদি আমার হাতে থাকত!'

অক্ষয় লোহাগাছা তুলে নিলে। হাতের উপরে রেখে তার ভার পরীক্ষা করলে। 'হুঁ, এটা হচ্ছে দস্তুর মতো অস্ত্র, ব্যবহার করবার সময় বন্দুক বা রিভলভারের মতন চিৎকার করে পাড়া জাগায় না! আমার কার্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট! ......কিন্তু না, না, এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো ভালো নয়। এটাকে যথাস্থানে রেখে দেওয়াই উচিত!'

কিন্তু লোহার ডান্ডা সে রেখে দিলে না। উঁকি মেরে দেখলে মণিলাল তখনও সেইভাবে বসেই সিগারেট টানছে।

আবার অক্ষয়ের ভাব-পরিবর্তন হল! আবার তার মুখ হয়ে উঠল রাঙা-টকটকে ও ভ্রুকুটি-কুটিল এবং গলার উপরে ফুলে উঠল একটা শিরা এবং পায়ে পায়ে আবার সে এগিয়ে এল বৈঠকখানার ভিতরে।

মণিলালের চেয়ার থেকে কিছু তফাতে দাঁড়িয়ে সে মাথার উপরে তুললে লোহার ডান্ডা। একটা অস্পষ্ট শব্দ হল। ডান্ডাটা যখন নীচে নামছে, মণিলাল হঠাৎ ফিরে দেখলে। তাইতেই অক্ষয়ের লক্ষ্য আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল—ডান্ডাটা মণিলালের মাথার উপরে না পড়ে একপাশ ঘেঁসে নেমে গেল, একটা অপেক্ষাকৃত সামান্য রকম আঘাত দিয়ে।

ভয়ার্ত বিকট চিৎকার করে মণিলাল লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং প্রাণপণে চেপে ধরল অক্ষয়ের দুই হাত।

তারপর আরম্ভ হল বিষম ধস্তাধস্তি! দুজনেই দুজনকে চেপে ধরলে সাংঘাতিক আলিঙ্গনে এবং দুজনেই কখনও দুলতে থাকে এপাশে-ওপাশে, কখনও এগিয়ে বা কখনও পিছিয়ে

যায়! চেয়ার পড়ল উলটে, টেবিলের উপর থেকে ঠিকরে পড়ল একটা কাচের গেলাস, মণিলালের চশমারও হল সেই দশা, দুজনের পায়ের চাপে গেলাস ও চশমা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

এবং তারপরেও আরও বার-তিনেক জাগল মণিলালের সেই বিকট চিৎকার—বিদীর্ণ করে রাত্রির স্তব্ধতা! সেই উন্মাদগ্রস্ত অবস্থাতেও অক্ষয়ের বুক আতঙ্কে শিউরে উঠল। যদি কোনও পথিক দৈবগতিকে এদিকে এসে পড়ে, যদি সে শুনতে পায়?

নিজের দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে অক্ষয় তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠেলে নিয়ে টেবিলের উপর ফেলে চেপে ধরলে এবং টেবিলের আচ্ছাদনের এক অংশ তুলে পুরে দিলে তার মুখের ভিতরে। এইভাবে তারা নিশ্চল হয়ে রইল পূর্ণ দুই মিনিট ধরে—সে এক ভয়াবহ নাটকীয় দৃশ্য!

দেখতে দেখতে মণিলালের দেহ পড়ল এলিয়ে, ক্রমে ক্রমে তার মাংসপেশির সমস্ত স্পন্দন থেমে গেল। তখন অক্ষয় তাকে ছেড়ে দিলে, মণিলালের জীবনহীন দেহটা মাটির উপরে এলিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

যা হবার তা হয়ে গেল। এতক্ষণ যে সম্ভাবনাকে অক্ষয় ভয় করছিল, তা পরিণত হল নিশ্চিত সত্যে! যাক, এ বিষয় নিয়ে আর অনুতাপ করা মিথ্যা! অনুতাপের দ্বারা মড়াকে আর করা যাবে না জীবন্ত।

॥ চতুর্থ ॥

অক্ষয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। শীতকালেও সে ঘেমে উঠেছে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ঘড়ির দিকে তাকালে।

সবে সাড়ে সাতটা!

এই ক-মিনিটের মধ্যে এতবড়ো কাণ্ড ঘটে গেল! এতক্ষণ প্রত্যেক মিনিটই ছিল যেন এক ঘণ্টার মতন দীর্ঘ।

সাড়ে সাতটা! ট্রেন আসবে সাড়ে আটটায়, হাতে সময় আছে আর একঘণ্টা! এর মধ্যেই বাকি সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তা এক ঘণ্টা সময় নিতান্ত অল্প নয়।

অক্ষয়ের ভাবভঙ্গি এখন শান্ত। তার একমাত্র দুর্ভাবনা, মণিলালের চিৎকার কেউ শুনতে পেয়েছে কি না! কেউ যদি না শুনে থাকে, তাহলে তাকে আর পায় কে!

সে হেঁট হয়ে মৃতব্যক্তির দাঁতের ভিতর থেটে টেবলক্লথখানা আস্তে আস্তে টেনে বার করে নিলে। তারপর তার জামাকাপড় খুঁজতে আরম্ভ করলে। বেশিক্ষণ লাগল না যা খুঁজছিল তা পেতে।

একটি ছোট্ট চামড়ার বাক্সের ভিতরে আলাদা আলাদা কাগজের মোড়কে রয়েছে হিরা, চুনি, পান্না ও মুক্তা প্রভৃতি অনেক দামি জিনিস। তাহলে তার শ্রম সার্থক! মানুষের প্রাণবধ করেছে বলে তার মনে আর কোনও রকম অনুশোচনার সঞ্চার হল না। বরং নিজেই নিজেকে দিতে লাগল অভিনন্দন।

তারপর সে সুপটু হাতে কর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত হল। টেবলক্লথের উপরে পড়েছিল কয়েক ফোঁটা রক্ত। লাশের মাথার তলায় কার্পেটেরও উপরে লেগেছে রক্তের ছোপ। জল ও ন্যাকড়া এনে সে আগে সাবধানে রক্ত চিহ্নগুলো ধুয়ে-মুছে ফেললে। তারপর লাশের মাথার তলায় একখানা খবরের কাগজ রেখে দিলে—নূতন রক্ত লেগে যাতে আর কার্পেট কলঙ্কিত না হয়।

তারপর টেবিল-কাপড়খানা আবার টেবিলের উপরে পেতে দিলে, উলটানো চেয়ারখানা দাঁড় করিয়ে দিলে সোজা করে।

কার্পেটের উপরে পড়েছিল একটা পায়ের চাপে চ্যাপটা সিগারেটের ধ্বংসাবশেষ ও একটা দেশলাইয়ের কাঠি। সে দুটো তুলে ছুড়ে দালানের দিকে ফেলে দিলে। কার্পেটের উপরে একরাশ কাচের গুঁড়ো পড়েছিল। সেই তারা-মার্কা গেলাসের ও মণিলালের চশমার ভাঙা কাচ। সেগুলো তুলে আগে সে একখানা কাগজের উপরে জড়ো করলে। তারপর যতদূর সম্ভব যত্ন করে বেছে বেছে চশমা-ভাঙা কাচের টুকরোগুলো আর একখানা কাগজের উপরে তুলে রাখলে। চশমার ফ্রেম ও কাচের চূর্ণগুলো মোড়কে পুরে রাখলে নিজের পকেটের ভিতরে। যেগুলোকে গেলাসের ভাঙা কাচ বলে মনে হল, সেগুলো কাগজে করে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির খিড়কির দিকে গেল। সেখানে একটা আস্তাকুঁড় ছিল—কাগজে-মোড়া কাচগুলো তার ভিতরে ফেলে দিয়ে আবার ফিরে এল।

এইবারে আসল কাজ। টেবিলের টানার ভিতর থেকে সে একটা ফিতার কাঠিম বার করলে। খানিকটা ফিতা ছিঁড়ে নিয়ে মৃতের ছাতা ও ব্যাগটা বেঁধে নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখলে, তারপর ভূমিতল থেকে মৃতব্যক্তিকে টেনে তুললে আর এক কাঁধের উপরে। মণিলাল ছোটোখাটো মানুষ, তার দেহও ভারী নয় এবং অক্ষয় হচ্ছে দীর্ঘদেহ হৃষ্টপুষ্ট বলবান ব্যক্তি—সুতরাং তার পক্ষে বড়োজোর একমন পনেরো বা বিশ সের ওজনের একটা দেহের ভার বহন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়।

শীতার্ত অন্ধ রাত্রি—চারিদিক নিঝুম।

অক্ষয় খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পোড়োজমির উপরে গিয়ে পড়ল। কুয়াশায় অন্ধকারকে যেন আরও ঘন করে তুলেছে—চোখ চেয়েও কিছু দেখা যায় না।

অক্ষয় খানিকক্ষণ কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। একটা ভীত শিয়াল বা কুকুরের দ্রুত পদশব্দ ছাড়া আর জন-প্রাণীর সাড়া পাওয়া গেল না।

অক্ষয় তখন দৃঢ়পদে অগ্রসর হল। পোড়োজমিটা এবড়ো-খেবড়ো ও কাঁকর ভরা হলেও

আঁধার রাতে তার খুব অসুবিধা হল না—কারণ এ মাঠ তার বিশেষ পরিচিত।

ঘাসের উপর তার পায়ের শব্দ হচ্ছিল না বটে, কিন্তু সেই সূচীভেদ্য স্তব্ধতার মধ্যে তার কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো আর ছাতা পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে তুলছিল একটা বিরক্তিজনক আওয়াজ। মণিলালের দোদুল্যমান মৃতদেহের চেয়ে সেই ব্যাগ ও ছাতাকে সামলাবার জন্য অক্ষয়কে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল।

এই পোড়োজমির পাশেই রেললাইন। সাধারণত জমিটুকু পার হতে তিন-চার মিনিটের বেশি সময় লাগে না। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে পিঠে একটা মড়া নিয়ে অতি সাবধানে চারিদিকে চোখ ও কান রেখে, চলতে চলতে মাঝে মাঝে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে আবার অগ্রসর হতে গিয়ে অক্ষয়ের প্রায় আট-নয় মিনিট লাগল।

তারপর পাওয়া গেল রেললাইনের তারের বেড়া। আবার সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি খুঁজতে লাগল কোনও জীবন্ত ছায়া, তার কান খুঁজতে লাগল কোনও জীবনের সাড়া! কিছু নেই। খালি অন্ধকার, খালি নীরবতা।

হঠাৎ দূর থেকে জেগে উঠল চলন্ত রেলগাড়ির চাকার গড় গড় আওয়াজ—তারপর অতিতীব্র বাঁশির চিৎকার!

অক্ষয় সজাগ হয়ে উঠল—আর দেরি নয়! সে তাড়াতাড়ি তারের বেড়া পার হল। তারপর যেখানটায় লাইন বেঁকে মোড় ফিরেছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। লাশটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটির উপরে এমনভাবে উপুড় করে রাখলে, যাতে দেহের কণ্ঠদেশটা পড়ে ঠিক লাইনের উপরে।

তারপর সে পকেট থেকে ছুরি বার করে ছাতা ও ব্যাগের ফিতা কেটে ফেললে। ছাতা ও ব্যাগটাকে রাখলে ঠিক লাশের পাশে। সযত্নে ফিতাটাকে আবার পকেটে পুরলে, লাইনের কাছে পড়ে রইল কেবল ফিতার ফাঁশটুকু। সেটা তার চোখ এড়িয়ে গেল।

গাড়ির শব্দ কাছে এগিয়ে এসেছে। এ খানা নিশ্চয়ই মালগাড়ি।

অক্ষয় শীঘ্রহস্তে পকেট থেকে কাগজের মোড়কটাকে বার করলে। চশমার তোবড়ানো 'ফ্রেম'টা রেখে দিলে মৃতের মাথার পাশে। এবং কাচের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিলে তারই চতুর্দিকে!

ইঞ্জিনের ধূম্র-উদ্‌গিরণের ভোঁস ভোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে অতি নিকটে! অক্ষয়ের ইচ্ছা হল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। স্বচক্ষে দেখে যায়, যবনিকা পতনের পূর্বে এই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যটা—কেমন করে নরহত্যা পরিণত হয় আত্মহত্যায় বা দৈব দুর্ঘটনায়।

কিন্তু না, এখানে তার উপস্থিতি নিরাপদ নয়। তাহলে হয়তো অদৃশ্য হবার আগে কেউ তাকে দেখে ফেলবে। চটপট সে আবার বেড়া পার হল, দ্রুতপদে পোড়োজমির উপর দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে ফিরতে লাগল—পিছনে যথাস্থানে আগতপ্রায় রেলগাড়ির বজ্রধ্বনি শুনতে শুনতে।

রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে!

শ্বাস রুদ্ধ করে ভূপ্রোথিত মূর্তির মতন স্তম্ভিত হয়ে অক্ষয় দাঁড়িয়ে পড়ল—মুহূর্তের জন্যে। তারপর সে প্রায় দৌড়ে নিজের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। নীরবে দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলে।

সে ভয় পেয়েছে। ব্যাপার কী? গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল কেন? নিশ্চয়ই লাশটা আবিষ্কৃত হয়েছে!

কিন্তু এখন কী হচ্ছে ওখানে? ওরা কি তার বাড়িতে আসবে? রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। হয়তো এখনই কেউ এসে তার দরজার কড়া নাড়বে।

বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ে সে ব্যস্তভাবে তাকিয়ে দেখলে চারিদিকে। সমস্তই বেশ গোছালো।

কিন্তু লোহার ডান্ডাটা এখনও ঘরের মেঝেয় পড়ে আছে।

সে ডান্ডাটা তুলে নিয়ে ল্যাম্পের আলোয় পরীক্ষা করে দেখলে। তার উপরে কোনও রক্তের দাগ নেই। কেবল দুই-এক গাছা চুল লেগে আছে।

রেলগাড়ির ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কের মতন সে টেবিল-কাপড় দিয়ে ডান্ডাটা একবার মুছে ফেললে।

সেটাকে নিয়ে আবার বাড়ির পিছন দিকে দৌড়ে গেল। পাঁচিলের উপর দিয়ে ডান্ডাটাকে ছুড়ে ফেলে দিলে—সেটা পড়ল গিয়ে পোড়োজমির বিছুটির ঝোপের ভিতরে।

ডান্ডাটার ভিতরে তাকে ধরিয়ে দেবার মতন কোনও প্রমাণ ছিল না। কিন্তু সেটাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে বলেই অক্ষয়ের চক্ষে তা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল।

সে বুঝলে, এইবার তার স্টেশনের দিকে যাত্রা করা উচিত। যদিও এখনও গাড়ির সময় হয়নি তবু আর বাড়ির ভিতরে থাকতে তার ভরসা হল না। সে চায় না, এখানে এসে কেউ তাকে দেখতে পায়।

অক্ষয় তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুবার আয়োজন সেরে নিলে। তারপর একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে পড়তে গেল।

কিন্তু আবার ফিরে এল, ল্যাম্পটা নিবিয়ে দেবার জন্যে।

আলো নেবাবার জন্যে হাত তুলেছে—হঠাৎ তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ঘরের একদিকে। কী সর্বনাশ!

॥ পঞ্চম ॥

মণিলালের টুপিটা তখনও পড়ে রয়েছে চেয়ারের উপরে!

তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে গেল—একেবারে আড়ষ্ট! সে মারাত্মক আতঙ্কে ঘেমে উঠল।

আর একটু হলেই তো সে আলো নিবিয়ে চলে যাচ্ছিল—পিছনে তার বিরুদ্ধে এত বড়ো প্রমাণ ফেলে রেখে! বাইরের কেউ যদি এসে এই টুপিটা এখানে দেখতে পেত, কী হত তাহলে?

চেয়ারের কাছে গিয়ে নেমদার টুপিটা তুলে নিয়ে সে তার ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত করে শিউরে উঠল!

টুপিটা না দেখে চলে গেলে কি আর রক্ষে ছিল? এখনই যদি কারা এসে পড়ে, তার হাতে বা ঘরে এই টুপিটা দেখতে পায়, তাহলে কেউ তাকে ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এই কথা ভেবেই সে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু দারুণ আতঙ্কে বুদ্ধি হারালে না।

রান্নাঘরের উনুনের কাছে ছুটে গিয়ে সে দেখলে, আগুন নিবে গেছে। তখনই কতকগুলো জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে এনে অক্ষয় আবার অগ্নি সৃষ্টি করলে। তারপর ছুরি দিয়ে টুপিটা খণ্ড খণ্ড করে কেটে সমর্পণ করলে আগুনের কবলে। তার হৃৎপিণ্ড তখনও যেন দুপ দুপ করে লাফিয়ে উঠছে। যদি কেউ এসে পড়ে—যদি কেউ এসে পড়ে! তার হাতের কাঁপুনি যেন আর থামতেই চায় না—এখনই এত সাবধানতা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল আর কী!

নেমদা বা ফেল্ট সহজে পোড়বার জিনিস নয়। টুপির খণ্ডগুলো ধিকি-ধিকি করে আস্তে আস্তে পুড়ে প্রচুর ধোঁয়ার জন্ম দিয়ে অঙ্গারের মতন হয়ে যাচ্ছে—সত্যিকার ভস্মে পরিণত হচ্ছে না। তার উপরে চুল-পোড়া গন্ধের সঙ্গে রজনের গন্ধ মেশানো এমন একটা বিষম দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল যে, অক্ষয় ভয় পেয়ে রান্নাঘরের জানলাগুলো খুলে দিতে বাধ্য হল।

তখনও সে কান পেতে শুনছে আর ভাবছে, বাইরে ওই বুঝি জাগল কার পদ-শব্দ, ওই বুঝি নড়ে ওঠে সদরের কড়া, ওই বুঝি আসে নিয়তির নিষ্ঠুর আহ্বান!

ওদিকে সময়ও আর নেই। সাড়ে আটটা বাজতে বাকি আর বিশ মিনিট মাত্র! আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে না পারলে ট্রেন ধরা অসম্ভব হবে!

আরও অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলে, টুপির খণ্ডগুলোকে আর চেনা যায় না। তখন সে একটা লোহার শিক নিয়ে অঙ্গারগুলোর উপরে সজোরে আঘাত করতে লাগল। পোড়া কাঠ ও কয়লার সঙ্গে টুপির দগ্ধাবশেষ নেড়ে নেড়ে এমন করে মিশিয়ে দিলে যে, সন্দেহজনক কোনও কিছু চোখে পড়বার উপায় আর রইল না। এমনকি ভৃত্য রামচরণ পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। খুব সম্ভব সে যখন ফিরে আসবে অঙ্গার তখন ভস্মে পরিণত হবে। অক্ষয় ভালো করেই দেখে নিয়েছে, টুপির মধ্যে ধাতু দিয়ে তৈরি এমন কোনও বস্তু নেই, আগুনের কবলেও যা নষ্ট হবার নয়।

আবার সে ব্যাগ তুলে নিলে, আবার সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে বৈঠকখানার চতুর্দিক পরীক্ষা

করলে, তারপর ঘর ছেড়ে বাড়ির বাইরে গেল। সদর দরজার কুলুপে চাবি লাগালে। তারপর হনহন করে চলল স্টেশনের দিকে।

কিন্তু এবার সে ভুলে গেল, বৈঠকখানার আলো নিবিয়ে দিতে!

ট্রেন আসবার আগেই অক্ষয় স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোল। টিকিট কিনলে। তারপর যেন নিশ্চিন্ত ভাবেই প্ল্যাটফর্মের উপরে পায়চারি করতে লাগল।

সে আড়-চোখে বেশ লক্ষ করলে, এখনও ট্রেনের সিগন্যাল দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু চারিদিকেই যেন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে! যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে গিয়ে দলবেঁধে রেললাইনের একদিকেই দূরে তাকিয়ে আছে।

সঙ্কোচ ভরা কৌতূহলের সঙ্গে অক্ষয় সেইদিকে এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে।

অন্ধকার ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করলে দুইজন লোক। প্ল্যাটফর্মের ঢালু প্রান্ত দিয়ে উপরে উঠে এল। তারা তেরপলে ঢাকা স্ট্রেচারে করে কী যেন বয়ে আনছে।

সেটা যে কী, তা বুঝতে অক্ষয়ের দেরি লাগল না। তার বুক করতে লাগল ছাঁৎ-ছাঁৎ।

তেরপলের তলা থেকে একটা অস্পষ্ট দেহের গঠন ফুটে উঠেছে—যাত্রীরা তাড়াতাড়ি এপাশে-ওপাশে সরে গিয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল আড়ষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ চোখে।

বাহকরা চলে গেল। পিছনে পিছনে আসছিল একটা কুলি। তার হাতে একটা ব্যাগ আর ছাতা।

হঠাৎ যাত্রীদের ভিতর থেকে একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'যে লোক কাটা পড়েছে, ওটা কি তারই ছাতা?'

কুলি বললে, 'হাঁ বাবু!' ছাতাটা সে ভদ্রলোকের চোখের সামনে তুলে ধরলে। দামি ছাতা। তার হাতলটা বিশেষ ধরনে রুপো দিয়ে বাঁধানো।

ভদ্রলোক সচমকে বলে উঠলেন, 'হা ভগবান! বলো কী?'

তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আর একটি দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক। তিনি শুধোলেন, 'কেন বসন্তবাবু, আপনি এ কথা বলছেন কেন?'

বসন্তবাবু বললেন, 'ওটা হচ্ছে মণিলাল বুলাভাইয়ের ছাতা। আমি বাঁট দেখেই চিনেছি!'

দ্বিতীয় অংশ

(অপরাধ আবিষ্কারের কলাকৌশল)

।। প্রথম ।।

[ডাক্তার দিলীপ চৌধুরির এত নামডাক ডাক্তারির জন্যে নয়। তিনি সুবিখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিদ। এবং তাঁর আসল খ্যাতির কারণ, বিজ্ঞানের সাহয্যে বিচিত্র উপায়ে তিনি বহু কঠিন ও রহস্যপূর্ণ পুলিশ কেসের কিনারা করেছেন। শ্রীমন্ত সেন হচ্ছেন তাঁর বিশেষ বন্ধু ও নিত্যসঙ্গী। নীচেকার অংশ শ্রীমন্ত সেনের ডায়ারি থেকে তুলে দেওয়া হল।]

সকলেই জানেন, চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে যেখানে আইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, সেখানে পুলিশের মাথাওয়ালারা আমার বন্ধু ডাক্তার দিলীপ চৌধুরির সাহায্য লাভ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

কলকাতার বিখ্যাত জহুরি মণিলাল বুলাভাইয়ের মৃত্যুরহস্যের মধ্যে বন্ধুবর দিলীপের কৃতিত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তাঁর ওই medico-legal পদ্ধতির কোনও কোনও বিশেষত্ব পুলিশকে খুশি করতে পারেনি। ওই বিশেষত্বগুলি যে কী, যথাস্থানে দিলীপের মুখেই তা প্রকাশ পাবে। আপাতত, কেমন করে আমরা এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লুম, গোড়া থেকে সেই কথাই বলব।

শীতের কুয়াশামাখা সন্ধ্যা যখন অন্ধকারে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে, আমাদের ট্রেন গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে চাঁদনগরের ছোটো স্টেশনের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

দিলীপ কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আরে আরে, বসন্তবাবু যে!'

সঙ্গে সঙ্গে একটি সহজে-উত্তেজিত-হবার মতন চেহারার ছোটোখাটো চটপটে অথচ হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক আমাদের কামরার কাছে এসে বললেন, 'অ্যাঁ, দিলীপবাবু? জানলার ধারে আপনার মুখ দেখেই চিনেছি! ভারী খুশি হলুম মশাই, ভারী খুশি হলুম! কিন্তু আপনারা হচ্ছেন মস্তবড়ো বিজ্ঞ লোক, আমাকে আপদ ভাববেন না তো?'

দিলীপ হেসে বললেন, 'আপনার দীনতা দেখে লজ্জা পাচ্ছি। কিন্তু যাক সে কথা। এখানে আপনি কী করছেন বলুন দেখি?'

—'আমার ছোটোভাই এখান থেকে কিছুদূরে একটা জমি কিনেছে। আমি তাই দেখতে এসেছিলুম। এই ট্রেনেই কলকাতায় ফিরব।' বলেই বসন্তবাবু দরজা খুলে কামরার ভিতরে উঠে এলেন, তারপর বসে পড়ে বললেন, কিন্তু আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন? সঙ্গে ওই রহস্যময় ছোটো বাক্সটিও এনেছেন দেখছি! ও বাক্সটি দেখেই নতুন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি! আমার কাছে ওটি হচ্ছে ম্যাজিক-বাক্স!'

দিলীপ বললেন, 'ও বাক্সটি সঙ্গে না নিয়ে আমি কখনও বাড়ির বাইরে পা বাড়াই না।

হঠাৎ কখন কী দরকার হতে পারে কে জানে? ছোটো বাক্স, বইতে কষ্ট নেই, কিন্তু দরকারের সময়ে ওটিকে হাতের কাছে না পেলে নাকালের একশেষ হতে হয়!

বাক্সের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসন্ত বললেন, 'সেই ব্যাঙ্কে খুনের মামলায় ওই বাক্স থেকে যন্ত্রপাতি বার করে আপনি যে আশ্চর্য ভেলকিবাজি দেখিয়েছিলেন, আমার এখনও মনে আছে। অদ্ভুত বাক্স, অদ্ভুত বাক্স! ওর মধ্যে কী জাদু আছে, কে জানে!

দিলীপ মৃদু হেসে সস্নেহে বাক্সটির দিকে তাকিয়ে তার ডালা খুলে ফেললেন। একরত্তি বাক্স—চৌকো একফুট মাত্র। দিলীপ এটিকে বলেন, 'আমার পকেট-রসায়নশালা!' এর মধ্যে খুদে খুদে যে জিনিসগুলি আছে, তার সাহায্যে যে-কোনও রাসায়নিক অনায়াসেই প্রাথমিক পরীক্ষাকার্য সম্পাদন করতে পারেন।

'অদ্ভুত বাক্স, অদ্ভুত বাক্স!'—বলে বসন্তও মুগ্ধচোখে তার ভিতর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার ভিতরে যা কিছু আছে সব এতটুকু-এতটুকু—যেন গালিভারের ভ্রমণ কাহিনিতে বর্ণিত কড়েআঙুলের মতন ছোট্ট মানুষের দেশ লিলিপুটে ব্যবহারযোগ্য, অথচ তার মধ্যে নেই কী? নানা রাসায়নিক তরল পদার্থে ভরা পরীক্ষক-শিশি, কাচনল, স্পিরিট-ল্যাম্প, অণুবীক্ষণ প্রভৃতি!

বসন্ত বললেন, 'এ যেন পুতুলখেলার বাক্স! কিন্তু মশাই, এত ছোটো ছোটো জিনিস নিয়ে কি কাজ করা যায়? ধরুন, ওই অণুবীক্ষণটি—'

দিলীপ বললেন, 'ওটিকে খেলনার মতন দেখতে বটে, কিন্তু ওটি খেলনা নয়। ওর বীক্ষণকাচ ছোটো হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী। অবশ্য বড়ো যন্ত্রে কাজের সুবিধা হয় বেশি, কিন্তু পথে-বিপথে যেখানে বড়ো যন্ত্র পাওয়া অসম্ভব, সেখানে তার অভাব এর দ্বারা যথাসম্ভব পূরণ করা চলে। এগুলি হচ্ছে মধুর অভাবে গুড়ের মতো—কিছু-নেইয়ের মধ্যে তবু-কিছু!'

বসন্ত হাত দিয়ে এক-একটি জিনিস তোলেন, আর বালকের মতন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। তাঁর অসীম কৌতূহল চরিতার্থ করতে করতে গাড়ি এসে পড়ল চাঁদনগর জংশনে।

বসন্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও দিলীপবাবু, এইখানেই আমাদের গাড়ি-বদল করতে হবে না?'

দিলীপ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

আমরা তিনজনেই প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লুম। এবং নেমেই বুঝলুম, এখানে কোনও অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে! যাত্রী এবং স্টেশনের লোকজনরা প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে গিয়ে সমবেত হয়েছে—চারিদিকেই যেন কেমন একটা চাপা চাঞ্চল্যের ভাব।

স্টেশনের একটি লোককে ডেকে বসন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী মশাই?'

—'লাইনের ওদিকে একটি লোক রেলগাড়ি চাপা পড়েছে। দূর থেকে ওই যে একটা লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে, খুব সম্ভব স্ট্রেচারে করে লাশ নিয়ে আসা হচ্ছে।'

আমরা যখন সেই অন্ধকারে দোদুল্যমান আলোটার দিকে তাকিয়ে আছি, তখন টিকিট-ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

লোকটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দুই কারণে। প্রথমত, তার মুখ হাসিখুশিমাখা হলেও কেমন যেন বিবর্ণ এবং তার চক্ষে ছিল একটা বন্য ভাব; দ্বিতীয়ত, সাগ্রহ কৌতূহলের সঙ্গে রেললাইনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সে কারুকে কোনও প্রশ্ন করছিল না।

দুলন্ত আলোটা কাছে এগিয়ে এল। তারপর দেখা গেল, দুজন লোক তেরপলে ঢাকা একটা স্ট্রেচার নিয়ে প্ল্যাটফর্মের ঢালু গা বেয়ে উপরে উঠে আসছে। তেরপলের তলায় যে একটা মনুষ্যদেহ আছে, সেটাও আমরা বুঝতে পারলুম।

একটা ছাতা ও একটা ব্যাগ নিয়ে আসছিল একজন কুলি। বসন্তবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে লোক কাটা পড়েছে, ওটা কি তারই ছাতা?'

কুলি ছাতাটা তুলে ধরে বললে, 'হাঁ বাবু!'

বসন্ত সচমকে বলে উঠলেন, 'হা ভগবান! বলো কী?'

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বসন্তবাবু, আপনি একথা বলছেন কেন?'

বসন্ত বললেন, 'ওটা হচ্ছে মণিলাল বুলাভাইয়ের ছাতা। আমি ওর বাঁট দেখেই চিনেছি!'

দিলীপ বললেন, 'জহুরি মণিলাল বুলাভাই?'

বসন্ত বললেন, 'হ্যাঁ। মণিলালের একটা অভ্যাস ছিল, টুপির তলায় নিজের নাম লিখে রাখা। ওহে বাপু কুলি, লাশের টুপিটা একবার দেখাও দেখি!'

কুলি বললে, 'কোনও টুপি পাওয়া যায়নি। স্টেশনমাস্টার আসছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।'

স্টেশনমাস্টার এসে বললেন, 'ব্যাপার কী?'

বসন্ত বললেন, 'এই ছাতা আর এর মালিককে আমি চিনি।'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'তাই নাকি, তাই নাকি? তাহলে একবার আমার সঙ্গে আসুন, লাশটাও শনাক্ত করতে পারেন কি না দেখি!'

বসন্ত সভয়ে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'ও বাবা!'

—'ভয় পাচ্ছেন কেন?'

—'রেলে কাটা পড়ে মণিলালের চেহারা কীরকম বিশ্রী হয়েছে, কে জানে!'

—'চেহারা মোটেই ভালো হয়নি। ছ-খানা মালগাড়ির চাকা বেচারার ওপর দিয়ে চলে যাবার আগে ড্রাইভার গাড়ি থামাতে পারেনি। ধড় থেকে মুণ্ডটা একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছে।'

খাবি খেতে খেতে বসন্ত বললেন, 'বাপ রে, কী বীভৎস কাণ্ড! মাপ করবেন মশাই, ও-দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারব না। হ্যাঁ দিলীপবাবু, আপনি কী বলেন?'

—'আমি বলি, তাড়াতাড়ি দেহ শনাক্ত করতে পারলে পুলিশের খুব সুবিধা হয়।'

বসন্ত ম্লান মুখে বললেন, 'তাহলে আর উপায় নেই, আমাকে দেখতেই হবে।'

স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে বসন্ত একটি ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন—যারপরনাই অনিচ্ছুকভাবে। কিন্তু এক মিনিট যেতে না যেতেই তিনি দৌড়োতে দৌড়োতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর মুখ-চোখ ভীত, উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

দিলীপের কাছে ছুটে এসে রুদ্ধশ্বাসে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মণিলাল বুলাভাইই বটে! হায় রে বেচারা! ভয়ানক, ভয়ানক!'

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মণিলালের সঙ্গে কোনও দামি পাথর-টাথর ছিল?'

(এই সময়ে, একটু আগে আমি যে হাসিমুখ অথচ ছন্নছাড়ার মতো লোকটাকে লক্ষ করেছিলুম, সে একেবারে আমাদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনতে লাগল)

বসন্ত বললেন, 'দামি পাথর? থাকাই সম্ভব, কিন্তু আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না, তবে মণিলালের কর্মচারীরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে। ......হ্যাঁ, একটা কথা আমার রাখবেন?'

—'বলুন।'

—'যদি আপনার সময় থাকে, এই মামলাটার দিকে একটু লক্ষ রাখতে পারবেন? মণিলাল আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।'

—'বেশ বসন্তবাবু, তাই হবে। আমার হাতে আজ আর কোনও কাজ নেই, আমি না-হয় কাল সকালেই কলকাতায় ফিরব। কী হে শ্রীমন্ত, তোমার কিছু অসুবিধা হবে না তো?'

—'কিছু না।'

বসন্ত বললেন, 'ধন্যবাদ। ওই কলকাতার গাড়ি এসে পড়েছে। কাল দেখা হলে অন্য সব কথা।'

—'কালকেই আপনি সব খবর পাবেন।'

সেই যে অদ্ভুত লোকটা আমাদের কাছে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল, দিলীপের মুখের দিকে সে একবার অত্যন্ত উৎসুক চোখে তাকালে, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসন্তবাবুর পিছনে পিছনে কলকাতার গাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

কলকাতার গাড়ি চলে যাবার পর দিলীপ স্টেশনমাস্টারের কাছে গিয়ে জানালেন, বসন্তবাবু তাঁর উপরে কোন ভার অর্পণ করে গিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে বললেন, 'অবশ্য পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমি কিছুই করব না। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে তো?'

—'হ্যাঁ। পুলিশ খুব শীঘ্রই এসে পড়বে। পুলিশকে আপনার কথা জানাব।' স্টেশন-মাস্টার এই বলে চলে গেলেন।

আমি আর দিলীপ প্ল্যাটফর্মের উপরে পদচারণা করতে লাগলুম।

দিলীপ বললেন, 'এ ধরনের মামলায় তিন রকম ব্যাখ্যা থাকে। দৈব-দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা,

হত্যা। আর এই তিন রকম তথ্যের সিদ্ধান্ত থেকেই আমাদের একটা মীমাংসায় এসে পৌঁছোতে হবে। প্রথম, মামলার সাধারণ তথ্য; দ্বিতীয়, দেহ পরীক্ষা করে যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে; তৃতীয়, ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে জানা যাবে যে সত্য। আপাতত আমরা যে সাধারণ তথ্যটুকু জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই—মৃতব্যক্তি হীরক ব্যবসায়ী। নিজের ব্যাবসার জন্যেই যে সে এমন জায়গায় এসেছিল, এটুকু আমরা ধরে নিতে পারি। হয়তো তার সঙ্গে ছিল দামি দামি পাথর। এই তথ্য হচ্ছে আত্মহত্যার বিরোধী। মনে সন্দেহ আনে, হয়তো এর মধ্যে হত্যাকারীর হাত আছে। তারপর প্রশ্ন ওঠে, এটা দৈবদুর্ঘটনা কি না? তাহলে জানতে হবে, যেখানে দেহ পাওয়া গিয়েছে সেখানে কোনও লেভেলক্রসিং কি লাইনের কাছে কোনও রাস্তা আছে কি না? কিংবা ঘটনাস্থলে মৃতব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতির কোনও সঙ্গত কারণ আছে কি না? এসব তথ্য এখনও আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু এগুলি আমাদের জানা উচিত।'

আমি বললুম, 'যে কুলিটা ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে আসছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো পারো! ওই দ্যাখো, একদল লোকের কাছে দাঁড়িয়ে সে খুব-সম্ভব আজকের ঘটনাই বর্ণনা করছে। আমাদের মতন নূতন শ্রোতা পেলে তার উৎসাহ আরও বেড়ে উঠতে পারে!'

দিলীপ বললেন, 'শ্রীমন্ত, তোমার কথাই শুনব। দেখা যাক ও কী বলে!'

আমরা কুলিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম—সত্য-সত্যই সে গল্পের ভার নামাবার জন্যে অতিশয় উৎসুক হয়ে উঠেছে!

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কেমন করে ঘটল বলতে পারো!'

সে বললে, 'ড্রাইভার যা বললে তা আমি শুনেছি। ওখানে এক জায়গায় লাইনটা বেঁকে গিয়েছে। মালগাড়ি যখন সেই বাঁকের মুখে এসে পড়ে, ড্রাইভার তখন হঠাৎ দেখতে পায়, লাইনের উপরে কী যেন পড়ে আছে! তারপর ইঞ্জিনের হেড লাইটে দেখা যায়, একজন মানুষ সেখানে শুয়ে আছে। সে তখনই বাষ্প বন্ধ করে দেয়, বাঁশি বাজায় আর ব্রেক কষে। কিন্তু জানেন তো মশাই, এত তাড়াতাড়ি মালগাড়ি থামানো সোজা ব্যাপার নয়। থামবার আগেই ছ খানা গাড়ি লোকটার উপর দিয়ে গড়গড় করে চলে যায়!'

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকটা কীভাবে শুয়েছিল, ড্রাইভার সে কথা কিছু বলেছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। হেডলাইটে সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, লোকটা লাইনের ওপর গলা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। লোকটা ইচ্ছে করেই প্রাণ দিয়েছে মশাই!'

—'সেখানে কোনও লেভেলক্রসিং ছিল?'

—'না বাবু। সেখানে কোনও রাস্তা-টাস্তাও ছিল না। লোকটা নিশ্চয়ই মাঠের ভেতর দিয়ে এসে, তারের বেড়া টপকে লাইনের ওপরে এসেছিল। সে আত্মঘাতী হবে বলে পণ করেছিল।'

—'এত কথা তুমি জানলে কেমন করে?'

—'স্টেশনমাস্টার আমাকে বলেছেন।'

দিলীপের সঙ্গে আমি ফিরে এসে একখানা বেঞ্চির উপরে বসে পড়লুম।

দিলীপ বললেন, 'একদিক দিয়ে লোকটার কথা খুব ঠিক। এটা দৈবদুর্ঘটনা নয়। তবে লোকটা যদি রাতকানা, কালা বা নির্বোধও হত, হয়তো বেড়া ডিঙিয়ে লাইনে নেমে মারা পড়তেও পারত। কিন্তু মণিলাল বুলাভাই সে-শ্রেণির লোক নয়। মণিলাল লাইনের উপরে গলা দিয়ে শুয়েছিল। এখেকেও আমরা দু-একটা অনুমান করতে পারি। হয় সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে; নয়, মৃত বা অজ্ঞান অবস্থাতেই তার দেহ পড়েছিল লাইনের উপরে। যতক্ষণ আমরা লাশ পরীক্ষা করবার সুযোগ না পাব, ততক্ষণ এর বেশি আর কিছু জানতে পারা যাবে না। ......ওই দ্যাখো শ্রীমন্ত, পুলিশ এসে পড়েছে! চলো, ওরা কী বলে শোনা যাক।'

॥ দ্বিতীয় ॥

স্টেশনমাস্টার একজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ ইনস্পেকটারের সঙ্গে কথা কইছিলেন।

দিলীপ ও আমাকে দেখেই তাঁদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল এবং দুজনেই একবাক্যে জানালেন, এসব ব্যাপারে তাঁরা বাইরের লোকের সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন।

দিলীপ এতক্ষণ আত্মপরিচয় দেননি। তিনি জানতেন, বাংলা দেশের যেসব পুলিশ কর্মচারী তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত নন, তাঁরাও অন্তত তাঁর নামের সঙ্গে সুপরিচিত। তিনি তাঁর কার্ড বার করে ইনস্পেকটারের হাতে দিলেন।

কার্ডখানা হতে করে ইনস্পেকটার নিজের মনে বিড়বিড় করে কী যেন বকতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।'

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল স্ট্রেচারটা রয়েছে মেঝের উপরে—সেইভাবেই তেরপল-ঢাকা। কাছেই একটা বড়ো বাক্সের উপরে রয়েছে ব্যাগ ও ছাতাটা। তাদের পাশেই একটা চশমার তোবড়ানো ফ্রেম, তার কাচ নেই।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই চশমার ফ্রেমটা কি লাশের সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে?'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ। ফ্রেমটা ঠিক লাশের পাশেই ছিল আর তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ভাঙা কাচের টুকরো।'

দিলীপ নোটবুকে কথাগুলো টুকে নিলেন।

এদিকে ইনস্পেকটার লাশের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন তেরপলের আচ্ছাদন!

দৃশ্যটা ভীষণ, সন্দেহ নেই। মৃতদেহটা এলিয়ে পড়ে আছে স্ট্রেচারের উপরে। বিচ্ছিন্ন

মুণ্ড—ভাবহীন চোখদুটো দৃষ্টিহীন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে। মুণ্ডহীন দেহ অস্বাভাবিকভাবে বেঁকে রয়েছে—দেখলেই শরীরে শিউরে ওঠে।

দিলীপ পূর্ণ এক মিনিটকাল ধরে নীরবে হেঁট হয়ে মৃতদেহের দিকে চেয়ে রইলেন, ইনস্পেকটার লণ্ঠনের আলো ফেললেন লাশের উপরে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'শ্রীমন্ত, আমরা তিনটে অনুমানের ভিতরে দুটোকে বাদ দিতে পারি।'

ইনস্পেকটার কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল দিলীপের হাতবাক্সের দিকে।

দিলীপ সেটি খুলে একজোড়া শব-ব্যবচ্ছেদে ব্যবহার করবার মতো ছোট্ট সাঁড়াশি বার করলেন।

ইনস্পেকটার বললেন, 'শব-ব্যবচ্ছেদ করবার হুকুম আমরা পাইনি।'

—'আমি তা জানি মশাই! আমি কেবল মৃতের মুখের ভিতরটা পরীক্ষা করব।' এই বলে দিলীপ সাঁড়াশি দিয়ে মুণ্ডের ঠোঁট টেনে তুললেন এবং মুখের ভিতরটা ভালো করে দেখে একমনে দাঁতগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'শ্রীমন্ত, তোমার আতশিকাচখানা একবার আমাকে দাও তো!'

দিলীপ কী করেন দেখবার জন্যে ইনস্পেকটার লণ্ঠন নিয়ে আগ্রহভরে ঝুঁকে পড়লেন।

দিলীপ মৃতের অসমোচ্চ দাঁতের সারির উপর দিয়ে আতশিকাচখানা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর সাঁড়াশি দিয়ে দাঁতের উপর থেকে সযত্নে খুব সূক্ষ্ম কী-একটা জিনিস তুলে নিলেন এবং আতশিকাচের ভিতর দিয়ে জিনিসটা দেখতে লাগলেন।

অনেক কাল দিলীপের সঙ্গে সঙ্গে আছি, এরপর তাঁর কী দরকার হবে আমি জানি। আমি তখনই অণুবীক্ষণে ব্যবহার্য একখানা কাচের স্লাইড ও শব-ব্যবচ্ছেদের শলাকা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম। তিনি সেই সূক্ষ্ম জিনিসটা স্লাইডের উপরে রেখে শলাকা দিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। ততক্ষণে আমি অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা প্রস্তুত করে রাখলুম।

দিলীপ বললেন, 'একফোঁটা Farrant আর একটা cover-glass দাও।'

দিলুম।

দিলীপ তাঁর অণুবীক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। আমি ইনস্পেকটারের মুখের দিকে তাকালুম—তাঁর মুখে বিদ্রূপহাস্য! আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি হাসি চাপবার চেষ্টা করলেন—বোধহয় ভদ্রতার অনুরোধেই!

অপ্রস্তুতভাবে তিনি বললেন, 'এসব আমার বাহুল্য বলে মনে হচ্ছে মশাই! ভদ্রলোকটি মারা যাবার আগে কি খেয়েছিলেন, সেটা জেনে কিছু লাভ আছে কি? আমার বিশ্বাস, ভদ্রলোক কুখাদ্য খেয়ে মারা পড়েননি।'

দিলীপ সহাস্যে মুখ তুলে বললেন, 'মশাই, এ-শ্রেণির মামলায় কিছুই বাহুল্য নয়। প্রত্যেক তথ্যেরই কিছু-না-কিছু মূল্য আছে।'

ইনস্পেকটার দমলেন না, বললেন, 'যার মুণ্ড কাটা গেছে, তার শেষ-খাবারের কথা জেনে কোনওই লাভ নেই।'

—'তাই নাকি? যে অপঘাতে মারা পড়েছে, তার শেষ খাবারের কথাটা কি এতই তুচ্ছ? মৃতের ফতুয়ার গায়ে এই যে গুঁড়ো গুঁড়ো কী জিনিস লেগে রয়েছে, দেখছেন? এথেকে আমরা কি কিছুই জানতে পারব না?'

ইনস্পেকটার অবিচলিতভাবে বললেন, 'এমন কী আর জানতে পারবেন?'

দিলীপ প্রথমে নিরুত্তর হয়ে মৃতের ফতুয়ার উপর থেকে সাঁড়াশির সাহায্যে গুঁড়োগুলো একে একে তুলে নিলেন। তারপর সেগুলো স্লাইডের উপরে রেখে অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করলেন।

তারপর মুখ তুলে বললেন, 'এই জানা যাচ্ছে যে, ভদ্রলোক মারা যাবার আগে 'ক্রিম-ক্র্যাকার' বিস্কুট খেয়েছিলেন।'

ইনস্পেকটার বললেন, 'আমার মতে, ও কথা না জানলেও চলত। মৃত কী খেয়েছিলেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনওই দরকার নেই। এখানে একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা মারা পড়েছে কেন? সে কি আত্মহত্যা করেছে? দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে? না কেউ তাকে খুন করেছে?'

দিলীপ বললেন, 'মাপ করবেন মশাই! একমাত্র যে প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে না তা হচ্ছে এই—লোকটিকে খুন করেছে কে? আর কেনই বা খুন করেছে? অন্য সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে—অন্তত আমি পেয়েছি!'

ইনস্পেকটার সবিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন—সে দৃষ্টিতে ছিল অবিশ্বাসের ছায়াও।

অবশেষে বললেন, 'মামলার কিনারা করে ফেলতে আপনার দেরি লাগেনি দেখছি!' তাঁর কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ভাব।

দিলীপ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'দেরি লাগবার কথা নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে খুনের মামলা। খুনের কারণ আন্দাজ করাও শক্ত নয়। মণিলাল বুলাভাই ছিলেন নামজাদা জহুরি আর খুব সম্ভব তাঁর সঙ্গে অনেক দামি পাথরও ছিল। আপনি বরং মৃতের পোশাক একবার খুঁজে দেখুন।'

মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে ইনস্পেকটার বললেন, 'এ হচ্ছে আপনার বাজে আন্দাজ। মৃতব্যক্তি জহুরি ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দামি পাথর ছিল, অতএব ধরে নিতে হবে তিনি খুন হয়েছেন? এও যুক্তি নাকি?'

তিরস্কার-ভরা কঠিন দৃষ্টিতে অল্পক্ষণ দিলীপের দিকে চেয়ে থেকে আবার বললেন,

'মৃতের জামাকাপড় খোঁজার কথা বলছেন? হ্যাঁ, আমরা এসেছি সেইজন্যেই। মনে রাখবেন মশাই, এটা হচ্ছে বিচারাধীন মামলা—খবরের কাগজের পুরস্কার-প্রতিযোগিতা নয়!' বলেই তিনি সদর্পে আমাদের দিকে পিছন ফিরে লাশের পোশাকের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এবং যা যা পেলেন, বড়ো বাক্সটার উপরে ব্যাগের পাশে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

এদিকে দিলীপ পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন লাশের সমস্ত দেহটা নিয়ে। বিশেষভাবে আতশিকাচ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন মৃতের পাদুকা। ইনস্পেকটার মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকান আর তাঁর মুখ হয়ে ওঠে কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল।

তারপর নিজের কাজ সেরে ফিরে বললেন, 'আমি হলে মশাই, খালি চোখেই জুতোটা দেখতে পেতুম! (সহাস্যে স্টেশনমাস্টারকে ইঙ্গিত করে) তবে আপনি হয়তো খালি চোখে ভালো দেখতে পান না!'

দিলীপ কিছু বললেন না, মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

তারপর তিনি বড়ো বাক্সটার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, মৃতের জামাকাপড়ের ভিতর থেকে কী কী জিনিস পাওয়া গিয়েছে।

মানিব্যাগ, পকেটবুক, একখানা চশমা (বোধহয় লেখাপড়ার জন্যে), পকেট ছুরি, দেশলাইয়ের বাক্স, তামাকের রবারের থলি ও কার্ডকেস প্রভৃতি ছোটো ছোটো আরও দু-একটি জিনিস।

দিলীপ প্রত্যেক জিনিসটা ভালো করে উলটে-পালটে পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং ইনস্পেকটার তাঁকে লক্ষ করতে লাগলেন কৌতুক ও অবহেলাপূর্ণ চোখে।

দিলীপ চশমার কাচ দু-খানা আলোর বিরুদ্ধে রেখে তাদের শক্তি পরীক্ষা করলেন। থলি থেকে তামাকের গুঁড়ো তুলে দেখলেন। সিগারেট পাকাবার কাগজ ও দেশলাইয়ের বাক্সটাও তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াল না।

ইনস্পেকটার বললেন, 'তামাকের থলি নিয়ে এত নাড়াচাড়া করছেন, ওর ভেতরে আপনি কী দেখতে চান?'

—'তামাক। এর ভেতরে স্টেট এক্সপ্রেস তামাক রয়েছে।'

—'তাও বুঝতে পেরেছেন?'

—'পেরেছি। বাজারে যেসব তামাক চলে তা দেখলেই আমি বলে দিতে পারি সেগুলোর নাম কী? এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি অনেক পরীক্ষার পর।'

—'আপনার বাহাদুরি আছে।'

—'বিনয় দেখাবার জন্যে সেটা অস্বীকার করতে চাই না। ......কিন্তু আপনি দেখছি মৃতের পকেট থেকে দামি পাথর-টাথর কিছুই পাননি।'

—'না। ওসব কিছু ছিল বলেও মনে হয় না। তবে দামি পাথর না পেলেও দামি জিনিস পেয়েছি বটে। সোনার ঘড়ি আর চেন, একটি গলাবন্ধের হিরার পিন, দু-খানা একশো আর

চারখানা দশ টাকার নোট। বুঝতেই পারছেন, খুন হলে খুনি এসবের মায়া ত্যাগ করত না! আপনার খুনের মামলা ফেঁসে গেল—কী বলবেন মশাই?'

দিলীপ বললেন, 'ওই ভেবে আপনি যদি খুশি হতে চান, খুশি হোন! কিন্তু আমার মত একটুও বদলায়নি। এইবারে কি ঘটনাস্থলটা দেখা উচিত নয়?'

—'চলুন।'

—'হ্যাঁ, আর এক কথা। মালগাড়ির ইঞ্জিনটা কি ভালো করে পরীক্ষা করা হয়েছে?'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ। সামনের আর পিছনের চাকায় রক্তের দাগ লেগে আছে।'

দিলীপ বললেন, 'দেখা যাক, রেললাইনেও রক্তের দাগ পাওয়া যায় কি না!'

স্টেশনমাস্টার বিস্মিত হয়ে কী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ইনস্পেকটার তাঁকে আর প্রশ্ন করবার অবসর দিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন—আমাদেরও পাত্তাড়ি গুটোতে হল।

দিলীপ নিজেও একটা লণ্ঠন চেয়ে নিলেন। তাঁর হাতে রইল লণ্ঠন, আমার হাতে তাঁর বাক্স। ইনস্পেকটার আর স্টেশনমাস্টার যেতে লাগলেন আগে আগে।

আমি চুপিচুপি বললুম, 'দিলীপ, আমি এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। তুমি তো দেখছি এরই মধ্যে একটা সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছ! এ ব্যাপারটাকে তুমি আত্মহত্যা না বলে হত্যা বলছ কেন?'

দিলীপ উত্তরে বললেন, 'প্রমাণ খুব ছোটো, কিন্তু অকাট্য। মৃতের বাঁ রগের উপরে মাথার চাঁদিতে একটা ক্ষত আছে, তুমি দেখেছ? ইঞ্জিনের আঘাতে ওরকম ক্ষত হলেও হতে পারে। কিন্তু এই ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়েছে—আর অনেকক্ষণ ধরেই পড়েছে! ক্ষত থেকে নেমে এসেছে দুটো রক্তের ধারা। দুই ধারার রক্তই ডেলা বেঁধে আর আংশিকভাবে শুকিয়ে গিয়েছে। মনে রেখো, এটা হচ্ছে ছিন্নমুণ্ড। আর এই ক্ষতের জন্ম হয়েছে নিশ্চয়ই মুণ্ডচ্ছেদের আগে, কারণ যেদিক থেকে ইঞ্জিনটা আসছিল, ক্ষতটা সেই দিকে নেই। তারপর ভেবে দ্যাখো, ছিন্নমুণ্ডের ভিতর থেকে এ রকম রক্তপাত হয় না। অতএব মুণ্ডচ্ছেদের আগেই এই ক্ষতের সৃষ্টি।

'ক্ষত থেকে শুধু রক্ত পড়েনি—রক্তের ধারা হয়েছে দুটি। প্রথম ধারাটি মুখের পাশ দিয়ে বয়ে জামার 'কলার'কেও রক্তাক্ত করে তুলেছে। দ্বিতীয় ধারাটি ক্ষত থেকে চলে গিয়েছে মাথার পিছন দিকে। শ্রীমন্ত, নিশ্চয়ই তুমি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম মানো? রক্ত যদি চিবুকের দিকে নেমে গিয়ে থাকে—প্রথম ধারায় যা হয়েছে—তাহলে বলতে হবে, মণিলাল তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর রক্ত যদি সমুখ থেকে মাথার পিছন দিকে গড়িয়ে গিয়ে থাকে—দ্বিতীয় ধারায় যা হয়েছে—তাহলে বলতে হবে, মণিলাল তখন উপরদিকে মুখ তুলে চিত হয়ে শুয়েছিল।'

'এখন ড্রাইভারের কথা মনে করো। সে দেখেছে, মণিলাল মাটির দিকে মুখ করে উপুড় হয়ে লাইনের উপরে শুয়েছিল। এক্ষেত্রে রক্তের একটা ধারা বাঁ গাল বয়ে কলার পর্যন্ত এবং আর একটা ধারা মাথার নীচে থেকে উপরে উঠে পিছন দিকে নেমে আসতে পারে না। আসল ব্যাপার কী হয়েছে জানো? মণিলাল যখন সোজা হয়ে বসে বাঁ দাঁড়িয়েছিল, তখন কেউ আঘাত করেছিল তার মাথার উপরে—আর রক্তের প্রথম ধারা নেমে এসেছিল তার গাল বয়ে। তারপর সে চিত হয়ে মাটির উপরে পড়ে যায়, আর রক্তের দ্বিতীয় ধারা চলে যায় তার মাথার পিছন দিকে।'

—'দিলীপ, আমি ভারী বোকা লোক! এসব কিছু ভাবতে বা লক্ষ করতে পারিনি।'

'অভ্যাস না থাকলে কেউ তাড়াতাড়ি অনুমান বা পর্যবেক্ষণ করতে পারে না! ...আচ্ছা শ্রীমন্ত, মৃতের মুখ দেখে তোমার কোনও কথা মনে হয়েছে?'

—'হয়েছে। মনে হয়, ও যেন শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার দরুন মারা পড়েছে।'

—'ঠিক বলেছ। ও মুখ হচ্ছে শ্বাসরুদ্ধ হওয়া মানুষের। তুমি বোধহয় আরও লক্ষ করেছ, ওর জিভ ফোলাফোলা, আর ওর উপর ঠোঁটের ভিতরে দাঁত বসে যাওয়ার দাগ—তার কারণ মুখের উপরে পড়েছিল প্রবল চাপ। এখন এইসব তথ্য আর অনুমানের সঙ্গে মাথার ক্ষতের কথা মিলিয়ে দ্যাখো। খুব সম্ভব, মণিলাল মাথায় আঘাত পাবার পর হত্যাকারীর সঙ্গে যোঝাযুঝি করেছিল, তারপর হত্যাকারী তার মুখ চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে তাকে মেরে ফেলে।'

আমি চমৎকৃত হয়ে নীরবে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলুম!

তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, 'মৃতের দাঁতের ভিতর থেকে তুমি সাঁড়াশি দিয়ে কী বার করে নিয়েছিল? অণুবীক্ষণে সেটা দেখবার সুযোগ আমি পাইনি।'

দিলীপ বললেন, 'ও, সেটা তুমি জানতে চাও? তার দ্বারা আমাদের অনুমান আরও বেশি অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। সেটা হচ্ছে একগোছা বোনা কাপড়ের অংশ। অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে দেখে বুঝেছি আলাদা আলাদা তন্তুর দ্বারা তা বোনা হয়েছে, প্রত্যেক তন্তুর রং ভিন্ন। তার বেশির ভাগই হচ্ছে রাঙা পশমি তন্তু। সেই সঙ্গে তার মধ্যে আছে কাপড়ের নীলরঙা তন্তু, আর কতকগুলো হচ্ছে হলদে পাটের। এটা হয়তো কোনও মেয়ের রঙিন কাপড়ের অংশ। তবে পাট আছে বলে সন্দেহ হয়, হয়তো এটা কোনও পর্দা বা কম দামি অন্য কিছুর অংশ।'

—'এ থেকে কী বুঝতে হবে?'

—'যদি এটা পরনের কাপড়ের অংশ না হয়, তবে বুঝতে হবে এটা এসেছে কোনও আসবাব থেকে। আর আসবাব মানেই বোঝায় গৃহস্থালি!'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'এ যুক্তি অকাট্য বলে মনে হচ্ছে না!'

—'না। কিন্তু এর দ্বারা আমার একটা মত রীতিমতো সমর্থিত হচ্ছে।'

—'কী!'

—'মৃতের জুতোর তলা দেখে আমি যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। খুব ভালো করে জুতোর তলা পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু তাতে বালি, কাঁকর, মাটি বা টুকরো ঘাসের কোনও চিহ্নই পাইনি। অথচ মৃতকে রেললাইনের উপরে আসবার জন্যে নিশ্চয়ই এবড়ো-খেবড়ো মাঠ পার হয়ে আসতে হয়েছে—কারণ ঘটনাস্থলের আশেপাশে নাকি কোনও রাস্তা নেই। তার বদলে জুতোর তলায় পেয়েছি তামাকের ছাই আর একটা পোড়া দাগ—যেন সেই জুতো দিয়ে কোনও জ্বলন্ত চুরোট বা সিগারেট মাড়ানো হয়েছে। জুতোর তলায় একটা পেরেক একটু বেরিয়ে পড়েছিল, তার ডগায় লেগেছিল একটুখানি রঙিন তন্তু—তা কার্পেটের অংশ ছাড়া কিছুই নয়। এর দ্বারা বেশ বোঝা যাচ্ছে, লোকটি মারা পড়েছিল কোনও কার্পেট-পাতা ঘরের ভিতরে। তার জুতোর তলায় সেই ঘরে ঢোকবার আগে যেসব দাগ ছিল, কার্পেট বা পাপোশের সংঘর্ষে সব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপর ঘর থেকে সে আর পায়ে হেঁটে বেরোয়নি—কারণ মৃত্যুর পর কেউ পায়ে হাঁটতে পারে না। নিশ্চয় কেউ তার মৃতদেহ বহন করে রেললাইনের উপরে রেখে এসেছিল।'

আমি একেবারে নীরব হয়ে রইলুম। দিলীপের সঙ্গে আমার পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ, তবু যতবারই তার সঙ্গে যাই, ততবারই আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে নতুন নতুন বিস্ময়! অতি তুচ্ছ সব তথ্য থেকে তিনি সকল দিক দিয়ে সম্পূর্ণ এমন একটি সত্যিকার ও অপূর্ব গল্প খাড়া করে তোলেন, যা শুনলে পরম বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না; মনে হয় দিলীপ যেন মায়াবী!

অবশেষে আমি বললুম, 'যদি তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, তাহলে তো বলতে হয় আমাদের সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল। কোনও বাড়ির ভিতরে আসল ঘটনাস্থল হলে সেখানে নিশ্চয়ই আরও অনেক সূত্র পাওয়া যাবে। এখন প্রশ্ন থাকল খালি একটা। সেই বাড়িটা কোথায়?'

দিলীপ বললেন, 'হ্যাঁ, আমার মনে এখন শুধু ওই প্রশ্নই জাগছে। কিন্তু ওইটেই হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। সেই বাড়িটার ভিতরে একবার উঁকি মারতে পারলে সমস্ত রহস্যই পরিষ্কার হয়ে যায়! কিন্তু উঁকি মারি কেমন করে? আমরা খুনের তদন্ত করছি বলে বাড়ির পর বাড়ি খানাতল্লাশ করতে পারব না। আপাতত আমাদের সমস্ত সূত্রই এক জায়গায় এসে হঠাৎ ছিঁড়ে যাচ্ছে। ছিন্ন সূত্রের অপর অংশ আছে কোনও অজানা বাড়ির মধ্যে, আর আমরা যদি দুই সূত্রকে একসঙ্গে বাঁধতে না পারি তাহলে সমস্যার কোনও সমাধানই হবে না। কারণ আসল প্রশ্ন হচ্ছে, মণিলাল বুলাভাইয়ের হত্যাকারী কে?'

—'তাহলে তুমি কী করতে চাও?'

—'এর পরের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, কোনও বিশেষ বাড়িকে এই অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা। ওইদিকেই দৃষ্টি রেখে এখন আমাকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে আর সেইসব নিয়ে

বিচার করতে হবে। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত ওই বাড়িখানাকে যদি আবিষ্কার করতে না পারি, তাহলে এদিক দিয়ে আমাদের সমস্ত অনুসন্ধানই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখন বেছে নিতে হবে আবার কোনও নতুন পথ।'

আমাদের কথাবার্তা আর অগ্রসর হল না। আমরা যথাস্থানে এসে পড়েছি। স্টেশন-মাস্টার দাঁড়িয়ে আছেন। ইনস্পেকটার লণ্ঠনের আলোকের সাহায্যে রেললাইন পরীক্ষা করছেন।

॥ তৃতীয় ॥

ইনস্পেকটারকে সম্বোধন করে স্টেশনমাস্টার বললেন, 'এখানে রক্ত পাওয়া গেছে অত্যন্ত কম। এটা বড়ো আশ্চর্য! এরকম আরও অনেক দুর্ঘটনা আমি দেখেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মাটির উপরে আর ইঞ্জিনের গায়ে দেখেছি প্রচুর রক্ত। কিন্তু এবারকার ব্যাপারে আমি অবাক হয়েছি।'

দিলীপ রেললাইনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। ওখানে রক্ত আছে কি নেই, এ প্রশ্ন তাঁর কাছে যেন নিরর্থক।

তাঁর লণ্ঠনের আলো পড়ল গিয়ে লাইনের পাশের জমির উপরে। কাঁকর-ভরা জমি এবং কাঁকরের সঙ্গে মিশানো রয়েছে খড়ি বা খড়ির মতন সাদা সাদা কীসের চূর্ণ।

ইনস্পেকটার তখন হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়েছেন। তাঁর পায়ের জুতোর তলা দেখা যাচ্ছিল।

আলোটা ইনস্পেকটারের জুতোর উপরে ফেলে দিলীপ চুপিচুপি আমাকে বললেন, 'দেখছ?'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। ইনস্পেকটারের জুতোর তলায় লেগে রয়েছে ছোটো ছোটো কাঁকর ও সাদা সাদা চূর্ণের চিহ্ন। দিলীপের অনুমানই ঠিক। মণিলাল পদব্রজে এখানে এলে তাঁরও জুতোর তলায় থাকত সাদা দাগ ও কাঁকর।

হেঁট হয়ে জমির উপর থেকে একটি ফাঁস-দেওয়া ফিতের মতন কী কুড়িয়ে নিয়ে ইনস্পেকটারকে ডেকে দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মৃতের টুপিটা এখনও খুঁজে পাননি?'

—'না। টুপিটা নিশ্চয় কাছেই কোথাও পড়ে আছে।' তারপর দিলীপের হাতের দিকে তাঁর নজর পড়ল। তিনি মুখ টিপে হেসে বললেন, 'আপনি দেখছি একটা নতুন প্রমাণ হস্তগত করেছেন!'

দিলীপ বললেন, 'হতেও পারে। এটা হচ্ছে কোনও দু-রঙা ফিতার ছোট্ট টুকরো—

মাঝখানটা সবুজ, দু-পাশে খুব সরু সাদা রেখা। হয়তো পরে এটা কাজে লাগবে। অন্তত এটিকে আমি ত্যাগ করব না।' তিনি পকেট থেকে একটি ছোটো টিনের বাক্স বার করলেন— তার মধ্যে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছিল খানকয় একরত্তি খাম। একখানা খামের ভিতরে ফিতার টুকরোটি পুরে খামের উপরে পেনসিল দিয়ে কী লিখলেন।

করুণাপূর্ণ হাসিমাখা মুখে ইনস্পেকটার দিলীপের কার্যপদ্ধতি লক্ষ করলেন। তারপর আবার নিযুক্ত হলেন রেলপথ পরীক্ষায়। এবারে দিলীপও যোগদান করলেন তাঁর সঙ্গে।

ইনস্পেকটার চশমার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাচচূর্ণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'বেচারা চোখে বোধহয় ভালো দেখতে পেত না। তাই ভুলে বিপথে এসে পড়েছিল।'

দিলীপ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'হবে।'

একখণ্ড স্লিপারের (যে কাঠের বা তক্তার উপরে রেললাইন পাতা হয়) উপরে ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানে কাচচূর্ণগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল। দিলীপ আবার বার করলেন তাঁর টিনের বাক্স এবং আবার বেরুল একখানা খাম।

.আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আর একবার সাঁড়াশিটা চাই। তুমিও আর একটা সাঁড়াশি নিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করো।'

—'কী সাহায্য?'

—'এই কাচের টুকরোগুলো কুড়োতে হবে।'

দুজনে সাঁড়াশি দিয়ে কাচের টুকরো সংগ্রহ করতে লাগলুম।

ইনস্পেকটার বললেন, 'এই কাচের গুঁড়ো যে মৃতের চশমা থেকে পড়েছে, সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ আছে নাকি? লোকটি যে চশমা পরত, তার নাকের দাগ দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি।'

—'ও তথ্য যে সত্য, সেটা প্রমাণ করতে কোনও দোষ নেই।' তারপর দিলীপ নিম্নস্বরে আমাকে বললেন, 'কাচের প্রত্যেকটি কণা কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করো।'

দৃষ্টিকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে তুলে কাচের কণা খুঁজতে খুঁজতে বললুম, 'এর কারণ আমি বুঝতে পারছি না।'

দিলীপ বললেন, 'পারছ না? বেশ, টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। এদের মধ্যে কতকগুলো আকারে বড়ো, কতকগুলো কণা কণা। তারপর পরিমাণটাও লক্ষ করো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে-অবস্থায় চশমাখানা ভেঙেছে, তার সঙ্গে এই কাচের গুঁড়োগুলো ঠিক মিলছে না। এগুলো হচ্ছে পুরু নতোদর (concave) কাচ, ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেমন করে ভেঙেছে? কেবল যে পড়ে গিয়েই ভেঙেছে তা মনে হয় না। তা যদি ভাঙত তাহলে এখানে মাত্র খানকয় বড়ো বড়ো টুকরো কাচ পাওয়া যেত। এগুলো ভারী মালগাড়ির চাকার চাপেও ভাঙেনি। কারণ তাহলে কাচগুলো হয়ে যেত পাউডারের মতন আর সেই পাউডার আমরা লাইনের উপরেও দেখতে পেতুম। কিন্তু লাইনের উপরে তার কোনও চিহ্নই

নেই! সেই চশমার ফ্রেমখানার কথাও ভেবে দ্যাখো। সে-ক্ষেত্রেও এমনি অসঙ্গতি। কেবল পড়ে গেলে 'ফ্রেম'খানা এত বেশি মুচড়ে ভাঙত না, আবার তার উপর দিয়ে রেলগাড়ির চাকা চলে গেলে 'ফ্রেম' খানার অবস্থা যতবেশি শোচনীয় হত, তাও হয়নি।'

—'তাহলে তুমি কী বলতে চাও দিলীপ?'

—'মনে হয়, চশমাখানা মানুষের পায়ের তলায় দলিত হয়েছে। আমাদের অনুমান যদি ভুল না হয়, তাহলে বলতে হবে, দেহটাকে যখন এখানে বহন করে আনা হয়েছে, চশমাখানাকেও আনা হয়েছে সেই সময়ে। আর ভাঙা অবস্থাতেই। সম্ভবত, হত্যাকারীর সঙ্গে যখন মণিলালের ধস্তাধস্তি চলছিল চশমাখানা পদদলিত হয়েছিল সেই সময়ই, তারপর মৃতদেহের সঙ্গেই হত্যাকারী চশমার চূর্ণাবশেষও এখানে নিয়ে এসেছে।'

আমি বোধ করি বোকার মতোই জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিন্তু কেন?'

—'এটুকু তোমার বুঝে নেওয়া উচিত। এখন দ্যাখো। আমরা যদি এখানকার প্রত্যেক কাচ-কণা কুড়িয়ে নিয়েও দেখি পুরো চশমার কাচ পাওয়া গেল না, তাহলে বুঝতে হবে বাকি কাচচূর্ণ আছে আসল ঘটনাস্থলেই। কিন্তু আমাদের সংগৃহীত কাচের কণার দ্বারা যদি দু-খানা পরকলা সম্পূর্ণ হয় তাহলে মানতেই হবে যে, চশমাখানা ভেঙেছে এইখানেই।'

আমরা যখন কাচচূর্ণ সংগ্রহ করছিলুম, ইনস্পেকটার ও স্টেশনমাস্টার তখন এক-একটা লণ্ঠন নিয়ে মণ্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন অদৃশ্য টুপিটাকে দৃশ্যমান করবার জন্যে।

লণ্ঠনের আলোয় আতশিকাচের সাহায্য নিয়েও আর এক কণা কাচও পাওয়া গেল না। স্টেশনমাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে ইনস্পেকটার তখন লাইন ধরে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছেন—অন্ধকারের মুল্লুকে তাঁদের হাতে ঝোলানো লণ্ঠন দুটো দেখাচ্ছিল নৃত্যশীল আলেয়ার মতো।

দিলীপ বললেন, 'আমাদের বন্ধুরা ফিরে আসবার আগেই এখানকার কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তারের বেড়ার কাছে চলো। ঘাসের ওপরে হাত-বাক্সটা রাখো, আপাতত ওটাই হবে আমাদের টেবিল।'

বাক্সের উপরে দিলীপ আগে একখানা কাগজ পাতলেন, পাছে বাতাসে সেখানা উড়ে যায়, সেই ভয়ে চারখানা পাথর কুড়িয়ে কাগজের চার কোণে চাপা দেওয়া হল। তারপর খামের ভিতর থেকে কাচের কণা ও চূর্ণগুলোকে কাগজের উপরে ঢেলে দিলীপ কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরবে!

হঠাৎ তাঁর মুখে ফুটে উঠল একটা অদ্ভুত ভাব। নিজের কার্ডকেসের ভিতর থেকে তিনি দু-খানা ভিজিটিং কার্ড বার করলেন। তারপর অপেক্ষাকৃত বড়ো কাচের টুকরোগুলোকে একে একে বেছে নিয়ে দু-খানা কার্ডের উপরে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

চটপটে কৌশলী হাতে দু-খানা কার্ডের উপরে তিনি ডিম্বাকারে কাচের কণাগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গড়ে তুললেন প্রায়-সম্পূর্ণ দু-খানা পরকলা। দিলীপের মুখের

ভাব দেখে আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। বেশ বোঝা গেল, এখনই একটা কোনও নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা!

কাগজের উপরে তখনও অনেকখানি কাচের কুচি পড়ে রয়েছে। কিন্তু তা এত সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে যে, তার দ্বারা আর কিছু গড়ে তোলা অসম্ভব।

দিলীপ হাত গুটিয়ে বসে মৃদুস্বরে হাস্য করলেন।

তারপর বললেন, 'এতটা আমি আশা করিনি।'

আমি বললুম, 'কী?'

—'তুমি কি দেখেও বুঝতে পারছ না? বড়ো বেশি পরিমাণে কাচ রয়েছে! আমরা দুখানা পরকলা প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছি, তবু এতখানি কাচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে হল না।'

চেয়ে দেখলুম, সত্যিই তাই! যে চূর্ণগুলো ব্যবহার করা হয়নি, তার দ্বারা হয়তো আরও দু-তিন খানা পরকলা তৈরি করা যায়! বললুম, 'ভারী আশ্চর্য তো! এর মানে কী?'

দিলীপ বললেন, 'আমরা যদি বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করি, কাচের কুচিগুলোই হয়তো সঠিক উত্তর দেবে!'

দিলীপ কাগজ ও কার্ড দু-খানা তুলে সাবধানে জমির উপরে রাখলেন। তারপর বাক্সের ডালা খুলে বার করলেন অণুবীক্ষণ। তারপর একখানা স্লাইডের উপরে বাড়তি কাচচূর্ণগুলোকে রেখে, লণ্ঠনের আলোতে অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'হুঁ, রহস্যের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠল! এখানে কাচ দেখতে পাচ্ছি খুব-বেশি আর খুব-কম! অর্থাৎ এর ভিতরে চশমার কাচ আছে মাত্র দু-এক টুকরো। এই দু-এক টুকরো গ্রহণ করলেও আমাদের পরকলা দু-খানা সম্পূর্ণ হবে না; কারণ বাকি কাচচূর্ণগুলো চশমার নয়—তা হচ্ছে কোনও ছাঁচে তৈরি জিনিসের। ওগুলো কোনও নলাকার অর্থাৎ চোঙার মতন জিনিস থেকে ভেঙে পড়েছে—খুব সম্ভব কোনও গেলাসের অংশ।'

স্লাইডখানা দু-এক বার সরিয়ে আবার বললেন, 'আমাদের বরাত ভালো শ্রীমন্ত! যা খুঁজছি, পেয়েছি! এক-একটা টুকরোর উপরে কোনও নকশার অংশ খোদা রয়েছে। এই যে আর একটা টুকরো—এর উপরে নকশার বেশ খানিকটা বোঝা যাচ্ছে! এইবার ধরতে পেরেছি! তারার নকশা আঁকা কোনও কাচের গেলাস ভেঙে এই কাচচূর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীমন্ত, তুমিও একবার দেখে নাও!'

আমিও অণুবীক্ষণে দৃষ্টি সংলগ্ন করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে এসে পড়লেন ইনস্পেকটার ও স্টেশনমাস্টার।

কাচের গুঁড়ো, বাক্স ও অণুবীক্ষণ নিয়ে আমাদের চুপ করে অমনভাবে বসে থাকতে দেখে ইনস্পেকটার উচ্চহাস্য সংবরণ করতে পারলেন না।

তারপর বোধ করি অভদ্রতা হচ্ছে ভেবেই কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে বললেন, 'আমি হেসে ফেললুম বলে কিছু মনে করবেন না মশাই! পুলিশের কাজে চুল পাকিয়ে ফেললুম কিনা, কাজেই এ সব যেন কেমন কেমন লাগে! অণুবীক্ষণ ভারী মজার জিনিস বটে, কিন্তু এরকম মামলায় আপনাদের একধাপও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না—পারবে কি?'

দিলীপ বললেন, 'হয়তো পারবে না। কিন্তু ও-কথা যাক। টুপিটা কোথাও খুঁজে পেলেন?'

ইনস্পেকটারের মুখ যেন চুন হয়ে গেল। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'খুঁজে পাইনি।'

—'আচ্ছা, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমরাও আপনাদের সাহায্য করব।'

দিলীপ দু-খানা কার্ডের উপরে ফোঁটা কয়েক xylolbalsam ফেললেন—পরকলায় কাচের কুচিগুলো যাতে স্থানচ্যুত না হয়। তারপর সমস্ত জিনিস বাক্সের মধ্যে পুরে স্টেশন-মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে সবচেয়ে কাছে আছে কোন গ্রাম?'

—'আধ মাইলের ভিতরে কোনও গ্রাম নেই।'

—'রাস্তা?'

—'একটা নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে বটে। এখান থেকে একটু দূরে একখানা মাত্র বাড়ি আছে, রাস্তাটা তার সামনে দিয়েই গিয়েছে।'

—'কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি আছে?'

—'না। আধ মাইলের মধ্যে ওইখানেই হচ্ছে একমাত্র বাড়ি।'

—'আচ্ছা, তাহলে বোধহয় ওইদিকেই যাওয়া উচিত। সম্ভবত মণিলাল ওই অসম্পূর্ণ রাস্তা দিয়েই এদিকে এসেছিল।'

ইনস্পেকটারও এই মতে সায় দিলেন।

॥ চতুর্থ ॥

পোড়োজমি। কোথাও আদুড় মাটি, কোথাও বুনো ঘাস, কোথাও কচুবন, কোথাও বিছুটির জঙ্গল। পথ বা রাস্তা নেই। ঝিঁঝি ডাকছে আড়াল থেকে। জোনাকি জ্বলছে মাথার উপরে। চারিদিকে অন্ধকার—কেবল আমাদের সমুখ ও আশপাশ থেকে অন্ধকার সরে সরে যাচ্ছে—যেন আলো দেখে ভয় পেয়ে।

যেখানে ঝোপ পান, ইনস্পেকটার তার ভিতরেই পা ছোড়েন, পদাঘাত করেন—যদি তার ভিতরে হারানো টুপিটা আত্মগোপন করে থাকে!

খানিকক্ষণ পরে আমরা একখানা বাড়ির পিছনদিকে এসে দাঁড়ালুম। চারিধারে তার নিচু দেওয়াল-ঘেরা বাগান।

বাগানের পিছনকার দেওয়ালের তলায় ছিল আর-একটা বিছুটির জঙ্গল। ইনস্পেকটার তারও এখানে-ওখানে পা ছুড়তে লাগলেন!

আচমকা আর্তনাদ শুনলুম—'ওরে বাপ রে, গেছি রে, উ-হু হু-হু!'

—'কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?'

ইনস্পেকটার একখানা পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কাতরস্বরে বললেন, 'কোন হারামজাদা, কোন রাসকেল, কোন গাধা বিছুটির জঙ্গলে এটা ফেলে রেখেছে?'

দিলীপ হেঁট হয়ে জিনিসটা তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা লোহার গরাদ। ...এর গায়ে মর্চে-টর্চে কিছুই নেই। তার মানে বিছুটির গাদায় এ বেশিক্ষণ থাকেনি।'

ইনস্পেকটার গর্জন করে বললেন, 'বেশিক্ষণ কি অল্পক্ষণ আমি জানতে চাই না মশাই, কিন্তু আমার ঠ্যাং আর-একটু হলেই খোঁড়া হয়ে যেত! ওই ডান্ডাটা যে ফেলেছে, তাকে যদি একবার হাতের কাছে পাই!'

ইনস্পেকটারের দুর্ভাগ্যে কোনওরকম সহানুভূতি প্রকাশ না করে দিলীপ একমনে ডান্ডাটা পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু কেবল সেই পরীক্ষাতেই তাঁর মন বোধ করি তুষ্ট হল না, কারণ তারপর তিনি আবার আতশিকাচ বার করে ডান্ডাটাকে আরও ভালো করে দেখতে লাগলেন।

তাই দেখে ইনস্পেকটার এত বেশি উত্যক্ত হয়ে উঠলেন যে, সে দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলেন না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্টেশন-মাস্টারও করলেন তাঁর অনুসরণ—ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল তিনি আমাদের অদ্ভুত জীব বলেই মনে করছেন। অল্পক্ষণ পরেই শুনলুম, বাড়ির সদরের কড়া ঘন ঘন নড়ছে—সঙ্গে সঙ্গে ইনস্পেকটারের হাঁক-ডাক!

দিলীপ বললেন, 'শ্রীমন্ত, একফোঁটা Farrant ঢেলে আমাকে একখানা 'স্লাইড' দাও। এই ডান্ডার ওপরেও দেখছি গাছকয় তন্তু লেগে আছে।'

আমি কথামতো স্লাইড, cover-glass, সাঁড়াশি ও শলাকা এগিয়ে দিলুম এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা রাখলুম বাগানের নিচু দেওয়ালের উপরে।

অণুবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে দিলীপ বললেন, 'ইনস্পেকটারের দুর্ভাগ্যের জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু ঝোপের উপরে তাঁর পা ছোড়াটা আমাদের পক্ষে হয়েছে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক! একবার অণুবীক্ষণের ভিতরে তাকিয়ে বলো দেখি, কী দেখতে পাচ্ছ?'

দেখতে দেখতে বললুম, 'রাঙা পশমি তন্তু, নীল কার্পাসসুতোর তন্তু, আর কতকগুলো হলদে উদ্ভিজ্জ—বোধহয় পাটের তন্তু।'

দিলীপ প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ। মনে আছে তো, মণিলালের দাঁতের ভিতরেও ঠিক এই তিনরকম তন্তু পাওয়া গিয়েছে? তাহলে বোঝা যাচ্ছে, দুই ক্ষেত্রেই তন্তু এসেছে এক জায়গা থেকে। ব্যাপারটাও অনুমান করতে পারছি। যে কাপড় চাপা দিয়ে হতভাগ্য মণিলালের

শ্বাসরোধ করা হয়েছিল, এই ডান্ডাটা মোছা হয়েছে বোধহয় সেই কাপড় দিয়েই! আচ্ছা, ডান্ডাটা আপাতত পাঁচিলের ওপরই তোলা থাক—যথাসময়ে এটা কাজে লাগবে। অতঃপর ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক, আমাদের ঢুকতে হবে এই বাড়ির ভিতরে। যে ইঙ্গিত পেলুম, তাই যথেষ্ট! এসো।'

তাড়াতাড়ি জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে আমরা বাড়ির সামনের দিকে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে ইনস্পেকটার ও স্টেশনমাস্টার দাঁড়িয়েছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো।

ইনস্পেকটার বললেন, 'বাড়ির ভিতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই, সদরে কুলুপ দেওয়া। এত ডাকলুম, এত কড়া নাড়লুম—কেউ সাড়া দিলে না। আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বা কী স্বর্গলাভ হবে, তা জানি না। টুপিটা নিশ্চয়ই রেললাইনের কাছাকাছি কোথাও পড়ে আছে, কাল সকালের আলোয় খুঁজে পাওয়া যাবে।'

দিলীপ কোনও কথা না বলে এগিয়ে গিয়ে আরও দু-চার বার কড়া নাড়লেন।

ইনস্পেকটার বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমি বলছি বাড়ির ভিতরে কেউ নেই, তবু আপনার বিশ্বাস হল না?' বলেই তিনি ক্রুদ্ধভাবে স্টেশনমাস্টারের হাত ধরে চলে গেলেন।

দিলীপ হাসিমুখে লণ্ঠন তুলে এদিকে-ওদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে করতে বাগানের ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর হেঁট হয়ে মাটির উপর থেকে একটা জিনিস তুলে নিলেন!

—'শ্রীমন্ত, এটি হচ্ছে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ জিনিস।' এই বলে দিলীপ আমার সামনে যা তুলে ধরলেন, তা হচ্ছে একটা আধ-পোড়া সিগারেট!

—'শিক্ষাপ্রদ জিনিস? এর দ্বারা তুমি কী জ্ঞানলাভ করবে?'

—'অনেক। চেয়ে দ্যাখো, এটা হচ্ছে হাতে-পাকানো সিগারেট! বাজারে হাতে-পাকানো সিগারেটের জন্যে যে জিগ-জ্যাগ, কাগজ পাওয়া যায়, তাই এতে ব্যবহার করা হয়েছে। মণিলালেরও পকেট থেকে এই কাগজের প্যাকেট পাওয়া গিয়েছে! এইবার দেখা যাক, সিগারেটের তামাক কোন শ্রেণির!'

দিলীপ একটি আলপিন দিয়ে সিগারেটের একপ্রান্ত থেকে খানিকটা তামাক বার করে নিয়ে দেখে বললেন, স্টেট-এক্সপ্রেস টোবাকো! চমৎকার! মণিলালের রবারের থলির ভিতরেও ঠিক এই তামাক পাওয়া গিয়েছে! কে বলতে পারে, মণিলালই এই সিগারেটটা নিজের হাতে পাকায়নি......আরে, মাটিতে ওটা আবার কী পড়ে রয়েছে?' হেঁট হয়ে সেটা তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা দেশলাইয়ের কাঠি! শ্রীমন্ত, মণিলালের পকেট থেকে কোনও মার্কার দেশলাই বেরিয়েছিল, লক্ষ করেছিলে কি?'

—'না।'

—Wimco-এর Club Quality দেশলাই, উপরে ঘোড়ার মুখের ছবি। সে দেশলাই

কিঞ্চিৎ অসাধারণ, কলকাতার বাঙালি পাড়ায় বিকোয় না, সাহেবরা খুব ব্যবহার করে। বাংলার পল্লিগ্রামেও সে দেশলাই কেউ দেখেনি। তার কাঠিগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত মোটা, Wimco-র অন্য কোনও মার্কার দেশলাইতেই অত মোটা কাঠি থাকে না। আমার হাতের কাঠিটিও তাই। এটাও যে মণিলালের দেশলাইয়ের বাক্স থেকে বেরিয়েছে, পরে মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। ...শ্রীমন্ত, আমার অত্যন্ত সন্দেহ হচ্ছে যে, মণিলালকে খুন করা হয়েছে এই বাড়ির ভিতরেই।'

আমরা আবার বাড়ির খিড়কির দিকে গিয়ে হাজির হলুম।

সেখানে দাঁড়িয়ে ইনস্পেকটার অসন্তুষ্ট স্বরে স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে কথা কইছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, 'চলুন, এইবারে ফিরে যাই। মিছে কাদা ঘেঁটে মরবার জন্যে কেনই বা এখানে এলুম—আরে, আরে, ও কী! না, মশাই, খবরদার!'

দিলীপ তখন লাফিয়ে উঠেছেন বাগানের নিচু পাঁচিলের উপরে। ইনস্পেকটারের কথা শেষ হবার আগেই তিনি ওপাশে নেমে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ইনস্পেকটার বললেন, 'বিনা হুকুমে পরের বাড়িতে আপনাকে আমি ঢুকতে দিতে পারি না।'

দেওয়ালের উপরে মুখ তুলে দিলীপ বললেন, 'শুনুন মশাই, শুনুন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, মণিলাল বুলাভাই মৃত্যুর ঠিক আগেই এই বাড়ির ভিতরে এসেছিলেন—আমি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। হয়তো তাঁকে এই বাড়ির ভিতরেই খুন করা হয়েছে। সময় হচ্ছে মূল্যবান, দেরি করলে সমস্ত সূত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আপাতত না দেখেশুনে আমি একেবারে বাড়ির ভিতরেও ঢুকতে চাই না। এখানে দেখছি একটা আস্তাকুঁড় রয়েছে। আমি আগে ওই আস্তাকুঁড়টা পরীক্ষা করতে চাই!'

॥ পঞ্চম ॥

ইনস্পেকটার চমকে উঠে সবিস্ময়ে বললেন, 'আস্তাকুঁড়! আপনি আস্তাকুঁড় ঘাঁটতে চান? বলেন কী মশাই? আপনার মতন আশ্চর্য লোক আমি জীবনে দেখিনি! ভালো, আস্তাকুঁড় ঘেঁটে আপনার কী লাভ হবে শুনি?'

—'আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই আস্তাকুঁড়ের ভিতরে আমি একটা তারার নকশা-কাটা ভাঙা কাচের গেলাসের টুকরো পাব। আস্তকুঁড়ে বা এই বাড়ির ভিতরে ওই গেলাসের টুকরো পাওয়া যাবে বলেই মনে করি।'

ইনস্পেকটার হতভম্বের মতন বললেন, 'ভাঙা গেলাসের টুকরোর সঙ্গে এ মামলার কী সম্পর্ক, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে কি স্টেশনমাস্টার মশাই?'

স্টেশনমাস্টার বোকার মতন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'উঁহু!'

—'বেশ, দেখা যাক দিলীপবাবুর অবাক কাণ্ডকারখানা!' ইনস্পেকটারও পাঁচিল ডিঙোলেন। স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাগানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সামনেই রয়েছে একটা আস্তাকুঁড়ের মতন জায়গা—তার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সব নোংরা জঞ্জাল।

দিলীপ বাঁ হাতে লণ্ঠন নিয়ে ডান হাতে একটা কাঠি দিয়ে মিনিট খানেক জঞ্জালগুলো নাড়াচাড়া করে কতকগুলো ছোটো-বড়ো কাচের টুকরো টেনে বার করে আনলেন।

তারপর ফিরে উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন!'

স্পষ্ট দেখা গেল, দুই-তিনটে বড়ো টুকরোর উপরে রয়েছে নকশা কাটা তারকা!

ইনস্পেকটার প্রথমটা স্তম্ভিতের মতন স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তিনি যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারপর বললেন, 'কী করে যে আপনি জানলেন কিছুই বুঝতে পারছি না! এরপর আপনি যে আরও কী ভেলকি দেখাতে চান, তাও বুঝতে পারছি না!'

দিলীপ জবাব দিলেন না। নিজের মনেই আস্তাকুঁড় ঘাঁটতে লাগলেন। সাঁড়াশি দিয়ে আরও দুই-তিনটে কাচের কুচি তুলে, ভালো করে দেখে আবার ফেলে দিলেন। একটু পরে খুঁজে খুঁজে আরও দুই-তিনটে কুচি বার করলেন, তারপর সেগুলো আতশিকাচের সাহায্যে পরীক্ষা করে বললেন, 'যা খুঁজছিলুম এতক্ষণ পরে তা পেয়েছি! শ্রীমন্ত, সেই কাচের কুচি বসানো কার্ড দু-খানা বার করো তো!'

আমি সেই প্রায়-সম্পূর্ণ পরকলা বসানো কার্ড দু-খানা বার করে দিলুম। তারপর তার দু-দিকে রেখে দিলুম দুটো লণ্ঠনও।

দিলীপ কিছুক্ষণ সেইদিকে অপলক-চোখে তাকিয়ে থেকে আস্তাকুঁড়ে কুড়িয়ে পাওয়া কাচের কুচিকয়টা আর-একবার পরীক্ষা করতে করতে ইনস্পেকটারকে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনি স্বচক্ষে দেখলেন তো, এই কাচের কুচি আমি এইখান থেকে পেয়েছি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আর কার্ডে বসানো পরকলার কাচ আমি কোথা থেকে পেয়েছি, তাও জানেন তো?'

—'হ্যাঁ মশাই। ওগুলো হচ্ছে মণিলালের চশমার কাচ! ওগুলো আপনি রেলপথ থেকে কুড়িয়ে এনেছেন।'

—'বেশ! এইবারে ভালো করে দেখুন।'

ইনস্পেকটার ও স্টেশনমাস্টার আরও সামনের দিকে এগিয়ে এলেন সাগ্রহে।

কার্ডের একখানা পরকলার দুই জায়গায় ও আর একখানা পরকলার এক জায়গায় ফাঁক ছিল।

দিলীপ হাতের তিনটে কাচের কুচি দু-খানা পরকলার ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিলেন—

সঙ্গে সঙ্গে কার্ডের চশমার কাচ দু-খানা হয়ে উঠল একেবারে সম্পূর্ণ!

ইনস্পেকটার রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'হে ভগবান, এ কী ব্যাপার? ওই কাচের কুচি যে এখানে পাওয়া যাবে, কেমন করে জানলেন?'

—'সে কথা পরে সব শুনবেন! আপাতত আমি বাড়ির ভিতরে যেতে চাই। ওখানে গিয়ে আশা করি আমি একটা পোড়া সিগারেট বা সিগারেটের খানিকটা দেখতে পাব! আরও কী কী পেতে পারি জানেন? ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট, হয়তো Wimco-র ঘোড়ামুখওয়ালা Club Quality দেশলাইয়ের কাঠি, এমনকি হয়তো মণিলালের হারানো টুপিটাও! এখনও বাড়িতে ঢুকতে আপনার আপত্তি আছে? মনে রাখবেন, আজ বাদে কাল এলে হয়তো আমরা ওই জিনিসগুলোর কোনওটাই আর দেখতে পাব না।'

ইনস্পেকটার পুলিশের সমস্ত আইন-কানুন বিলকুল ভুলে গেলেন। বিপুল আগ্রহে বাড়ির পিছনকার দরজার উপরে ধাক্কা মেরে বললেন, 'ভিতর থেকে বন্ধ। ঢুকতে গেলে ভাঙতে হবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা নিরাপদ নয়।'

—'তবে সদরের দিকে চলুন।'

—'কিন্তু সেখানকার দরজায় তো কুলুপ লাগানো।'

—'আসুন না।'

সবাই আবার পাঁচিল টপকে সদরের দিকে এলুম। দিলীপ আমাদের দিকে পিছন ফিরে সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং পকেট থেকে কী যেন একটা বার করে নিলেন।

পরমুহূর্তে দিলীপের হাতের ঠেলায় দরজাটা দু-হাট হয়ে খুলে গেল!

ইনস্পেকটার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'অ্যাঁঃ!'

—'ভিতরে আসুন।'

—'দিলীপবাবু, আপনি যদি চোর হতেন—'

—'তাহলে আপনাদের চাকরি হয়তো থাকত না। এখন ভিতরে আসুন।'

দিলীপের পিছনে পিছনে আমরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলুম।

ঢুকেই ডান দিকে একটি ঘর—বৈঠকখানা। একটা ঝোলানো 'ল্যাম্প' জ্বলছে। নীচে-কার্পেট পাতা। সোফা, কৌচ ও টেবিল প্রভৃতি দিয়ে ঘরখানা সাজানো। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই।

এককোণে একটা তেপায়ার উপরে রয়েছে একটি বিস্কুটের বাক্স। তার উপরে বড়ো বড়ো ছাপানো হরফে বিস্কুটের নাম—ক্রিমক্র্যাকার।

দিলীপ আঙুল দিয়ে সেইদিকে ইনস্পেকটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

ইনস্পেকটার একেবারে থ। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'অবাক কাণ্ড বাবা!'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'এ বাড়িতে যে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট পাওয়া যাবে, এ কথা কে আপনাকে বললে?'

—'কেউ বলেনি।'

—'তবে কী করে জানলেন?'

—'খুব সহজে। শুনলে আপনি হতাশ হবেন।' বলেই দিলীপ এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে ঘর ছেড়ে একটা দালানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর হেঁট হয়ে দুটো কী কুড়িয়ে নিলেন।

ইনস্পেকটার বললেন, 'কী পেলেন?'

—'যা পাবার আশা করেছিলুম। একটা পায়ে থ্যাঁতলানো পোড়া সিগারেটের অংশ, আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি।'

ইনস্পেকটার বললেন, 'না মশাই, এইবারে আমি হার মানলুম। এমন ব্যাপার কস্মিন কালেও দেখিনি।'

দিলীপ বললেন, 'মণিলালের স্টেট-এক্সপ্রেস তামাকের থলি, জিগ-জ্যাগ সিগারেটের কাগজ আর কিঞ্চিত অসাধারণ দেশলাইয়ের বাক্স আপনার কাছেই আছে তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তাহলে তাদের সঙ্গে এখানে পাওয়া এই জিনিসগুলি মিলিয়ে দেখুন।

......ইনস্পেকটার কথামতো কাজ করে সচিৎকারে বলে উঠলেন, 'একই তামাক, একই কাগজ, একই দেশলাইয়ের কাঠি! দিলীপবাবু, আপনি কি জাদুকর? বাকি রইল খালি টুপিটা! সেটাও কি এখানে আছে?'

—'জানি না। অন্তত এ ঘরে আছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে এখনও আমি হতাশ হইনি। আসুন, খুঁজে দেখি।'

ঘর থেকে গেলুম দালানে। সেখানেও টুপির চিহ্ন নেই।

পাশেই আর একটি ঘর। দিলীপ উঁকি মেরে দেখে বললেন, 'রান্নাঘর। একবার ঢুকেই দেখা যাক না।'

রান্নাঘরের চারিদিকে একবার ঘুরে উনুনের কাছে গিয়ে দিলীপ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, 'উনুনের ভিতরটা দেখুন! ওগুলো কী?'

ইনস্পেকটার স্বহস্তে উনুনটা পরীক্ষা করতে করতে বললেন, 'উনুনটা এখনও তপ্ত! একটু আগেও এর মধ্যে আগুন ছিল। কয়লার সঙ্গে এখানে কাঠও পোড়ানো হয়েছিল দেখছি। কিন্তু এগুলো কী? এই ডেলা-পাকানো কালো জিনিসগুলো কাঠও নয়, কয়লাও নয়। খুনি টুপিটা উনুনে পুড়িয়ে ফেলেনি তো। কে জানে? পুড়িয়ে ফেলে থাকলে আর উপায় নেই! আপনি কাচচূর্ণ দিয়ে পরকলা খাড়া করেছেন বটে, কিন্তু খানিকটা অঙ্গার থেকে একটা আস্ত টুপি তো আর গড়তে পারবেন না? অসম্ভব আর কেমন করে সম্ভব হবে বলুন!' তিনি একমুঠো কালো স্পঞ্জের মতন অঙ্গার তুলে দিলীপের সামনে ধরে

দেখালেন। তারপর আবার বললেন, 'পারেন এথেকে একটা গোটা টুপি সৃষ্টি করতে?'

দিলীপ বললেন, 'আবার একটা টুপি সৃষ্টি করতে যে পারব না, সে কথা বলাই বাহুল্য! তবে এটা কীসের অবশিষ্টাংশ, তা বলতে পারি! হয়তো ওর সঙ্গে টুপির কোনওই সম্পর্ক নেই। আসুন বৈঠকখানায়।'

বৈঠকখানায় ফিরে এসে তিনি একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে অঙ্গারের তলায় ধরলেন। অমনি সেটা বেজায় পটপট শব্দ করে গলে যেতে লাগল এবং তাথেকে খুব ঘন ধোঁয়া উঠল—সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল একটা উগ্র গন্ধ!

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'গন্ধটা বার্নিশের মতো।

দিলীপ বললেন, 'হ্যাঁ। গালার গন্ধ। আমাদের প্রথম পরীক্ষা সফল হয়েছে। এর পরের পরীক্ষায় কিছু সময়ের দরকার।'

তিনি হাতবাক্সের ভিতর থেকে Marsh-এর আর্সেনিক পরীক্ষার উপযোগী একটি ছোটো ফ্ল্যাস্ক, একটি safety funnel, একটি escape tube, একটি দু-পাট তেপায়া, একটি স্পিরিট ল্যাম্প ও একটি অ্যাসবেসটসের চাক্তি বার করলেন। ফ্ল্যাস্কের মধ্যে সেই অঙ্গারীভূত জিনিসের খানিকটা ফেলে তা পরিপূর্ণ করলেন অ্যালকোহলের দ্বারা। তারপর তেপায়ার উপরে অ্যাসবেসটসের চাক্তিখানা রেখে তার তলায় স্পিরিট ল্যাম্পটি জ্বেলে দিলেন।

দিলীপ বললেন, 'অ্যালকোহল গরম হতে থাকুক, ততক্ষণে আমরা আর একটি সন্দেহ মিটিয়ে ফেলতে পারি। শ্রীমন্ত, আবার এক ফোঁটা Farrant ঢেলে আমাকে একখানা স্লাইড এগিয়ে দাও।'

দিলুম। দিলীপ টেবিলের ধারেই বসেছিলেন। একটা ছোটো সাঁড়াশি দিয়ে টেবিলের আচ্ছাদনী থেকে একটুকরো কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে, এই কাপড়ের নমুনা আমরা আগেই পেয়েছি।'

কাপড়ের টুকরো স্লাইডের উপরে রেখে তিনি অণুবীক্ষণের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক! এর সঙ্গে আমাদের আগেই চেনাশোনা হয়ে গিয়েছে—নীল পশমি তন্তু, নীল কার্পাস, হলদে পাট! আচ্ছা, এবারের নমুনাকে নম্বর মেরে আলাদা করে রাখা যাক, নইলে অন্যগুলোর সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে।'

ইনস্পেকটার চমৎকৃত হয়ে দিলীপের কার্যকলাপ লক্ষ করছিলেন। তারপর বললেন, 'আমি এখনও অন্ধ হয়ে আছি, কিছুই দেখতে বা ভালো করে বুঝতে পারছি না। মণিলাল কেমন করে মারা পড়েছেন, আপনি কি তা আন্দাজ করতে পেরেছেন?'

—'হ্যাঁ। আমার অনুমান হচ্ছে, হত্যাকারী মণিলালকে যে-কোনও অছিলায় ভুলিয়ে বাড়ির ভিতরে আনে, তাকে জলখাবার খেতে দেয়। মণিলাল হয়তো আপনি যে চেয়ারে

বসে আছেন সেইখানেই বসেছিল। হত্যাকারী সেই লোহার গরাদ নিয়ে তাকে আক্রমণ করে, কিন্তু প্রথম আঘাতেই মণিলালকে বধ করতে পারেনি। তার সঙ্গে হত্যাকারীর ধস্তাধস্তি হয়, তারপর মণিলালকে সে টেবিলক্লথ চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। ......ভালো কথা, আর একটা মীমাংসা এখনও হয়নি। আপনি এই ফিতের খণ্ডটি চিনতে পারেন?'

—'হ্যাঁ, ওটি আপনি ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।'

—'আর সেইজন্যে আপনি আমাকে ঠাট্টা করেছিলেন। যাক, আমি দুঃখিত হইনি। এখন টেবিলের টানার ভিতরে দৃষ্টিপাত করুন। ওই ফিতের কাঠিমটা তুলে নিন। তারপর আমার হাতের এই ফিতের ফাঁসের সঙ্গে ওই কাঠিমের ফিতে মিলিয়ে দেখুন।'

ইনস্পেকটার তাড়াতাড়ি কাঠিমটা তুলে নিলেন। দিলীপ ফিতের ফাঁসটা রেখে দিলেন টেবিলের উপরে।

দুই ফিতা মিলিয়ে দেখে ইনস্পেকটার বিপুল উৎসাহে বলে উঠলেন, 'দুটো ফিতেই এক! মাঝখানটা সবুজ—দু-পাশে সরু সাদা রেখা! বাহবা কী বাহবা! মস্তবড়ো প্রমাণ! দিলীপবাবু, না-জেনে আপনাকে ঠাট্টা করেছি বলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

দিলীপ হাসতে হাসতে বললেন, 'ক্ষমা প্রার্থনার দরকার নেই। ওই ফিতে নিয়ে খুনি কোন কার্যসাধন করেছিল, আন্দাজ করতে পারেন? তাকে একা লাশটা সামলাতে আর বইতে হয়েছিল। তাই হাত খালি রাখবার জন্যে নিশ্চয়ই সে ছাতা আর ব্যাগটা ফিতে দিয়ে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল।'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'আপনি যেভাবে বর্ণনা করছেন, মনে হচ্ছে যেন আপনিও নিজে ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন! কিন্তু টুপির কী ব্যবস্থা করলেন?'

দিলীপ একটি ছোট্ট নল ও একখানা কাচের স্লাইড তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা মোটামুটি পরীক্ষা বোধহয় করতে পারব।'

তিনি নলিকাটি ফ্লাস্কের অ্যালকোহলে চুবিয়ে স্লাইডের উপরে ধরলেন। কয়েক ফোঁটা অ্যালকোহল পড়ল। তারপর তার উপরে cover-glass বসিয়ে স্লাইডখানা অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করলেন।

যন্ত্রে চক্ষু রেখে নিবিষ্ট মনে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, 'মশাই, ফেল্ট বা নেমদা কী দিয়ে তৈরি জানেন?'

ইনস্পেকটার বললেন, 'না।'

—'উচ্চশ্রেণির ফেল্ট তৈরি হয় খরগোশের চুলে। গালার লেপন দিয়ে চুলগুলো বসানো হয়। যে অঙ্গার আমরা পরীক্ষা করছি তার মধ্যে গালা আছে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে বেশ কয়েক গাছা খরগোশের চুলও দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই অঙ্গারগুলো হচ্ছে কোনও ফেল্ট-হ্যাটের দগ্ধাবশেষ। খরগোশের চুলগুলো যখন রং করা নয়, তখন একথাও বলতে পারি, টুপিটার রং ছিল ধূসর।'

ঠিক এই সময়ে পদশব্দ শুনে আমরা চমকে উঠে ফিরে দেখি, ঘরের ভিতরে হয়েছে একটি নূতন লোকের আবির্ভাব!

বিপুল বিস্ময়ে সে বলে উঠল, 'কে আপনারা? কী করছেন এখানে?'

ইনস্পেকটার একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা পুলিশের লোক। তুমি কে?'

পুলিশের নাম শুনেও লোকটা একটু দমল না। বললে, 'আমি অক্ষয়বাবুর বেয়ারা।'

—'এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?'

—'অন্য গ্রামে গিয়েছিলুম।'

—'কখন?'

—'বৈকাল থেকেই আমি বাইরে আছি।'

—'তোমার মনিব?'

—'আজ সন্ধের গাড়িতে তাঁর কলকাতায় যাবার কথা।'

—'কলকাতার কোথায়?'

—'জানি না।'

—'তিনি কী কাজ করেন?'

—'তাও ঠিক জানি না। তবে তিনি বোধহয় জহুরি।'

—'কখন ফিরবেন?'

—'বলতে পারি না। সময়ে সময়ে তিনি তিন-চার দিন বাড়িতে ফেরেন না।'

—'এ বাড়িতে আজ কোনও নতুন লোক এসেছিল?'

—'আমি বাড়িতে থাকতে কেউ আসেনি।'

—'কলকাতায় তোমার মনিবের কোনও বাসা নেই?'

—'জানি না। তবে শুনেছি তিনি কলকাতার বড়োবাজারে কোথায় গিয়ে ওঠেন।'

দিলীপ গাত্রোত্থান করে ইনস্পেকটারকে নিয়ে দালানে গেলেন।

চুপিচুপি বললেন, 'এখানে আর বেশি সময় নষ্ট করবেন না, আসামি একেবারে গা-ঢাকা দিতে পারে। তার কার্যকলাপ দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে বিষম চতুর ব্যক্তি। অক্ষয়ের বেয়ারাকে নজরবন্দি রাখুন। বাড়িটা পুলিশের হেপাজতে থাকুক। এখান থেকে এককণা ধুলোও যেন না সরানো হয়। আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন।—ইতিমধ্যে আমরা থানায় খবর দিয়ে আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। নমস্কার।'

আমরা সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

যেতে যেতে দিলীপ বললেন, 'আমার দৃঢ়বিশ্বাস অক্ষয় কালকেই ধরা পড়বে। সে যখন জহুরি, তখন তার বড়োবাজারের ঠিকানা জানা অসম্ভব হবে না। অক্ষয়ের সমব্যবসায়ীদের কেউ না কেউ তার ঠিকানা বলতে পারবে। ......তারপর শ্রীমন্ত, কর্তব্য তো শেষ হল। অতঃপর?'

আমি বললুম, 'অতঃপর? আমি বেশ বুঝতে পারছি, এইবার তুমি তোমার হাতবাক্সের জয়গান আরম্ভ করবে!'

—'তাই নাকি? অসীম তোমার বোঝবার শক্তি! যাক। আপাতত ভেবে দ্যাখো, এই মামলা হাতে নিয়ে আমরা কী কী শিক্ষালাভ করলুম? ......প্রথমত, একটুও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আর ঘণ্টাকয়েক পরে এলে বাড়ির ভিতরে ঢুকেও আমরা আর কোনও সূত্রই খুঁজে পেতুম না—সমস্তই উপে যেত কর্পূরের মতো। দ্বিতীয়ত, খুব তুচ্ছ সূত্রকেও অগ্রাহ্য করতে নেই; তাকে অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়াই উচিত। দৃষ্টান্ত চাও যদি, ভাঙা চশমার কথা বলতে পারি। তৃতীয়ত, পুলিশের অনুসন্ধানকার্যে একজন শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের সাহায্য অত্যন্ত দরকারি এবং চতুর্থত, আমার এই হাতবাক্সটি হচ্ছে অমূল্য নিধি; একে ছেড়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো উচিত নয়।'

আমি বললুম, 'অতএব, জয় হাতবাক্সের জয়!'

(শ্রীমন্ত সেনের ডায়ারি সমাপ্ত)

অবশিষ্ট

বড়োবাজারের একটা ছোটো অন্ধকার রাস্তা—চার-পাঁচ হাতের বেশি চওড়া নয়। কিন্তু তার মধ্যে প্রতিদিন জনস্রোত যেন উপছে পড়ে। প্রত্যহ কত হাজার লোক যে সেখান দিয়ে আনাগোনা করে, কেউ তার হিসাব রাখেনি।

রাস্তা সরু হলে কী হয়, দু-পাশের বাড়িগুলোর অধিকাংশই পাঁচ-ছয় তলার কম নয়। যেন নীচে আলোকের অভাব দেখে মুক্ত আকাশ-বাতাসকে খোঁজবার জন্যে তারা উপরে—আরও উপরে ওঠবার চেষ্টা করেছে।

প্রত্যেক বাড়ির তলায় তলায় যেন পায়রার খোপের পর খোপ সাজানো হয়েছে। এইসব খোপে যারা বাস করে, তাদের মধ্যে বাঙালির দেখা পাওয়া যায় না।

অথচ এমনি একখানা মস্তবড়ো বাড়ির সব উপর তলার একটি ঘরে চৌকির উপরে যে বসে আছে, সে আমাদের অক্ষয় ছাড়া আর কেউ নয়।

শহরে এত জায়গা থাকতে এখানে এসে কেন যে সে বাসা বেঁধেছে তা বলা কঠিন। হয়তো তার অসাধু—কিন্তু সুচতুর মন বুঝেছে, চৌর্য-ব্যবসায় কোনওদিনই নিরাপদ নয়; বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও যে-কোনও বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা; পুলিশকে ঠকাবার জন্যে যারা নির্জন জায়গায় আশ্রয় নেয়, তারা হচ্ছে নির্বোধ, কারণ পুলিশের দৃষ্টি সর্বাগ্রে তাদেরই আবিষ্কার করতে পারে; কিন্তু জনতাসাগরে হারিয়ে গেলে সহজেই কেউ তার পাত্তা পাবে না!

এইটেই তার বড়োবাজারে বাসা নেবার একমাত্র কারণ কি না জানি না; কিন্তু সেই

অন্ধকার রাস্তার এই ছ-তলা বাড়ির উপর তলায় সত্যসত্যই বাসা বেঁধেছিল আমাদের অক্ষয়। কলকাতায় এলে সে এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করত।

অক্ষয় চৌকির উপরে বসে আছে। ঘরের অন্য সব দরজা-জানলা বন্ধ। কেবল একটি খোলা জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে আসছে অপরাহ্নের রৌদ্রপীত আলো এবং বড়োবাজারের বিপুল মানব-মধুচক্রের অশ্রান্ত গুঞ্জন।

তার সামনে একখানা কাগজের উপরে ছড়ানো রয়েছে নানা রঙের নানা আকারের রত্ন! হিরা, পান্না, চুনি, মরকত, মুক্তা প্রভৃতি! তাদের উপরে এসে দিনের আলো পড়ছে যেন ঠিকরে ঠিকরে!

অক্ষয় বসে বসে ভাবছে—'একে একে হিসাব করে দেখলুম, এগুলোর বাজার-দর ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আশা করেছিলুম আরও বেশি লাভ হবে, কিন্তু মানুষের সব আশা সফল হয় না।

'তবু যা পেয়েছি, তার জন্যে নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে পারি? নিজের বাড়িতে বসে মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা লাভ, এটা কল্পনার অতীত! যদিও মণিলালের উচিত ছিল, আরও বেশি দামের পাথর সঙ্গে করে আনা! এ তো সামান্য চুরি নয়, আমাকে দস্তুর মতন নরহত্যা করতে হয়েছে। নরহত্যায় আরও বেশি লাভ হওয়া উচিত। কারণ নরহত্যায় নিজের জীবন বিপন্ন হয়।

'কিন্তু আমার জীবন কি বিপন্ন হয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। ঠিকমতো মাথা খাটাতে পারলে নরহত্যার মতন সহজ আর নিরাপদ ব্যাবসা আর নেই। খুনিরা ধরা পড়ে নিজেদের বোকামির জন্যেই। তেমন বোকামি করবার পাত্র আমি নই।

'পুলিশ কেমন করে আমাকে ধরবে! এমন কোনও সাক্ষী নেই যে বলতে পারে কাল সন্ধেবেলাতেই মণিলাল বুলাভাই এসেছিল আমার বাড়িতে। পুলিশ আমার বাড়িতে এলেও আমাকে সন্দেহ করলেও এমন কোনও সূত্র খুঁজে পাবে না, যার জোরে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে।

'চারদিকে দৃষ্টি রেখে ঠান্ডা মাথায় ধীরে-সুস্থে আমি কাজ করেছি। সেই সর্বনেশে টুপিটা একটু হলেই আমার নজর এড়িয়ে যেত বটে, কিন্তু যায়নি! সেও এখন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমার আবার ভয় কী?

'মণিলালের লাশ পাওয়া গিয়াছে—তা তো যাবেই! নির্বোধের মতন আমি তার লাশ লুকোবার চেষ্টা করিনি। রেলগাড়ির চাকার তলায় সে কাটা পড়েছে। মণিলালের সব জিনিসই—এমনকি ছাতা আর ব্যাগ থেকে চোখের চশমা পর্যন্ত তার সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে। অতি লোভী মূর্খ চোরের মতন মণিলালের সোনার ঘড়ি, চেন, হিরার পিন আর নগদ দুইশো চল্লিশ টাকাও আমি নেবার চেষ্টা করিনি। পুলিশ নিশ্চয়ই স্থির করবে, মণিলাল মারা পড়েছে রেল-দুর্ঘটনায়। কিংবা সে আত্মহত্যা করেছে।

'আমি নিরাপদ। আমি সাধারণ খুনি নই।

'কিন্তু স্টেশনের সেই ঢ্যাঙা লোকটা কে?

'সেই যার হাতে বসন্ত নামে লোকটা মামলা তদ্বিরের ভার দিলে? লোকটা কি ডিটেকটিভ? তার মুখ যতবারই মনে করি, ততবারই আমার বুক ধড়াস করে ওঠে কেন? সে আমার কী করতে পারে! যদিই সে এটাকে খুনের মামলা বলে ধরে নেয়, তাহলেই বা আমার ভয়টা কী? আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়? মণিলালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আবিষ্কার করবে কে?

'কোনও ভয় নেই, কোনও ভয় নেই, আমার কোনও ভয় নেই! যা হবার নয়, তাই যদি হয়, তাহলেই বা আমাকে ধরবে কে? আমার কলকাতার ঠিকানা কেউ জানে না। তোড়জোড় করে তদন্ত শেষ করতেও পুলিশের বেশ কিছুদিন কেটে যাবে। আর আমি কলকাতা থেকেও সরে পড়ছি আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই। ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা আমি তুলে নিয়েছি। দূর বিদেশে অদৃশ্য হব—এখন কিছুদিনের জন্যে। আমাকে ধরবে কে?

'সিঁড়ির ওপর অমন ভারী পায়ের শব্দ কাদের? যেন অনেক লোক উপরে উঠছে একসঙ্গে! উপরতলার ঘরগুলো তো খালি। নতুন ভাড়াটে আসছে নাকি?'

ঘরের দরজায় হল করাঘাত।

অক্ষয় সচমকে রত্নগুলো মুড়ে পকেটে রেখে দিলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'কে?'

—'দরজা খুলুন।'

—'কে আপনি?'

—'দরজা খুললেই দেখতে পাবেন।'

কেমন যেন বেসুরো কণ্ঠস্বর! এখানে কোনও বাঙালিই তো তাকে ডাকতে আসে না!

অক্ষয় উঠল। এক-মুহূর্তে তার মুখ হয়ে গেল রক্তহীন—যেন সে নিয়তির আহ্বান শুনতে পেয়েছে!

—'দরজা খোলো, দরজা খোলো বলছি!'

অক্ষয় দরজা খুললেন না। দরজা থেকে তিন হাত তফাতে একটা জানলা ছিল। তারই একটা পাল্লা খুলে, বাইরে একবার উঁকি মেরেই দুম করে জানলাটা আবার বন্ধ করে দিল।

ইনস্পেকটর, পাহারাওয়ালার দল।

অক্ষয় উদভ্রান্তের মতন চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। কোনও দিকেই পালাবার পথ নেই।

দরজার উপরে দুম-দাম পদাঘাত আরম্ভ হল। দরজা এখনই ভেঙে পড়বে।

দাঁতে দাঁত চেপে অক্ষয় নিজের মনেই বললে, 'ধরা দেব? কখনও নয়, কখনও নয়!' তার মুখের ভাব হয়ে উঠল ঠিক সেই রকম—মণিলালকে খুন করবার জন্যে যখন সে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল!

দুম দুম দুম—দরজায় পদাঘাতের পর পদাঘাত!

ওদিকে রাস্তার ধারের বারান্দা—ওদিকেও বাইরে যাবার জন্যেও একটা দরজা।

—'না, না, পালাবার পথ আছে, ওই দরজা দিয়েই আমি পালাব—ওই দরজা দিয়েই।'

দুম দুম দুম দুম!

অক্ষয় উন্মত্তের মতন ছুটে গিয়ে ছ-তলা বারান্দার দরজা খুলে ফেললে।

দুম দুম—হুড়মুড় করে ঘরের দরজা ভেঙে পড়ল!

এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় একলাফ মেরে বারান্দা ডিঙিয়ে নীচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অক্ষয়ের রক্তাক্ত দেহ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তার আত্মা তখন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!

এখন যাঁদের দেখছি
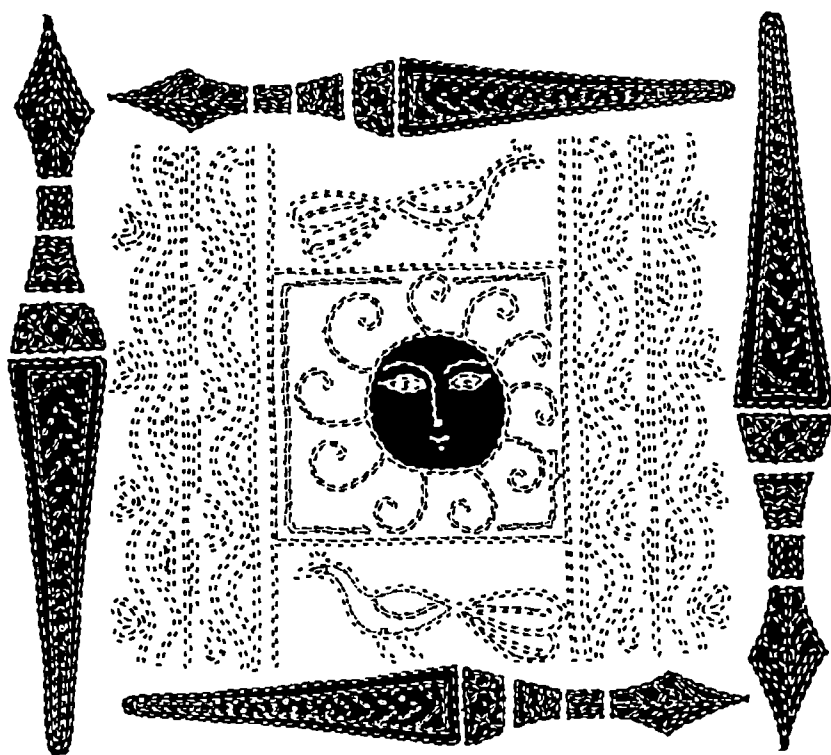
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনসন্ধ্যায় কবি করুণানিধান লাভ করেছেন জগত্তারিণী পদক। পদক বা উপাধি দিয়ে প্রমাণিত করা যায় না কোনও কবির শ্রেষ্ঠতা। তবে রসিকজনসমাজে কবি যে উপেক্ষিত হননি, এইটুকুই বোঝা যেতে পারে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একাধিক কবি ওই পদক লাভ না করেই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। এজন্যে তাঁদের উচ্চাসনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি, কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে আমাদের গুণগ্রাহিতারই অভাব।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অবজ্ঞাপ্রকাশ করে বলেছিলেন, 'ইংরেজরা হচ্ছে দোকানদারের জাত।' কিন্তু একসময়ে ইংল্যান্ড ছিল কবিদের দেশ বলে বিখ্যাত। নেপোলিয়নের যুগে ফরাসিদেশে যেসব কবি ছিলেন, তাঁদের নাম আর শোনা যায় না। কিন্তু ইংল্যান্ডের কাব্যকুঞ্জ মুখরিত হয়ে উঠেছিল (বার্নস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, সাদে, ব্লেক, বাইরন, শেলি ও কিটস প্রভৃতি) কবিদের কলসংগীতে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশও বরাবর কবিদের দেশ বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। রাজ্যবিপ্লব বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের যুগেও বাঙালি কবিদের গান স্তব্ধ হয়নি। বাংলা দেশের শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় সর্বদাই শোনা যেত কাব্যগুঞ্জন। বাংলার উপরে যখন ইসলামের পূর্ণ-প্রভাব, তখনও বাংলার আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বৈষ্ণব কবিদের বীণার ঝংকারে। তারপর আবার পলাশীর প্রান্তরে হল যখন আর এক বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়, তখনও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কবিদের আসন শূন্য থাকেনি।

ইংরেজ আমলের নূতন বাংলায় দেখি কবি ঈশ্বর গুপ্তকে। তাঁর আগেই কবি রামনিধি গুপ্ত কাব্যসংগীত রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কবিত্বের দিক দিয়ে তা ছিল ঈশ্বর গুপ্তের রচনার চেয়ে উচ্চতর। কিন্তু কেবল কবিরূপে নয়, সাহিত্যাচার্যরূপেই ঈশ্বর গুপ্ত অর্জন করেছিলেন সমধিক খ্যাতি। বিলাতে লেখক জনসনকে নিয়ে কেউ আজ মাথা ঘামায় না, কিন্তু সাহিত্যাচার্য ডা. জনসন হয়েছেন অক্ষয় যশের অধিকারী। ঈশ্বর গুপ্তও ওই কারণেই অমর হয়ে থাকবেন। কেবল বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র নয়, সে যুগের সমস্ত নবীন কবিদের উপরেই যে তাঁর প্রভাব ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি থেকেই এটা আমরা জানতে পারি। তারপর একে একে দেখা দিলেন মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিহারীলাল চক্রবর্তী ও কামিনী রায় প্রভৃতি।

এল গৌরবময় রবীন্দ্রযুগ। কিন্তু এ যুগে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেও আরও যেসব উচ্চশ্রেণির কবির নাম করা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রধান তিনজন হচ্ছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সেই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার,

গোবিন্দ্রচন্দ্র দাস, রমণীমোহন ঘোষ, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও রজনীকান্ত সেন প্রভৃতিকেও ভুললে চলবে না এবং বলা বাহুল্য এই ফর্দ সম্পূর্ণ নয়; উল্লেখযোগ্য পুরুষ ও মহিলা কবি ছিলেন আরও কয়েকজন।

তারপরেও ধারা ঠিক বজায় রইল। পূর্ববর্তী কবিদের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রনাথকে গুরুর আসনে বসিয়ে দেখা দিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীকালিদাস রায় ও শ্রীমোহিতলাল মজুমদারও তাঁদের সমসাময়িক—দেখা দিয়েছেন কেউ কিছু আগে বা কেউ কিছু পরে। আসল কথা, বাঙালি কবিদের শোভাযাত্রা অব্যাহত হয়েই আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

‘শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা!
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা।’

করুণানিধান সম্বন্ধে একজন লিখেছেন ‘ইনি পঞ্চকোট পাহাড়ের উপরে আদরা স্টেশনের কাছে ‘শৈলকুটীর’ নামে একটি আশ্রম নির্মাণ করেন। এইখানেই ইঁহার কবিতার প্রথম বিকাশ।’

শৈল সানুদেশে অনন্ত নীলিমার তলায় নিরালা পর্ণকুটির, চোখের সামনে হয়তো জাগত প্রান্তরবাহিনী রবিকরোজ্জ্বলা নটিনি তটিনী, শ্রবণে হয়তো ভেসে আসত বিজন কান্তারের অশ্রান্ত মর্মরসংগীত। এই প্রাকৃতিক পটভূমিকার উপরে তরুণ কবির চিত্ত-শতদল ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠবারই কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় করুণানিধানের প্রথম জীবনের কোনও খবরই আমি রাখি না, কারণ আমি ভূমিষ্ঠ হবার প্রায় এক যুগ আগেই তিনি দেখেছিলেন পৃথিবীর আলোক। পরে কবির সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলুম বটে, কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বজীবনের কথা নিয়ে কোনওদিন আমার সঙ্গে ঘুণাক্ষরেও আলোচনা করেননি। এমন অনেক কবি ও লেখক দেখেছি, যাঁদের কাছে হচ্ছে নিজের কথাই পাঁচ কাহন। তাঁদের এই অশোভন আত্মপ্রকাশের অতি-আগ্রহ যে শ্রোতাদের শ্রবণ-যন্ত্রকে উত্যক্ত করে তুলছে, এটা উপলব্ধি করলেও তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। করুণানিধান এ দলের লোক নন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয়, তিনি যেন নিজেকে একজন উঁচু দরের কবি বলেই জানেন না। বীণা তো জানে না, সে হচ্ছে স্বর্গীয় সংগীতের স্রষ্টা, সে কথা জানে কেবল বীণাবাদক। কবি করুণানিধানও হচ্ছেন বাণীর হাতের বীণাযন্ত্রের মতো।

যতদূর স্মরণ হয়, করুণানিধান যখন উদীয়মান, সত্যেন্দ্রনাথ তখনও কাব্যজগতে প্রকাশ্যভাবে দেখা দেননি। তবে যতীন্দ্রমোহন বাগচী সুপরিচিত হয়েছিলেন তাঁর আগেই। সর্বপ্রথমে ‘বঙ্গমঙ্গল’ নামে একখানি ছোটো কবিতার বই পড়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়

করুণানিধানের দিকে। রবীন্দ্রনাথের নব পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' তখনও বোধ হয় চলছিল। তারপর 'প্রসাদী' (সে বইখানিও আকারে বড় নয়) পাঠ করে আমি তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লুম।

মৃত্যুশয্যাশায়ী কবি রজনীকান্ত যখন রোগযন্ত্রণাগ্রস্ত দেহ থেকে নিজের চিত্তকে বিযুক্ত করে অতুলনীয় কাব্যসাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই সময়েই একদিন কবি মোহিতলালের সঙ্গে গিয়ে করুণানিধানের সঙ্গে পরিচিত হলুম। সে হচ্ছে ১৩১৬ কি ১৩১৭ সালের কথা। হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকে ছিল স্বর্গীয় পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনের বাড়ি—স্কুলের অস্তিত্ব তখন ছিল কি ছিল না বলতে পারি না। দোতলার বারান্দায় হুঁকো নিয়ে উবু হয়ে বসে করুণানিধান ধূমপান করছিলেন। বয়সে তখন তিনি যৌবনসীমা পার হননি, কিন্তু বয়সোচিত কোনও শৌখিনতার লক্ষণই তাঁর মধ্যে খুঁজে পেলুম না। শ্যামবর্ণ দীর্ঘ একহারা দেহ, পরনে ইস্ত্রিহীন ছিটের কোট ও আধময়লা কাপড়। মাথায় অযত্ন বিন্যস্ত চুল, মুখে দাড়িগোঁফের ভিতর দিয়ে থেকে থেকে ফুটে ওঠে সরল, মিষ্ট, মৃদু হাসি। দৃষ্টি ও চেহারা অত্যন্ত নিরভিমান। কবি নয়, নিরীহ ও সাধারণ স্কুলমাস্টারের চেহারা এবং কলকাতার শহরতলিতে তখন তিনি সত্য সত্যই কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদে বহাল ছিলেন।

এমন মানুষের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে বিলম্ব হয় না। তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা হতে লাগল ঘন ঘন। কখনও অমূল্যবাবুর বাড়িতে, কখনও তাঁর নিজের বাড়িতে। দু-একবার তিনি আমার বাড়িতেও এসে হাজির হয়েছেন। সর্বদাই আত্মভোলা ভাবুকের ভাব, অথচ দৃষ্টি দেখলে মনে হয় যেন তা অন্তর্মুখী, যেন তিনি মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোনও হারিয়ে যাওয়া রূপের স্বপ্ন। তাঁর কবিতাগুলিই প্রমাণিত করবে, তিনি ছিলেন নিছক সৌন্দর্যের পূজারি, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দারিদ্র্য ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করতে পারতেন না। কেবল তাঁর জামাকাপড়ই অত্যন্ত স্থূল ও আটপৌরে ছিল না, তাঁর বসতবাড়িতেও ছিল না সাজসজ্জা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোনও বালাই। কিন্তু চিত্ত যার রূপগ্রাহী, ধূলিশয্যায় শয়ন করেও সে দৃষ্টি নিবন্ধ করে রাখতে পারে উদার আকাশের নির্মল নীলিমার দিকে।

করুণানিধানের সঙ্গে মন খুলে মেলামেশা করেছি যে কতদিন, তার আর সংখ্যা হয় না। তিনি কেবল নির্বিরোধী ও কোনওরকম দলাদলির বাইরে ছিলেন না, তাঁর মনও ছিল ঈর্ষা থেকে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত। এক দিনও তাঁকে অন্য কবির বিরুদ্ধে একটিমাত্র কথা বলতে শুনিনি, অধিকাংশ কবিই যে দুর্বলতা দমন করতে পারেন না।

করুণানিধানের প্রথম জীবনের বন্ধু স্বর্গীয় সাহিত্যিক চারুচন্দ্র মিত্র একদিন আমাকে বললেন, 'করুণার কাছ থেকে বাংলা দেশের এক বিখ্যাত কবি (তাঁর নাম এখানে করলুম না) তাঁর নূতন কবিতার খাতা পড়বার জন্যে চেয়ে নিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে খাতাখানা আবার ফিরে এল বটে, কিন্তু তাঁর রচনাগুলি ছাপা হবার আগেই দেখা গেল, সেই বিখ্যাত

কবির নবপ্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে করুণার নিজের উদ্ভাবিত সব বাক্য।' সাহিত্যক্ষেত্রে রচনাচৌর্যের দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। আমাকেও এজন্যে একাধিকবার বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু তবু আমি উচ্চবাচ্য করিনি এবং এ শিক্ষা লাভ করেছি আমি করুণানিধানের কাছ থেকেই। ওই বিখ্যাত কবি ছিলেন আমাদের দুজনেরই বন্ধু। কিন্তু করুণানিধানের নিজের মুখ থেকে তাঁর ওই কবিবন্ধুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই শ্রবণ করিনি।

করুণানিধান কবিতা, তার আদর্শ বা তার রচনা-পদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে বড়ো বড়ো ও ভারী ভারী বচন আউড়ে কোনওদিন আসর গরম করবার চেষ্টা করেননি। ওসব বিষয়ে তাঁর একান্ত মৌনব্রত দেখে যে-কোনও ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারত যে, উচ্চশ্রেণির কাব্যকলা সম্বন্ধে হয়তো তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁকে একান্তে পেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে তরুণ শিক্ষার্থীর মতো আমি কাব্যকলাকৌশল সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করতুম, তখন তিনি সেসব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পারতেন না এবং সেই সব উত্তরের মধ্যেই থাকত কবিতার আর্ট ও ছন্দ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য। এইজন্যে আজও তাঁর কাছে আমার ঋণ স্বীকার করতে পারি অকুণ্ঠ কণ্ঠেই।

এবং তিনি যে কত বড়ো কাব্যকলাবিদ, তাঁর কবিতাবলির মধ্যেই আছে তার অজস্র প্রমাণ। 'প্রসাদী'র পর যখন তাঁর নূতন কবিতার পুথি 'ঝরাফুল' প্রকাশিত হল, রসিকসমাজ তখনই পেলেন করুণানিধানের প্রতিভার প্রকৃত হদিস। তখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সেটা বোধ করি ১৩১৮ সাল। 'ঝরাফুল' পাঠ করে ধুরন্ধর কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন মত প্রকাশ করেছিলেন:

'অমর কবি মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মতো এ কাব্যখানি মাধুর্যে পরিপূর্ণ। কবির যেমন শব্দসম্পদ, তেমনই ভাববৈভব। কবি প্রকৃতি দেবীর অপূর্ব উপাসক। এ পূজায় কৃত্রিমতা নাই। মাতাল যেমন মদিরা পানে উন্মত্ত হইলে নিজ শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখে না, এ কবিও তেমনি প্রকৃতি-দেবীর সৌন্দর্যসুধা পান করিয়া বিভোর হইয়া যান—প্রকৃত সাধক-জনোচিত তন্ময়তা লাভ করেন। এই আত্মবিস্মৃতিই উচ্চ অঙ্গের কাব্যের একটি অপরিহার্য লক্ষণ। এইজন্যই সুবিখ্যাত মহাত্মা বলিয়াছেন—'Oratory is heard, but Poetry is overheard.' এ কবিতাসুন্দরী দর্শন দিবামাত্রই চিত্ত হরণ করে। ইহাকে দেখিলেই হৃদয়ে এক অননুভূত আনন্দের উদয় হয়। এ মোহিনী আদিনারী Eve সুন্দরীর মতো লাবণ্যবতী। প্রথম দর্শনে চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। মহিলা কাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা করে

এলোকেশে কে এল রূপসী?
কোন বনফুল, কোন গগনের শশী?

'ঝরাফুলে'র মালা শুকিয়ে যায়নি, সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে আজও তা নিয়ে নাড়াচাড়া

করলে চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে যায় সৌরভের গৌরবে। এই কাব্যগ্রন্থখানিই নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করলে যে, বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে করুণানিধানও হচ্ছেন অন্যতম। তারপর প্রকাশিত হয় তাঁর 'শান্তিজল', 'ধানদুর্বা' ও 'রবীন্দ্র-আরতি' প্রভৃতি। এগুলি তাঁর কণ্ঠহারের আরও কয়েকটি রত্ন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠিকই ধরেছেন। করুণানিধান হচ্ছেন 'প্রকৃতিদেবীর অপূর্ব উপাসক। এ পূজায় কৃত্রিমতা নাই।' প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে প্রত্যেক কবিই আকৃষ্ট হন অল্পবিস্তর মাত্রায়। কিন্তু সে আকর্ষণের মধ্যে আছে যথেষ্ট পার্থক্য। অনেকেই আর্টের কৃত্রিমতা দ্বারা স্বভাবকে আচ্ছন্ন করে ফেলেন, স্বভাব হয় না স্বতঃস্ফূর্ত। এখানে স্বভাব বলতে আমি বোঝাতে চাই নিসর্গকেই। করুণানিধানের কাব্যে যে নিসর্গ-শোভা ফুটে ওঠে, তার মধ্যে পাওয়া যায় কবির স্বাভাবিক রক্তের টান ও নাড়ির স্পন্দন। তাঁকেই বলি সত্যিকার স্বভাবকবি। এবং ছোটোখাটো খুঁটিনাটির ভিতর দিয়ে বৃহত্তর প্রকৃতির শব্দস্পর্শগন্ধ ও রূপরসছন্দ প্রকাশ করবার জন্যে তিনি ভাবুকের মতো বেছে বেছে যেসব শব্দ উদ্ভাবন করেন, তার মধ্যেও থাকে খাঁটি কলাবিদের হাতের ছাপ। বাংলার কাব্যজগতে তাঁর মতো নিসর্গ-চিত্রকর সুলভ নয়।

কবিবর দেবেন্দ্রনাথ আত্মবিস্মৃতিকে উচ্চাঙ্গ কাব্যের অপরিহার্য লক্ষণ বলেছেন। কিন্তু কেবল কাব্যে নয়, করুণানিধানের ব্যক্তিগত জীবনেও যে আত্মবিস্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, সাধারণের কাছে তা কৌতুকপ্রদ বলে মনে হতে পারে। কবির (এবং আমারও) বন্ধু পূর্বোক্ত চারুবাবু আর একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'করুণার কাণ্ডের কথা শুনেছেন? সেদিন দেখি সে আনমনার মতো হেদোর চারিদিকে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে হেঁট হয়ে রাস্তা থেকে কী সব কুড়িয়ে নিচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলুম তার কোটের পকেট রীতিমতো ফুলে উঠেছে। পকেট হাতড়ে পাওয়া গেল একরাশ ঢিল, পাটকেল, নুড়ি।' এমন অবোধ শিশুর মতো সরলতা বোধ হয় আর কোনও বাঙালি কবির মধ্যে আবিষ্কার করা যাবে না।

করুণানিধানের সঙ্গে দেখা হয়নি সুদীর্ঘকাল। কার্য থেকে অবসর নিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন স্বগ্রাম শান্তিপুরে, তাঁর প্রিয় মুখ দেখবার সৌভাগ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করে এবং ততোধিক দুঃখের বিষয় এই যে, জরাজর্জর হবার আগেই ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছে তাঁর কাব্যরচনার প্রেরণা। পনেরো কি বিশ বৎসরের মধ্যে কদাচিৎ তাঁর দু-একটি রচনা চোখে পড়েছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে 'ঝরাফুল' প্রণেতার সিলমোহর খুঁজে পাইনি। কবি আছেন, কিন্তু কবিতা নেই। দুর্ভাগ্য।

অসিতকুমার হালদার

১৩১৬ কি ১৩১৭ সালের কথা। আমি তখন 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। একদিন 'ভারতী' সম্পাদিকা ও বঙ্কিম যুগের সর্বপ্রধান মহিলা লেখিকা স্বর্ণকুমারীদেবীর সানি পার্কের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে আছি এবং তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করছি, এমন সময়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন বোধ হয় আমারই সমবয়সী একটি তরুণ যুবক। গৌরবর্ণ, সৌম্যমুখ, একহারা দীর্ঘ দেহ। চেহারায় আছে মনীষা ও সংস্কৃতির ছাপ, সহজেই তা দৃষ্টি করে আকৃষ্ট।

স্বর্ণকুমারীদেবী বললেন, 'এর নাম অসিতকুমার হালদার, আমাদেরই আত্মীয়।' পরিচয়ের পর হল গল্পসল্প। সাহিত্যের প্রসঙ্গ, চিত্রকলার প্রসঙ্গ। তাঁর মৌখিক আলাপ এবং হাসিখুশিমাখা মুখ ভালো লাগল।

তারপরেও স্বর্ণকুমারীদেবীর ভবনে অসতিকুমারের সঙ্গে দেখা এবং আলাপ-আলোচনা হয়েছে এবং সেই সময়েই পাকা হয়ে গিয়েছে আমাদের বন্ধুত্বের বনিয়াদ। বন্ধুত্ব লাভের সুসময় হচ্ছে প্রথম যৌবন। মানুষের বয়স যত বাড়ে, স্বার্থের সংঘাতে দশজনের সঙ্গে যতই মনান্তর ও মতান্তর হতে থাকে, নরচরিত্রের মহানুভবতা সম্বন্ধে ততই সে সন্দিহান হয়ে ওঠে। রাম তখন শ্যামকে সহজে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয় না। তাই পরিণত বয়সের বন্ধুত্বের মধ্যে সরলতার মাত্রা থাকে অল্প। প্রথম পরিচয়ের পর দুই পক্ষই পরস্পরকে ভালো করে না বাজিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। প্রথম দর্শনেই প্রেম হবার সুযোগ থাকে মানুষের যৌবনকালেই।

সেটা ছিল বাংলা চিত্রকলার রেনেসাঁস বা নবজন্মের যুগ। তার আগেও বাঙালিরা কি ছবি আঁকতেন না? আঁকতেন বই কি, খুব আঁকতেন। কিন্তু যে বিলাতি পদ্ধতি তাঁদের ধাতে সইত না, তাইতেই শিক্ষিত হয়ে তাঁরা কেবল পাশ্চাত্য শিল্পীদের অনুসরণ করতেন পদে পদে। সেই প্রাণহীন অনুকরণের মধ্যে থাকত না কলালক্ষ্মীর কোনও আশীর্বাদই। আগে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলে শশীকুমার হেশের ছিল খুব নামডাক। তিনিই হচ্ছেন ইউরোপে শিক্ষিত প্রথম বাঙালি চিত্রকর, বোধ করি ইতালিতেই গিয়ে ছবি আঁকা শিখে এসেছিলেন। প্রতিমূর্তি চিত্রণে তাঁর দক্ষতা ছিল। কিন্তু তাঁর নিজের ধারণা অনুসারে আঁকা সাধারণ ছবি আমি দেখেছি। আঁকতেন তিনি শিক্ষিত নিপুণ হাতেই, কিন্তু কল্পনাকে উল্লেখযোগ্য রূপ দিতে পারতেন না। তাই নিখুঁত অঙ্কনপদ্ধতিও বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি তাঁর নামকে, আজ কয়জন লোক তাঁকে চেনে? ছবি যতই বাস্তব হোক, দেশের মাটির সঙ্গে যোগ না রাখতে পারলে তাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হবেই। বিলাতি চিত্রপদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষিত হয়েও অবনীন্দ্রনাথ ওই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যথাসময়েই। নিজ বাসভূমে পরবাসীর মতো তিনি থাকতে পারলেন না, আবিষ্কার করলেন প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতি, উপহার দিলেন স্বদেশি

সৌন্দর্যের সম্পদ। সেই সময়ে তিনি ও নন্দলাল বসু প্রমুখ তাঁর শিষ্যবর্গ নবজীবনের প্রেরণায় প্রবুদ্ধ হয়ে আপন আপন স্বাধীন পরিকল্পনা অনুসারে পরিবেশন করতে লাগলেন নব নব রসরূপ। অসিতকুমার হালদার হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথেরই অন্যতম শিষ্য।

কিন্তু উঠল বিষম সোরগোল। বিলাতি ছাপমারা বোতলে সস্তা দেশি মদ খেতে অভ্যাস করে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যাদের রুচি, তারা ছেড়ে কথা কইতে রাজি হল না। প্রাচ্য পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলির প্রতিলিপি প্রকাশিত হত প্রধানত 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'তে। বিরুদ্ধ দলের মুখপাত্র ছিলেন 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হঠাৎ রাতারাতি শিল্পসমালোচক সেজে প্রাচ্য চিত্রকলার শিল্পীদের নিয়ে আবোল তাবোল বকতে শুরু করে দিলেন। বলা বাহুল্য আমি ছিলুম প্রাচ্য শিল্পের পক্ষেই এবং তার প্রসঙ্গ নিয়ে সে সময়ে প্রভূত কালিকলম ব্যবহার করতেও ছাড়িনি এবং প্রাচ্য চিত্রকলার একজন উদীয়মান শিল্পী বলেই অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলুম অসিতকুমারের দিকে।

তারপর কেটে গেল কয়েকটা বৎসর। সুকিয়া (এখন কৈলাস বোস) স্ট্রিটে নব পর্যায়ের 'ভারতী' পত্রিকার কার্যালয়ে গড়ে উঠল আমাদের নূতন আস্তানা। তখন আমাদের মন ও বয়স পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু সে সময়েও আমাদের সকলকেই সর্বদাই সমাচ্ছন্ন করে রাখত কাব্য ও ললিতকলার কল্পলোক। মুখ্য আলোচনার বিষয়ই ছিল আর্ট ও সাহিত্য, এবং সে আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিতেন অসিতকুমারও। দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল আমাদের সৌহার্দ্য।

'ভারতী'র আস্তানা কেবল সাহিত্যিকদের আকর্ষণ করত না, সেখানে ওঠা-বসা করতেন অনেক বিখ্যাত গায়ক, অভিনেতা ও চিত্রকরও। শেষোক্তদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের কথা আগেই বলেছি, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আসতেন অসিতকুমার, শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ও শ্রীচারুচন্দ্র রায় প্রভৃতি। এমন বিভিন্ন শ্রেণির শিল্পী-সমাগম আমি আর কোনও সাহিত্যবৈঠকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। এমনকি ব্যঙ্গরঙ্গরসে বিখ্যাত স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন গোস্বামী একদিন এসে আমাকে বললেন, 'হেমেন্দ্র, তোমাদের আস্তানায় গিয়ে আমি কীর্তন শুনিয়ে আসতে চাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী কীর্তন চিন্দা? হাসির কীর্তন?'

তিনি বললেন, 'না হে ভায়া, না। গম্ভীর কীর্তন, করুণ কীর্তন। যে কীর্তন শুনে ভাবুক লোকে কাঁদে। ব্যবস্থা করতে পারো?'

চিত্তরঞ্জনকে আমরা সবাই নানা বৈঠকে কৌতুকাভিনয় করতে দেখেছি। শিশিরকুমারের 'নাট্যমন্দিরে'ও তিনি অভিনয় করেছেন এবং চলচ্চিত্রেও দেখা দিয়েছেন হাস্যরসাত্মক নানা ভূমিকায়। কিন্তু কীর্তনিয়ারূপে তাঁর পরিচয় জানে না জনসাধারণ, আমিও জানতুম না তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও।

'ভারতী' কার্যালয়ের তিনতলায় বড়ো ঘরে মেঝের উপরে শতরঞ্জি ও চাদর বিছিয়ে আসর প্রস্তুত করা হল, আমন্ত্রণ করা হল অনেক লোককে। নির্দিষ্ট দিনে সাত-আট জন

সহকারী ও বাদ্যভাণ্ড নিয়ে চিত্তরঞ্জন এলেন এবং ঘণ্টা দুই ধরে সকলকে শুনিয়ে দিলেন রীতিমতো কীর্তনগান। সে হচ্ছে উপভোগ্য সঙ্গীত।

'ভারতী'র সে আসর ছিল উচ্চশ্রেণির বিদ্বজ্জনসভা, তাই তার দিকে ঝুঁকতেন নানা শ্রেণির শিল্পী। সভ্যদের মধ্যে যে-কয়জন আজও ইহলোকে বিদ্যমান আছেন, তার অভাব একান্তভাবে অনুভব করেন তাঁরা সকলেই। এই নষ্টনীড়ের কথা স্মরণ করেই প্রায় দুই যুগ আগে অসিতকুমার (তিনি তখন লক্ষ্ণৌয়ের সরকারি চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ) আমাকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন: 'হেমেন, তোমার চিঠিখানি পেয়ে ভারী আনন্দ হল। আমাদের দলের মধ্যে তোমার সহৃদয়তার গর্ব আমরা বরাবরই করে থাকি। কলকাতায় যাই, কিন্তু মনে হয় যেন ডানা ভাঙা—বাসা থেকেও বাসা নেই। আমাদের সেই নীড়ের কথা কি কখনও ভোলা যায়?'

অসিতকুমার ছবি এঁকেছেন প্রধানত প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতি অনুসারেই। তিনি যে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য, তাঁর ছবি দেখলেই এ কথা বোঝা যায়, যদিও তাঁর নিজস্ব স্টাইলটুকুও ধরতে বিলম্ব হয় না। বর্তমানের চেয়ে অতীতের ঐতিহ্যের দিকেই তাঁর দৃষ্টি অধিকতর জাগ্রত, কেবল তাঁর কেন, প্রাচ্য চিত্রকলার অধিকাংশ শিল্পী সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়।

প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতিকে আজকাল ইংরেজিতে 'বেঙ্গল স্কুল' বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বেঙ্গল স্কুলের নাম শুনলেই কতিপয় অবাঙালি শিল্প-সমালোচকের মাথা গরম হতে শুরু করে। সম্প্রতি পত্রান্তরে শ্রীরমণ নামে এক দক্ষিণী ভদ্রলোক ফতোয়া দিয়েছেন: 'তথাকথিত বেঙ্গল স্কুলের প্রতিষ্ঠা বাংলা দেশেই হয়েছিল বটে, কিন্তু তার শিল্পীদের সকলেই বাংলা দেশের লোক নন।' এই অর্থহীন উক্তির দ্বারা ভদ্রলোক কী বোঝাতে চেয়েছেন, বুঝতে পারিনি। বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা বাংলা দেশের ভিতরেই থাকুন আর বাইরেই থাকুন কিংবা তাঁরা জাতে অবাঙালি হোন, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ তাঁদের একই গোষ্ঠীভুক্ত বলেই মনে করতে হবে। তাঁরা একই আদর্শে অনুপ্রাণিত, একই সাধনমন্ত্রে দীক্ষিত। এই ধারা চলে আসছে বেঙ্গল স্কুলের জন্মের পর থেকেই। অবনীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ হয়েছিলেন যেসব শিল্পী, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অবাঙালিও। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরাও (নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মুকুল দে ও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রভৃতি) বাংলা দেশের ভিতরে এবং বাহিরে নানা চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আরও কত অবাঙালি ছাত্রকে তৈরি করে তুলেছেন, তার সংখ্যা আমার জানা নেই। কিন্তু তাঁরা বাংলা দেশের বাইরেই থাকুন, কিংবা অবাঙালিই হউন, তাঁদেরও বলতে হবে বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীই। 'বেঙ্গল স্কুল প্রাদেশিক নয়, জাতীয় স্কুল।' শ্রীরমণের এ উক্তির মধ্যে নেই কিছুমাত্র নূতনত্ব, কারণ এটাও সর্বসম্মত। বেঙ্গল স্কুল ভারতের সর্বত্র যে জাতীয় শিল্পের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে, তারই ফলভোগ করছি আমরা সকলে জাতিধর্মনির্বিশেষে।

শ্রীরমণ আরও বলেন, বাংলা চিত্রকলা (অর্থাৎ বেঙ্গল স্কুল) আজ নাকি বন্ধ্যা, তার

অবস্থা বদ্ধ জলাশয়ের মতো। আমার মতে এখনও একথা বলবার সময় হয়নি, কারণ এখনও নন্দলাল, অসিতকুমার ও দেবীপ্রসাদ প্রভৃতি শিল্পীরা তুলিকা ত্যাগ করেননি, যদিও এ সত্য অনস্বীকার্য নয় যে তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন খেয়ালের মাথায় বিপথে গিয়ে আবার নব নব উদ্ভট পাশ্চাত্য ইজমের মোহে আচ্ছন্ন হতে চাইছেন। কিন্তু তাঁদের নাম বেঙ্গল স্কুলের অন্তর্গত করা যায় না এবং তাঁদের কেউ যদি এখানে শিক্ষালাভ করেও থাকেন, তবে আজ তাঁকে বলতে হবে, বেঙ্গল স্কুলের নাম-কাটা ছেলে।

আর এক কথা। সকল আর্টের ক্ষেত্রেই যুগে যুগে বদলে যায় পদ্ধতির পর পদ্ধতি। চিত্রকলাতেও প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত পদ্ধতির জন্ম ও প্রাধান্য হয়েছে তা বর্ণনা করতে গেলে আর একটি স্বতন্ত্র ও বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করতে হয়। কিন্তু কোনও পদ্ধতিই ব্যর্থ হয়নি। ইমপ্রেসানিজম বা কিউবিজম প্রভৃতি আসরে দেখা দিয়েছে বলে কি রাফায়েল, মিকেলাঞ্জেলো ও দ্য ভিঞ্চি প্রভৃতির প্রতিভা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে? 'বাংলা চিত্রকলা আজ বন্ধ্যা', একথা বলা বিমূঢ়তা। আজ তা সুফলাই হোক আর অফলাই হোক, তার গৌরব অক্ষয় হয়েই থাকবে। মতিভ্রান্ত ভারতীয় চিত্রকলার দৃষ্টিকে সে ঘরমুখো করতে পেরেছে, এই তার প্রধান গৌরব। প্রথম জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই সে একদল শক্তিশালী, সৃষ্টিক্ষম শিল্পী গঠন করতে পেরেছে, এই তার আর এক গৌরব। তারপর ভারতের দিকে দিকে প্রত্যন্তপ্রদেশ পর্যন্ত আজ সে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, এই তার আরও একটি গৌরব। এই সব কারণে বাংলা চিত্রকলাপদ্ধতি চিরদিনই অতুলনীয় হয়ে থাকবে।

বাংলা চিত্রকলার নবজাগরণের যুগে যে-কয়েকজন শিল্পী অগ্রনেতারূপে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, অসিতকুমার হচ্ছেন তাঁদেরই অন্যতম। কিন্তু তাঁর হাতে কেবল তুলিই চলে না, কলমও চলে অবাধগতিতে। তাঁর গদ্যও আসে, পদ্যও আসে। অল্পদিন হল তিনি কালিদাসের 'মেঘদূত' ও 'ঋতুসংহার'-এর সচিত্র কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেছেন—একধারে দেখেছি তাঁর কবি ও চিত্রকর রূপ। সুমিষ্ট কবিতা, বিচিত্র চিত্র। এত ভালো লেগেছিল যে, 'দৈনিক বসুমতী'তে সুদীর্ঘ সমালোচনার দ্বারা তাঁকে করেছিলুম অভিনন্দিত। কিন্তু চিত্রবিদ্যালয়ের গুরুতর কর্তব্যভার নিয়ে তাঁকে নিযুক্ত হয়ে থাকতে হয়, ইচ্ছামতো সাহিত্যচর্চার অবকাশ তিনি পান না। তাই দুঃখ করে আমাকে লিখেছিলেন: 'সময় আমার বড়োই কম, তাই সাহিত্যচর্চার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তবু চিরকালের অভ্যাস কি ছাড়া যায়? তাই কখনও-সখনও বেরিয়ে পড়ে এক-আধটা লেখা।'

তাঁর সাকিন লক্ষ্ণৌ, আমি আসীন কলকাতায়। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ কেটে গেছে, তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কালে-ভদ্রে হয়েছে পত্রালাপ। একখানি পত্রে তিনি আশা দিয়েছিলেন: 'এবার কলকাতায় গেলে তোমার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ ছাড়ব না।'

শুনলুম, একদিন তিনি দেখা করতে এসেওছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তখন বাড়ির বাইরে। দেখা হয়নি।

তার কয়েক বৎসর পরে প্রখ্যাত প্রমোদ-পরিবেশক স্বর্গীয় হরেন ঘোষের আস্তানায় অভাবিতভাবে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়েই আমার দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত। স্মৃতির পটে আঁকা আছে যুবক অসিতের ছবি, আর এ অসিত যে বৃদ্ধ—এমন চেহারা দেখবার কল্পনা মনে জাগেনি। ঋজু দেহ নত, কেশে জরার শুভ্রতা, বলিরেখাযুক্ত দেহের ত্বক। আমাকেও দেখে তাঁর মনে নিশ্চয়ই অনুরূপ ভাবের উদয় হয়েছিল। 'এই নরদেহ।'

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

পুরাতন বন্ধু। কিছু-কম পাঁচ যুগ আগে প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে হয় আমার প্রথম পরিচয়। পৃথিবীর নাট্যশালায় আজও আমার যে দুই-চারজন সত্যকার মরমি বন্ধু বিদ্যমান আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন প্রেমাঙ্কুর। আমার কাছে তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বা প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক নন, আমার কাছে তিনি বন্ধু—কেবল বন্ধুই। এই বিষাক্ত দুনিয়ায় অকপট বন্ধুলাভ যে কতটা দুর্ঘট, দুনিয়াদারিতে ভুক্তভোগীর কাছে তা অবিদিত থাকবার কথা নয়।

প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন কেবল সাহিত্যরসিক। কিন্তু লেখক হবার জন্যে তখনই যে গোপনে হাতমক্স শুরু করেছেন, সে প্রমাণ পেয়েছিলুম অল্পদিন পরেই।

সুধাকৃষ্ণ বাগচী এক তৃতীয় শ্রেণির যুবক, তার মূলমন্ত্র ছিল—'ভুলিয়াও সত্য কথা কহিবে না।' নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'জাহ্নবী' নামে মাসিক কাগজ উঠে যাবার কয়েক বৎসর পরে সে ওই নামেই আর একখানি পত্রিকা প্রকাশ করে। নামে সেই-ই ছিল সম্পাদক, কিন্তু তার রচনাশক্তি বা সম্পাদকের উপযোগী বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না। পত্রিকা পরিচালনার ভার নিয়ে যে কয়েকজন তরুণ যুবক তখন 'জাহ্নবী' কার্যালয়ে ওঠা-বসা করতেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই আজ বিভিন্ন বিভাগে হয়েছেন দেশের ও দশের কাছে সুপরিচিত। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (পরে অধুনালুপ্ত দৈনিক 'ভারতে'র সম্পাদক), শ্রীঅমল হোম (পরে 'মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র সম্পাদক এবং এখন সরকারের প্রচারসচিব), শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার (পরে 'মৌচাক' সম্পাদক ও বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক), শ্রীচারুচন্দ্র রায় (পরে চিত্রকর ও চিত্র-পরিচালক রূপে নাম কেনেন) এবং শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী (পরে ঔপন্যাসিক ও চিত্র-পরিচালক)। এই দলে আর একজনও ছিলেন, পরে ভেস্তে গিয়েছেন কেবল তিনিই। তাঁর নাম শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত। কার্যক্ষেত্রে আরম্ভ করেছিলেন তিনি আশাপ্রদ জীবন। কাজ করতেন সুরেন্দ্রনাথের বিখ্যাত দৈনিক 'বেঙ্গলী'র সম্পাদকীয় বিভাগে। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে 'বেঙ্গলী'কে ছেড়ে অবলম্বন করলেন মসির বদলে অসি—অর্থাৎ সৈনিকবৃত্তি। দেশে ফিরে হলেন সাবডেপুটি। ওই পর্যন্ত।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা মনে হচ্ছে। প্রেমাঙ্কুর আর আমারও জীবন হয়তো বদলে যেত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ইংরেজ গভর্নমেন্ট সেনাদলে ভরতি হবার জন্যে বাঙালি যুবকদের আহ্বান করেন। প্রেমাঙ্কুর ও আমি পরামর্শের পর স্থির করলুম, আমরাও ধারণ করব মসির বদলে অসি। বিপুল উৎসাহে আমি একদিন যথাস্থানে গিয়ে সেনাদলে নাম লিখিয়ে এলুম। প্রেমাঙ্কুর তো তখন থেকেই সেকালকার গোরা সৈনিকদের মতো খাটো করে চুল ছাঁটতে শুরু করে দিলেন। দুজনে মিলে দেখতে লাগলুম যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তাক্ত স্বপ্ন। সে যাত্রা সৈনিক হবে বলে নাম লিখিয়েছিল প্রায় ছয় শত জন বাঙালি যুবক। কিন্তু হঠাৎ গভর্নমেন্টের মত গেল বদলে। বললেন, না, আপাতত আর বাঙালি ফৌজের দরকার নেই। প্রথম ছয় শত জনের নাম খারিজ করে দেওয়া হল। কিছুদিন পরে আবার এল সরকারি আহ্বান—বাঙালি ফৌজ চাই। নতুন করে সবাই নাম লেখাও। আমাদের ভিতর থেকে সে আহ্বানে সাড়া দিলেন কেবল নরেশচন্দ্র। প্রেমাঙ্কুরের ও আমার সে প্রবৃত্তি আর হল না। প্রথম বারেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে জুড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের প্রতপ্ত উৎসাহ। ভুল করেছি বলে মনে হচ্ছে না। কারণ আজ জেনেছি অসির চেয়ে মসির শক্তিই বেশি। সারা পৃথিবীতে এখন এই যে 'কোল্ড ওয়ার' বা 'ঠান্ডা যুদ্ধ' চলছে, তার প্রধান অস্ত্রই তো হচ্ছে কালি ও কলম।

যাক। 'জাহ্নবী' কার্যালয়ের কথা হচ্ছিল। ওখানে আমিও প্রত্যহ যেতুম বটে, কিন্তু পত্রিকা পরিচালনার সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব ছিল না। আমি ছিলুম 'জাহ্নবী'র নিয়মিত লেখক। যে তরুণদের দলটি নিয়ে 'জাহ্নবী'র বৈঠকটি গঠিত হয়, তাঁদের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে আমিই ছিলুম তখন সবচেয়ে অগ্রসর, কারণ সে সময়ে 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'নব্যভারত', 'মানসী', 'অর্চনা' ও 'জন্মভূমি' এবং অন্যান্য বহু পত্রিকায় আমার অনেক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হত।

মনে ছিল তখন ভবিষ্যতের কত সম্ভাবনার ইঙ্গিত, সাহিত্যের রূপকথাই ছিল আমাদের আনন্দের একমাত্র সম্বল। সাহিত্যের মাদকতা আমাদের মত্ত করে তুলেছিল এবং সে নেশার ঘোর আজও কাটেনি। তখনও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল, যদিও তখনকার অধিকাংশ উদীয়মান সাহিত্যিকের গুরুস্থানীয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথই। নাট্যসাহিত্যে চলছে তখন দ্বিজেন্দ্রলালের যুগ। 'বিন্দুর ছেলে' ও 'রামের সুমতি' প্রভৃতি গল্প বোধ হয় তখনও বেরোয়নি কিংবা সবে বেরিয়েছে, কিন্তু সুপরিচিত লেখক হিসাবে জনসাধারণের বা আমাদের মনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোনও স্থানই ছিল না।

বয়সে ছিলুম সকলেই তরুণ, বয়সের ধর্মকে অস্বীকার করতেও পারতুম না। ঝোঁকের মাথায় প্রায়ই তুমুল তর্কাতর্কির ঝড়ের ভিতরে গিয়ে পড়তুম। এখন সেই বালকতার কথা মনে করলেও হাসি পায়, কিন্তু তখন সেই তর্কের হার-জিতের উপরে নির্ভর করত যেন আমাদের সমস্ত মানসম্ভ্রম। দু-পক্ষের একমাত্র লক্ষ্য থাকত, সুযুক্তি বা কুযুক্তির সাহায্যে

যেমন করেই হোক প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করা। কিন্তু মুখ তো বন্ধ হতই না, বরং আরও বেশি করে খুলে যেত।

একবার তর্ক বাধল বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে। একপক্ষে ছিলুম প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে আমি এবং অন্য পক্ষে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অন্যেরা থাকতেন মধ্যস্থের মতো। বাকবিতণ্ডা চরমে উঠলে উত্তেজিত হয়ে তারস্বরে চিৎকার করতুম আমরা তিনজনেই। তর্ক শুরু হত সন্ধ্যার আগে 'জাহ্নবী' কার্যালয়ে। সন্ধ্যার পর আসত রাত্রি। কার্যালয় বন্ধ হয়ে যেত। তবু বন্ধ হত না আমাদের বাকপ্রপঞ্চ। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের জনবহুল ফুটপাথের উপরে আমাদের তর্ক চলত অশ্রান্তভাবে। ওদিকে হেদুয়া আর এদিকে শ্রীমানী মার্কেট। ওদিক থেকে এদিকে আসি, আবার এদিক থেকে যাই ওদিকে এবং চলতে চলতে ফোটাই অনবরত কথার খই। মাঝে মাঝে হঠাৎ এত জোরে ছুড়ি বাক্যবন্দুক যে, রাজপথের চলমান পথিকরা চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক হয়ে তাকায় আমাদের মুখের দিকে। ক্রমে রাত বাড়ে, পথ জনবিরল হয়ে পড়ে, কিন্তু তর্ক থামে না। প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাত থাকেন এক পাড়ায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের আশেপাশে এবং আমি তখন থাকতুম পাথুরিয়াঘাটায় আমাদের পৈতৃক বাড়িতে। আমি যদি হই বাড়িমুখো, অন্য কেউ আমার সঙ্গ ছাড়তে নারাজ। বিডন স্ট্রিট ধরে চিৎপুর রোডের মোড়। তর্ক তখনও প্রবল। তাকে আধাখ্যাঁচড়া রেখে কারুরই বাড়ি যেতে মন সরে না। সবাই ঢুকি বিডন গার্ডেনে। আবার বসে তর্কসভা। মধ্য রাত্রি। বাধ্য হয়ে সবাই উঠে দাঁড়াই। প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাত প্রভৃতি নিজেদের পাড়ার দিকে পদচালনা করেন। হঠাৎ আমার মনে হয়, তূণের কতিপয় চোখা চোখা বাক্যবাণ এখনও ছোড়া হয়নি। আমিও সেইগুলি ব্যবহার করতে করতে আবার চলি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে। বিডন স্ট্রিটের আধখানা পার হয়ে আবার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে। তবু তর্ক থেকে যায় অমীমাংসিত। সেদিন অতৃপ্ত মনে সবাই বাড়ি ফিরলুম বটে, কিন্তু তর্কের খেই ধরা হল আবার পরদিন। এমনি চলল দিনের পর দিন। প্রত্যেকেই নাছোড়বান্দা।

পাড়ার লোকেরা দস্তুরমতো অতিষ্ঠ। প্রেমাঙ্কুরের পিতৃদেবের কাছে গিয়ে তারা নালিশ করলেন, 'মশাই, আপনার ছেলে আর তার বন্ধুদের উপদ্রবে এ-পাড়া থেকে ঘুমের পাট উঠে যেতে বসেছে। রোজ দুপুর রাত্রে তারা 'বঙ্কিমচন্দ্র' আর 'রবীন্দ্রনাথ' বলে এমন ভয়ানক জোরে বীভৎস তর্জনগর্জন করে যে, ঘুমোতে ঘুমোতে আমাদের আঁতকে জেগে উঠতে হয়। এ ভয়ানক কাণ্ড বন্ধ না করলে আমাদের প্রাণ তো আর বাঁচে না।'

চিৎকারে আমাদের মধ্যে প্রভাতই ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর একার কণ্ঠে ছিল চারজনের সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকার করবার শক্তি।

তর্কাতর্কি একেবারে ব্যর্থ হত না। তার মধ্যে থেকে পেয়েছি আমার কয়েকটি নূতন রচনার উপাদান। প্রেমাঙ্কুরও রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানি'কে বিশ্লেষণ করে প্রকাণ্ড একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন।

প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে স্থাপিত হল আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। প্রতিদিনই কেউ কারুকে না দেখে থাকতে পারি না। পরে পরে 'যমুনা', 'মর্মবাণী', 'সঙ্কল্প' ও 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকার আসরে, বিভিন্ন বন্ধুবাড়ির বৈঠকে, থিয়েটারে, সিনেমায়, গান-বাজনার মজলিসে—এমনকি কুস্তির আখড়ায় ও খেলাধুলোর মাঠেও আমাদের দুজনের আবির্ভাব হত একসঙ্গে মানিকজোড়ের মতো। এইভাবে কেটে গিয়েছে বৎসরের পর বৎসর, বহু বৎসর। শহরের ভিতরে এবং বাহিরে কত দিন রাত কাটিয়েছি এক শয্যায়।

কিন্তু জীবনসংগ্রাম একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও বিক্ষিপ্ত করে ইতস্তত, তাদের টেনে নিয়ে যায় পরস্পরের চোখের আড়ালে। আমি শিকড় গেড়ে মোতায়েন আছি সাহিত্য-ক্ষেত্রেই, কিন্তু প্রেমাঙ্কুর যেদিন থেকে প্রবেশ করেছেন সিনেমা জগতে, সেই দিন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় ন-মাসে ছ-মাসে। তবে আমাদের মনের সম্পর্ক যে আজও একটুও শিথিল হয়নি, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই সেটুকু বুঝতে বিলম্ব হয় না।

গোড়ার দিকেও তিনি আর একবার বেশ কিছুকালের জন্যে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়ে চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিছুকাল পরে আবার হন বেকার। কিন্তু তাঁর মতন একজন মনীষী ব্যক্তির অলস হয়ে বসে থাকাটা আমার ভালো লাগেনি। সেই সময়ে স্বর্গীয় ললিতমোহন গুপ্ত 'হিন্দুস্থান' নামে একখানি ভালো দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং আমি ছিলুম তার একজন নিয়মিত লেখক। প্রেমাঙ্কুরকেও আমি 'হিন্দুস্থানে'র সম্পাদকীয় বিভাগে ভিড়িয়ে নিই (পত্রিকাখানি ছয় বৎসর ধরে চলেছিল)। তারপর থেকে তাঁর লেখনী হয়ে ওঠে রীতিমতো সচল। পরে পরে তিনি রচনা করেন অনেকগুলি জনপ্রিয় গল্প ও কয়েকখানি উপন্যাস। ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে তাঁর হাতযশ। পরিচিত হন তিনি 'ভারতী' গোষ্ঠীভুক্ত অন্যতম বিখ্যাত লেখকরূপে। তাঁর সাহিত্য সাধনার সম্যক পরিচয় দেবার স্থান এখানে নেই। তবে এটুকু উল্লেখ করা চলে যে, জীবনের পূর্বার্থে তিনি লোকপ্রিয় সুলেখক বলে সুনাম কিনেছিলেন বটে, কিন্তু 'মহাস্থবির জাতক' রচনা করে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন প্রাচীন বয়সেই। প্রায় দুই যুগ আগে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন—'তখৎ-এ-তাউস'। সম্প্রতি তা মঞ্চস্থ হয়েছে শিশিরকুমারের 'শ্রীরঙ্গমে'। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ঝোঁক ছিল নাট্যকলার দিকে। তরুণ বয়সেই তিনি শৌখিন অভিনয়ে যোগ দিতেন এবং পরিণত বয়সে এই নাট্যানুরাগের জন্যেই আকৃষ্ট হন চলচ্চিত্রের দিকে। কেবল পরিচালনায় নয়, চিত্রাভিনয়েও তাঁর দক্ষতা আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে নিউ থিয়েটারের 'পুনর্জন্ম' কথাচিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন প্রধান ভূমিকায়।

বন্ধুরা সকলেই তাঁর সঙ্গ প্রার্থনা করে। তাঁর উপস্থিতিতে সরস ও সজীব হয়ে ওঠে যে-কোনও শ্রেণির বৈঠক। মিশতে পারেন তিনি শিল্পীদের সঙ্গে শিল্পীর মতো, আবার রাম-শ্যামের সঙ্গে রাম-শ্যামের মতো। তাঁর মুখে হাসির বুলি ও হাসির গল্প জমে ওঠে অপূর্বভাবে। এমন গল্পিয়া মানুষ আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে আমি আর দেখিনি। অতি

সাধারণ কথা তাঁর ভাষণ-ভঙ্গিতে হয়ে ওঠে অতি অসাধারণ। আজ তিনি রোগজর্জর, জরাকাতর, কিন্তু এখনও মন তাঁর হয়ে আছে চিরহরিৎ, কথায় কথায় সেখান থেকে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে হাসিরাঙা রসের ফোয়ারা।

একদিন বৈকালে বাড়ির ত্রিতলে রচনাকার্যে নিযুক্ত হয়ে আছি, হঠাৎ রাস্তা থেকে ডাক শুনলুম, 'হেমেন্দ্র, হেমেন্দ্র!'

জানলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে?'

—'আমি প্রেমাঙ্কুর।'

বহু—বহুকাল অদর্শনের পর আচম্বিতে প্রেমাঙ্কুরের এই অভাবিত আবির্ভাব কেন? নীচে গিয়ে শুধালুম, 'ব্যাপার কী?'

প্রেমাঙ্কুর অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল, দুনিয়ায় আমি একা। তুমি ছাড়া আমার আর কোনও বন্ধু নেই। তাই ছুটতে ছুটতে তোমার কাছেই চলে এসেছি।'

অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে আমরা 'ভারতী'র আসরে বাস করতুম একটি সুখী পরিবারের মতো। সে আসর ভেঙে গেছে, প্রায় সব দীপ নিবে গেছে। দু-তিনটি জীবনদীপ এখনও টিমটিম করে জ্বলছে বটে, কিন্তু তাদেরও তেল ফুরোতে দেরি নেই।

অহীন্দ্র চৌধুরী

মাত্র দুই বৎসর। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে বাংলা নাট্যকলার মোড় ঘুরে গেল একেবারে। যা ছিল ক্ষীণ, জরাজর্জর, লাভ করলে তা তাজা রক্ত, উত্তপ্ত যৌবন। পুরাতন সরে দাঁড়াল পিছনে, নূতন এগিয়ে এল সামনে। এই অভাবিত আকস্মিক পরিবর্তন বিস্ময়কর।

মনোমোহন থিয়েটারে বৃদ্ধ দানীবাবু করছিলেন নিশ্চিন্তভাবে অতীতের রোমন্থন। পূর্বসঞ্চিত পুঁজি ভাঙিয়ে কোনও রকমে চালিয়ে দিচ্ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় যে দানীবাবুকে একই ভূমিকায় বারংবার দেখে দেখেও আমাদের আশা মিটতে চাইত না, 'মনোমোহনে'র নূতন নাটকেও তিনি আর দিতে পারতেন না নূতনত্বের পরিচয়। চলাফেরা, অঙ্গহার, সংলাপ, সব-কিছুর ভিতরেই আগে যা দেখেছি ও শুনেছি, আবার তাই-ই প্রকাশ পেত। তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা অভিনয় করতেন, তাঁরা ছিলেন আবার রীতিমতো বাজে মার্কার। বিয়োগান্ত নাটককেও তাঁরা প্রহসনে পরিণত করতে পারতেন অবলীলাক্রমে।

এই ভাঙা হাটে প্রথমে এসে দাঁড়ালেন শিশিরকুমার। তাঁর কয়েক মাস পরে এলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র মিত্র। তারই অল্পদিন পরে দেখা দিলেন নির্মলেন্দু

লাহিড়ী। এবং তারপর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে আমরা এক সঙ্গে লাভ করলুম দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী ও অহীন্দ্র চৌধুরীকে। ভাঙা হাট জমে আবার সরগম হয়ে উঠল। এ সব হচ্ছে মাত্র দুই বৎসরের ঘটনা।

রেনেসাঁস পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লেগেছিল আরও কিছুকাল। শেষোক্ত দলের শিল্পীরা যখন দেখা দেন, শিশিরকুমার ছিলেন তখন যবনিকার অন্তরালে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে নাট্যজগতে হয় তাঁর পুনঃপ্রবেশ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হয় 'মনোমোহনে'র পতন। ক্রমে শিশিরকুমারের চারিপাশে এসে দাঁড়ালেন ললিতমোহন লাহিড়ী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, অমিতাভ বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায় ও জীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। লুপ্ত হয়ে গেল বাংলা রঙ্গালয়ের গতানুগতিক ধারা। নূতন স্রোত এল পুরাতন খাতে। সেই স্রোত এখনও চলছে। তখনকার নবীনরা আজ হয়েছেন প্রবীণ। অনেকে পরলোকে গিয়েছেন। তাঁদের স্থান গ্রহণ করেছেন নূতন নূতন শিল্পী। সৌভাগ্যক্রমে এখানকার সর্বাগ্রগণ্য ও সৃষ্টিক্ষম দুইজন শিল্পী আজও সক্রিয় অবস্থায় আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। ওঁদের একজন হচ্ছেন শিশিরকুমার, আর একজন অহীন্দ্র চৌধুরী।

নবযুগের অধিকাংশ অভিনেতার মতো অহীন্দ্রেরও হাতেখড়ি হয়নি সাধারণ রঙ্গালয়ে। তাঁরও নাট্যসাধনা শুরু হয়েছিল শৌখিন নাট্যজগতেই। কেবল তাই নয়। পেশাদার রঙ্গালয়ে মঞ্চাভিনয়ে যোগ দেবার আগেই তিনি চলচ্চিত্রের পর্দাতেও দেখা দিয়ে নিজের নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন। অধুনালুপ্ত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'কল্লোলে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ডাঃ কালিদাস নাগের ভ্রাতা স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্র নাগ প্রভৃতির চেষ্টায় 'ফোটো প্লে সিন্ডিকেট অফ ইন্ডিয়া' নামে একটি চিত্র-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। তার প্রথম ছবির নাম 'সোল অফ এ স্লেভ'। নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁর অভিনয় বেশ উতরে গিয়েছিল।

সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর প্রথম ভূমিকা হচ্ছে 'কর্ণার্জুন' নাটকে অর্জুন। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি। দীর্ঘ, সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহ এবং সুশ্রী মুখ, নাকের উপযোগী আদর্শ চেহারা। গম্ভীর, উদাত্ত ও ভাবব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর। গলায় স্বরের খেলায় বেশি বৈচিত্র্য না থাকলেও ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শিত হয় সুকৌশলে। সংলাপ ও অঙ্গহারের মধ্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে একজন জাত-অভিনেতা এবং পরিপক্ক শক্তি নিয়েই রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছেন, তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে সে কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

অদূর ভবিষ্যতেই তিনি নাম কিনবেন, এটুকু অনুমান করতে আমার বিলম্ব হয়নি। নাট্যজগতে নিজেকে আমি 'ভেটার‍্যান' দর্শক বলে মনে করতে পারি (ভেটার‍্যান অভিনেতা যদি থাকতে পারে, তবে ভেটার‍্যান দর্শকই বা থাকবে না কেন?)। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত অভিনয় দেখে দেখে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম, একবার দেখলেই চিনতে পারি ভালো অভিনেতাকে। তাই অহীন্দ্র চৌধুরীকেও চিনতে বিলম্ব হয়নি।

কিন্তু একজন উঁচুদরের চৌকস শিল্পীকে যাচাই করতে হলে অর্জুন ভূমিকাটি বেশি কাজে লাগবে না। শিল্পীর শ্রেষ্ঠতার আদর্শ কী, তিনি কতটা উঁচুতে ও কতটা বৈচিত্র্য দেখাতে পারেন, সে প্রমাণ পেতে গেলে দরকার অন্য রকম ভূমিকার। 'কর্ণার্জুনে'র পর অহীন্দ্র আরও কোনও কোনও নাটকে দেখা দেন। প্রতিবারেই করেন উল্লেখযোগ্য অভিনয়। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও তাঁর যথার্থ শক্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পারিনি।

তারপরেই হল তাঁর প্রকৃত আত্মপ্রকাশ। উপর উপরি রবীন্দ্রনাথের দুইখানি নাটকে ('চিরকুমার সভা' ও 'গৃহপ্রবেশ') তিনি যথাক্রমে গ্রহণ করলেন চন্দ্র ও যতীনের ভূমিকা। দুটি ভূমিকাই সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী। একটি হাস্যতরল ও আর একটি অশ্রুসজল। চন্দ্রবাবু নিজে হাসেন না, বরং গম্ভীর হয়েই থাকেন, কিন্তু লোকে তাঁর ভাবভঙ্গি, চলনবলন, অন্যমনস্কতা ও মুদ্রাদোষ প্রভৃতি দেখে হেসে খায় লুটোপুটি। অনেকটা এই শ্রেণির অধ্যাপককে বাস্তবজীবনেও আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না। চন্দ্রের ভূমিকায় অহীন্দ্রের অপরূপ অভিনয় নাট্যজগতে কেবল আলোড়ন ও উত্তেজনা সৃষ্টিই করলে না, সেই সঙ্গে সকলকে দেখিয়ে দিলে কতখানি উন্নত শক্তির অধিকারী তিনি। ভূমিকার উপযোগী প্রকৃতি-নির্দেশক রঙ্গসজ্জার দ্বারাও তিনি দর্শকদের করলেন চমৎকৃত।

তারপর যতীনের ভূমিকা। অত্যন্ত কঠিন ভূমিকা। কেবল সুকঠিন নয়, বাংলা রঙ্গালয়ের এমন নূতন রকম ভূমিকা আর কখনও দেখা যায়নি—আগেও না, পরেও না। একটিমাত্র দৃশ্য, নাটকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যধিগ্রস্ত, মৃত্যুন্মুখ উত্থানশক্তিহীন যতীন শয্যাশায়ী অবস্থায় সংলাপ চালিয়ে যাবে হিমীর (শ্রীমতী নীহারবালা) সঙ্গে। মেলো-ড্রামাটিক ভাবভঙ্গি ও প্যাঁচ দেখাবার, চিৎকার ও রঙ্গমঞ্চ পরিক্রমণ করবার এতটুকু সুযোগ নেই, তবু সেই নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট অবস্থাতেই নাটকের প্রাণবস্তু ফুটিয়ে তুলে এবং ভাবভিব্যক্তির চরমে উঠে কেবল সংলাপ সম্বল করেই অহীন্দ্র সকলকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। দুইবার দেখেছি 'গৃহপ্রবেশ' এবং দুইবারই অহীন্দ্রের অনুপম শক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে ফিরে এসেছি। আরও দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের অরসিক দর্শকদের অনাদরে 'গৃহপ্রবেশে'র পরমায়ু হয়েছিল অতিশয় সংক্ষিপ্ত। 'গৃহপ্রবেশে'র মধ্যে যে আধুনিক উচ্চতর শ্রেণির নাটকীয় ক্রিয়া ছিল, তা শারীরিক নয়, সম্পূর্ণরূপেই আন্তরিক। তাই প্রাকৃতজনদের পক্ষে তা হয়েছিল রীতিমতো গুরুপাক। রুশিয়ার নাট্যকার লিওনিড আন্দ্রিভ এই শ্রেণির নাটক রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ বয়সে আমাদের গিরিশচন্দ্রও এই শ্রেণির নাটকরচনার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁর বাসনা পূর্ণ হতে দেয়নি।

ব্যবসায়ের দিক দিয়ে 'গৃহপ্রবেশ' জমল না। কিন্তু গৌরবের দিক দিয়ে আর্ট থিয়েটার হল প্রভূত লাভবান এবং যশের দিক দিয়ে অহীন্দ্রের তারকা হল নিরতিশয় উর্ধ্বগামী। সবাই বুঝলে, তিনি কেবল বাংলা দেশের একজন প্রথম শ্রেণির অভিনেতা নন, কোনও কোনও বিভাগে সত্য সত্যই অতুলনীয়।

স্টারে মঞ্চস্থ হল 'চন্দ্রগুপ্ত', অহীন্দ্র সেলুকসের ভূমিকায়। প্রথমে সেলুকস সাজতেন প্রিয়নাথ ঘোষ, তারপর কুঞ্জলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি। তাঁদের দেখানো সেলুকসের ছবি মুছে দিলে অহীন্দ্রের অভিনয়।

বিজ্ঞাপিত হল, অহীন্দ্র দেখা দেবেন ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকের নামভূমিকায়। কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে ওই বিশেষ ভূমিকাটিতে অবিস্মরণীয় অসাধারণ অভিনয় করে শিশিরকুমার কিনেছিলেন এমন তুলনাহীন নাম যে, অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ অভিনেতাও ওর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে সাহস করতেন না। নির্মলেন্দু লাহিড়ীও আলমগীর সেজেছিলেন বটে, কিন্তু মফস্‌সলে। অহীন্দ্রের দুঃসাহস দেখে সকলেই বিস্মিত। আমিও কৌতূহলী হয়ে নির্দিষ্ট দিনে অহীন্দ্রের অভিনয় না দেখে থাকতে পারলুম না। তারপর অভিনয় দেখে বুঝলুম, তিনি হচ্ছেন দস্তুরমতো সুকৌশলী শিল্পী। জানি না যে-কোনও কারণে তিনি ওই ভূমিকাটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কি না, কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মতোই নিজের মান রক্ষা করে তিনি দিলেন বিশেষ চাতুর্যের পরিচয়। কোনও শ্রেষ্ঠ শিল্পীই যে কোনও ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে পারেন না, যে ভূমিকা রামের উপযোগী, তা শ্যামের উপযোগী না হতেও পারে। আলমগীর ভূমিকাটি অহীন্দ্রের উপযোগী ভূমিকা নয়। কিন্তু তবু তাঁর অভিনয় নিরেস হল না। ওই ভূমিকাটির স্থানে স্থানে সংলাপের মধ্যে আছে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনের দ্বারা শিশিরকুমার যা চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত করেন। অহীন্দ্র কিন্তু সেভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশের চেষ্টা করলেন না, তাঁর সংলাপ হল কাটা কাটা। আলমগীর ভূমিকায় তিনি দিলেন একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারণা, তাঁর সঙ্গে কেউ শিশিরকুমারের তুলনা করবার অবসরই পেলে না। এমনকি তাঁর রঙ্গসজ্জা পর্যন্ত হল অভিনব।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবদ্দশায় তাঁর 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের কয়েকটি ভূমিকার উপযোগী অভিনয় হয়নি। চন্দ্রগুপ্ত, আন্টিগোনাস ও সেলুকস প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন নবযুগের অভিনেতারাই। তাঁর 'সাজাহানে'র নাম ভূমিকাকেও সর্বপ্রথমে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন অহীন্দ্র চৌধুরীই।

আরও কত ভূমিকায় অহীন্দ্র করেছেন স্মরণীয় অভিনয়। এখানে তার ফর্দ দাখিল করা সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রক্ষেত্রেও আছে তাঁর ব্যাপক প্রাধান্য। মঞ্চের উপরে এবং পর্দার গায়ে তাঁকে দেখা গিয়েছে যত ভূমিকায়, তত বোধ হয় আর কারুকেই নয়। আজ প্রাচীন বয়সেও তিনি অশ্রান্তভাবে দেখা দিচ্ছেন নানা শ্রেণির ভূমিকার পর ভূমিকায়। অসাধারণ তাঁর সহনশক্তি। এক এক দিন দিবাভাগে তিনি যোগ দিয়েছেন চিত্রাভিনয়ে এবং রাত্রে করেছেন একাধিক রঙ্গালয়ে একাধিক ভূমিকায় অভিনয়। কেবল গম্ভীর ও উচ্চশ্রেণির হাস্যরসাত্মক ভূমিকায় নয়, 'লো-কমিক' অভিনয়েও তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব দেখেছিলুম 'লাখটাকা' হাস্যনাট্যের একটি ভূমিকায়!

ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছি অসংখ্যবার।

বাকপ্রপঞ্চে অহীন্দ্রের উল্লেখযোগ্য অসাধারণতা নেই বটে, আগে আগে রঙ্গালয়ের অভিনয় শেষ করে প্রায়ই তিনি আমার বাড়িতে পদার্পণ করতেন। হরেক রকম আলাপ-আলোচনায় কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আমাদের অজ্ঞাতসারেই। তারপর যখন রাত্রে ডিনার খেতে বসতুম, তখন হয়তো কলরব করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ভোরের পাখিরা।

একদিন রাত দুপুরে হঠাৎ আমার খেয়াল হল, কলকাতার কাছাকাছি কোনও ডাকবাংলোয় বেড়িয়ে আসতে।

অহীন্দ্র বললেন, 'কলকাতার খুব কাছে ডাকবাংলো আছে রাজারহাট বিষ্ণুপুরে।'

বললুম, 'চলো তবে যাই সেখানে।'

অহীন্দ্রও নারাজ নন। তখনই এল ট্যাক্সি। আমরা যাত্রা করলুম রাজারহাট বিষ্ণুপুরে। উল্লেখযোগ্য ডাকবাংলো নয় বটে, কিন্তু বন্ধুর সান্নিধ্য সব স্থানকেই করে তোলে সুমধুর। সেখানেই রাত কাবার করে ফিরে এলুম পরদিনের ভোরবেলায়।

কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অনেককেই তো দেখলুম—কবি, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক, চিত্রকর, ঐতিহাসিক, গায়ক-গায়িকা, নট-নটী, নর্তক—এমনকি মল্ল পর্যন্ত। কিন্তু আধুনিক কোনও নাট্যকারের সঙ্গে এখনও পাঠকদের পরিচিত করা হয়নি।

বাংলা নাট্যজগতে স্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছেন মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলাল। প্রথমোক্ত দুইজনকে কখনও চোখে দেখবারও সৌভাগ্য হয়নি। বাকি কয়েকজনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি এবং তাঁদের কথা নিয়ে অন্যত্র আলোচনাও করেছি।

এটা বাংলা দেশের জল-বাতাসের গুণ কি না জানি না, কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করে বিস্মিত হতে হয়। এখানে নানা বিভাগে যাঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, বরণীয় ও অতুলনীয়, তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছেন প্রথম দিকেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা পরে পরে পেয়েছি যেসব শক্তিধরকে, আজ তাঁদের সঙ্গে তুলনা করবার মতো মানুষ গোটা বাংলা দেশ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তুলনা করব কী, বাংলার রাজনীতি আজ প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছে বললেও চলে। কথাসাহিত্যেও আমরা পরে পরে পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে। আধুনিক কথা-সাহিত্যিকদেরও লেখনী প্রসব করছে কাঁড়ি কাঁড়ি রচনা, কিন্তু সেগুলি ধারে কাটে না ভারে কাটে সে কথা 'বুঝ নর যে জানো সন্ধান'। চিত্রকলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও যামিনী রায় প্রভৃতিকে সমসাময়িক বলতে পারি। কিন্তু তার পরেই বাংলা চিত্রশিল্পের ধারা হয়ে পড়েছে ক্ষীয়মাণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধ থেকে

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত বাগ্মিতার জন্যে বাংলা দেশ ছিল বিখ্যাত। কিন্তু এখন? কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র প্রভৃতির বাগবৈদগ্ধের কথা ছেড়েই দিই, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল বসুর মতো বৈঠকি-সংলাপ জমিয়ে তুলতে পারেন, এমন লোকও আজ দুর্লভ। আরও নানা বিভাগের কথা তোলা যেতে পারে, কিন্তু পুঁথি না বাড়িয়ে কেবল নাট্য-বিভাগের দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক।

এদেশে আমরা যাঁদের প্রথম শ্রেণির নাট্যকার বলে মনে করি, তাঁদের কেহই আধুনিক যুগের মানুষ নন। সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে নবযুগ আসবার আগেই তাঁদের দান ফুরিয়ে গিয়েছিল। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পরেও ক্ষীরোদপ্রসাদ কিছুদিন লেখনী চালনা করেছিলেন বটে, কিন্তু তার আগে থেকেই তাঁর শক্তি হয়ে পড়েছিল যথেষ্ট রিক্ত। 'আলমগীর' অবলম্বন করেই শিশিরকুমার দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু ও-নাটকখানি বিখ্যাত হয়েছে নাটকত্বের জন্যে নয়, শিশিরকুমারের অভিনয়গুণেই। আসলে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা নাটকের স্বর্ণযুগ অতীত হয়ে গিয়েছিল। শিশিরকুমারের 'নাট্যমন্দির' যখন চলছে, তখন অমৃতলাল 'যাজ্ঞসেনী' নামে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু ও-রকম একটি কি দুটি রচনা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

গিরিশোত্তর যুগ হচ্ছে বাংলা নাট্যজগতের অন্ধ-যুগ। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের আগে এক যুগের মধ্যে একজনমাত্র উল্লেখযোগ্য নূতন অভিনেতার দেখা পাওয়া যায়নি; এবং সাড়া পাওয়া যায়নি একজনমাত্র প্রথম শ্রেণির নূতন নাট্যকারেরও। এ সময়ে নাটক রচনা করে সুপরিচিত হয়েছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত বসু, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনজন ছিলেন প্রায় তুল্যমূল্য। তাঁদের রচনাও ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত। নির্মলশিবেরও কোনও কোনও রচনা হয়েছিল সহনীয়। বাকি তিনজন ছিলেন সবচেয়ে লোকপ্রিয় এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণির। তাঁদের নাটকে ছিল না কোনও মহৎ ভাব বা নিজস্ব রচনাভঙ্গি। কিন্তু হেটো দর্শকদের গ্রাম্য মনোবৃত্তিকে উত্তেজিত করবার কৌশল আয়ত্তে এনে তাঁরা বাজার একেবারে দখল করে ফেলেছিলেন। কৌতূহলী হয়ে সাহস সঞ্চয় করে ওঁদের তিনজনেরই এক-একখানি নাটকের অভিনয় আমি দেখতে গিয়েছিলুম, কিন্তু তারপরেই আমার কৌতূহল দস্তুরমতো ঠান্ডা হয়ে যায়। তেমন সব ওঁচা রচনাও যে রঙ্গালয়ের মালিকের সামনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খুলে দিতে পারে, সে জ্ঞান আমার ছিল না। তারপরে বহু রাত্রেই রঙ্গালয়ের নেপথ্যে উপস্থিত ছিলুম। মঞ্চের উপরে 'বঙ্গে বর্গী' প্রভৃতির অভিনয় চলেছে, কিন্তু কোনও দিনই প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বসবার আগ্রহ হয়নি।

কিন্তু কেবল রাবিসের পর রাবিসের দ্বারা কতদিন একটা জাতির চিত্ত আচ্ছন্ন করে রাখা যায়? দিনে দিনে লোকের চোখ ফুটতে লাগল। প্রেক্ষাগারে শিক্ষিত দর্শকের সংখ্যাবৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে এ শ্রেণির পালার চাহিদা কমে এল। বোধ করি নাট্যকারের জনপ্রিয়তা দেখেই শিশিরকুমারও এই দলের একজনের একটি পালা মঞ্চস্থ করেছিলেন। কিন্তু দর্শকরা তখন সচেতন হয়ে উঠেছে। শিশিরকুমারের প্রতিভাও পালাটিকে দীর্ঘায়ু করতে পারেনি।

'বঙ্গে বর্গী' ও 'মোগল-পাঠান' প্রভৃতি নাটকের আসর মাটি হল বটে, কিন্তু নূতন যুগের নূতন নাট্যকারের সাড়া পাওয়া গেল না। অপরেশচন্দ্র, বরদাপ্রসন্ন ও ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ওঁরা সকলেই প্রায় সমশ্রেণির নাট্যকার। এই সময়ে একাধিক রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নাটক উপর-উপরি অভিনীত হয়। 'চিরকুমার সভা', 'শোধবোধ', 'পরিত্রাণ', 'বিসর্জন' ও 'শেষরক্ষা' প্রভৃতি। তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ', 'ষোড়শী'। গিরিশোত্তর যুগে এই সময়ে প্রথম রঙ্গালয়ে নাটকের মান বেড়ে ওঠে।

শ্রীমন্মথ রায়ও প্রবেশ করলেন নাট্যজগতে। তাঁর ভাষা ও রচনাভঙ্গি প্রশংসনীয় হলেও তাঁর নাটকীয় বিষয়বস্তু ছিল না আধুনিক। ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও একাধিকবার নাট্যজগতে দেখা দিয়েও শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকলেন না। কবি শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ও নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এসেছিলেন আরও কেউ কেউ, কিন্তু আসর বেশিদিন রাখতে পারেননি।

বাংলা নাটকের যখন শোচনীয় দুরবস্থা, সেই কুখ্যাত 'মনোমোহন' আমলেই এখানে নূতন নাট্যকার রচিত নবযুগের উপযোগী প্রথম নাটক অভিনীত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। ম্যাডানদের রঙ্গালয়ে খোলা হয় স্বর্গীয় সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুক্তার মুক্তি'। কিন্তু একে শিশিরকুমারকে সদ্য হারিয়ে ম্যাডানদের রঙ্গালয় তখন গৌরবচ্যুত হয়ে পড়েছে, তার উপরে 'বঙ্গে বর্গী' ও 'মোগল-পাঠানে'র কোলাহলে নাট্যজগৎ এমন পরিপূর্ণ হয়েছিল যে, এই চমৎকার পালাটির দিকে লোকের দৃষ্টি ভালো করে আকৃষ্ট হয়নি। মণিলালের মধ্যে সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তিনি অকালেই পরলোকগমন করেন।

এখানে আধুনিক যুগোপযোগী দ্বিতীয় নাটক হচ্ছে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'রক্তকমল'। চিত্রজগতে সুপরিচিত স্বর্গীয় অনাদিনাথ বসু যখন মনোমোহন থিয়েটারের ভার গ্রহণ করেছেন, সেই সময়েই সেখানে এই পালাটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকখানি আমার ভালো লেগেছিল এবং নাট্যমার্গ ত্যাগ না করলে শচীন্দ্রনাথ যে এ বিভাগে স্মরণীয় অবদান রেখে যাবেন, এটাও মনে মনে বুঝতে পেরেছিলুম।

শচীন্দ্রনাথ যখন সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদক এবং আমি তার নিয়মিত লেখক, সেই সময়েই আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম। কিন্তু সে কেবল মৌখিক পরিচয়। তখন তিনি ছিলেন সাংবাদিক। নাট্যজগৎ যে তাঁর কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারে, একথা আমি জানতুম না এবং তিনি নিজেও বোধ হয় জানতেন না।

যতদূর মনে পড়ছে, সুলিখিত ও সুঅভিনীত হলেও এবং প্রশংসা অর্জন করেও 'রক্তকমল' উচিতমতো অর্থ অর্জন করতে পারেনি। তখনকার দিনে নাটক আকারে মস্ত এবং ওজনে গুরুভার না হলে জনসাধারণের চিত্তরোচক হত না। সামাজিক নাটকের একেলে ভঙ্গিও

বোধ করি দর্শকদের ভালো লাগত না। এই কারণে শচীন্দ্রনাথের আরও কোনও কোনও উৎকৃষ্ট রচনা লোকপ্রিয় হয়নি। যেমন 'ঝড়ের রাতে' ও 'জননী'। বাঙালি দর্শকদের এই অদ্ভুত মনের ভাব আজও পরিবর্তিত হয়নি। এই সেদিনেও 'শ্রীরঙ্গমে' অভিনীত পরম উপাদেয় সামাজিক নাটক 'পরিচয়' রসিকজনদের খুশি করেও সাধারণ দর্শকদের অভিনন্দন পায়নি। আমাদের জনসাধারণের মন বুড়িয়ে পড়েছে। তারা আজও চলতে চায় সেকেলে বাঁধা রাস্তা ধরে, নতুন পথে পা বাড়াতে ভরসা করে না।

কিছুদিন পরে মনোমোহন থিয়েটারের পরিচালক ও মালিক হলেন বন্ধুবর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ। প্রথমেই খুললেন শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' এবং তারপর শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহুয়া'। আমাকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন তাঁর রঙ্গালয়ে নৃত্য পরিকল্পনার জন্যে। শচীন্দ্রনাথও সেখানে নিয়মিতভাবে আনাগোনা করতেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে উঠল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তারপর সেখানে শচীন্দ্রনাথের 'গৈরিক পতাকা' খোলবার আয়োজন হয়। প্রথমে আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল, গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি'র পর শিবাজীকে অবলম্বন করে রচিত আর কোনও নাটক দর্শকরা গ্রহণ করবে কি না? কিন্তু পাণ্ডুলিপি পাঠ করে সে সন্দেহ দূর হল। যদিও নাটকখানি পুরাতন আদর্শেই রচিত, তবু তার আখ্যানে নূতনত্ব ও চরিত্রচিত্রণে নিপুণতা ও ভাষায় বিষয়োপযোগী দৃঢ়তা এবং গাম্ভীর্যের পরিচয় পেলুম যথেষ্ট।

পালাটি মঞ্চস্থ করবার জন্যে প্রবোধবাবু প্রচুর পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও আয়োজন করেছিলেন। গান রচনা ও নৃত্য পরিকল্পনার ভার পড়েছিল আমার উপর (এবং কোনও কোনও গানে সুরও দিয়েছিলুম আমি)। তারপর থেকে 'নাট্য-নিকেতনে' অভিনীত শচীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকেই আমাকে ওই দুটি কর্তব্য পালন করতে হয়েছে। যেন একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, শচীন্দ্রনাথের লেখনী নূতন নাটক প্রসব করলেই গান লিখতে ও নাচ দিতে হবে আমাকেই।

তোড়জোড় দেখেই অনুমান করতে পেরেছিলুম, 'গৈরিক পতাকা' মন্দ চলবে না। তবে খুব একটা বড়ো কিছুর আশা করিনি। কিন্তু পালাটি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করলে, সেটা আমরা কেহই কল্পনাতেও আনতে পারিনি। ওই বাড়িতেই 'সীতা' খোলা হয় এবং তার অসামান্য লোকপ্রিয়তার কথা কারুর কাছেই অবিদিত নেই। কিন্তু 'গৈরিক পতাকা' দেখবার জন্যে প্রথম কয়েক রাত্রে প্রেক্ষাগৃহে যে মহতী জনতা সমাগত হয়েছিল তার নিবিড়তা ছিল 'সীতা'র চেয়েও বেশি। বিডন স্ট্রিট দিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যেত এবং ভিড় সামলাবার জন্যে পুলিশবাহিনী মোতায়েন রাখতে হত। জনতাকে নিয়মিত করবার জন্যে রঙ্গালয়ের অঙ্গনেও বাঁশের বেড়া বাঁধতে হয়েছিল।

'গৈরিক পতাকা' শচীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা নয়। তিনি তার চেয়ে ভালো একাধিক নাটক রচনা করেছেন। তার গঠন ও আবেদনও অল্পবিস্তর মামুলি। হয়তো সেইটেই তার কাজে

লেগে গিয়েছে। আগেই ইঙ্গিতে বলেছি, এদেশি দর্শকদের মন আজও অতিআধুনিক বাস্তব নাটকের জন্যে প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি। নবযুগেও এখানে যেসব নাটক (কর্ণার্জুন, সীতা, আত্মদর্শন, দিগ্বিজয়ী ও গৈরিক পতাকা) সবচেয়ে লোকপ্রিয় হয়েছে, তার কোনওখানিরই রচনা পদ্ধতি আধুনিক নয়। 'কিন্নরী'র মতো নিম্নশ্রেণির নাটকেরও পুনরাভিনয় দেখবার জন্যে আজও বাংলা রঙ্গালয়ে ভিড় ভেঙে পড়ে।

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে খোলা হয়েছিল 'গৈরিক পতাকা', কিন্তু আজও লোকে তাকে দেখতে চায়। অভিনয়ের দিক দিয়ে, নাচ-গানের দিক দিয়ে এবং সাজপোশাক ও দৃশ্যপটাদির দিক দিয়ে 'গৈরিক পতাকা' তার পূর্বগৌরব হারিয়ে ফেলেছে, তবু এখনও বিভিন্ন রঙ্গালয়ে তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে।

নাট্য-সমালোচকরা যখন তখন দাবি করেন—নূতন যুগের জন্যে চাই নূতন আদর্শের নাটক। কিন্তু তাঁদের সে দাবি মিটবে কেমন করে? দাবিদারদের কথামতো কাজ করতে গেলে রঙ্গালয়ের পর রঙ্গালয়ে নিবে যাবে সাঁঝের বাতি যেমন নিবে গিয়েছিল 'নাট্য-মন্দিরে', রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' খুলে।

শচীন্দ্রনাথ নূতন যুগের উপযোগী নূতন আদর্শের নাটক রচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ঝড়ের রাতে'র নাম করতে পারি। পরিকল্পনা, সংলাপের ভাষা, ভাববৈচিত্র্য, চরিত্রচিত্রণ ও আখ্যানবস্তু প্রভৃতি সব দিকেই নাট্যকারের বিশেষ মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ আধুনিক। শ্রীসতু সেন দৃশ্য পরিকল্পনাতেও প্রভূত আধুনিকতা প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও নীহারবালা প্রভৃতির অভিনয়ও হয়েছিল অনবদ্য। তবু নাটকখানি বেশিদিন চলেনি। তাঁর 'জননী' সম্বন্ধেও ওই কথা। আরও দুই-তিন খানি নাটকেও শক্তির পরিচয় দিয়েও দর্শকদের হৃদয় হরণ করতে না পেরে, অবশেষে তিনি পুরাতন পদ্ধতিতেই রচনা করলেন 'সিরাজদ্দৌলা' এবং সঙ্গে সঙ্গে সার্থক হল তাঁর পরিশ্রম। নাবালক সিরাজের ভূমিকায় বৃদ্ধ নির্মলেন্দু, তাও লোকের চোখে বিসদৃশ ঠেকল না, রাত্রির পর রাত্রি প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল বিপুল জনতায়। 'গৈরিক পতাকা'র মতো 'সিরাজদ্দৌলা'রও পুনরাভিনয়ের আয়োজন হয় বিভিন্ন রঙ্গালয়ে। শচীন্দ্রনাথের সমগ্র নাটকাবলির মধ্যে এই দুটি পালাই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর যেসব নাটক উচ্চতর শ্রেণির, তা প্রায় অবজ্ঞাত বা উপেক্ষিত হয়ে আছে। বাঙালি নাট্যকারদের কপাল এমনই পাথরচাপা।

শচীন্দ্রনাথ কেবল বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও নব যুগধর্মের পুরোধা নন বর্তমান কালের প্রধান নাট্যকার বলে পরিচিত করতে গেলে তাঁর ছাড়া আর কারুর নাম মনে ওঠে না।